Title - Akhanda-Samhita,Khanda.9
Author - SRI SRI SWAMI SWARUPANANDA PARAMHANSA DEVA
Language - bengali
Pages - 266
Publication Year - 1945
CREATED by SRI TAPAN KR MUKHERJEE, DHANBAD

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

নবম খণ্ড

(প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৩৫২)

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর

সম্পাদিত

নবম খণ্ডের নিবেদন

পুণ্যময় মহাগ্রন্থ "অখণ্ড-সংহিতা" প্রকাশিত হওয়ার পরে এই গ্রন্থের পঠন-পাঠনরূপ পবিত্র কার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের প্রচার এবং সমবেত উপাসনার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে "অখণ্ড-মণ্ডলী" স্থাপিত হইতেছে। নিশ্চিতই "অখণ্ড-সংহিতা"র গ্রাহকগণের নিকটে ইহা একটী অতীব প্রীতিপ্রদ সংবাদ। এই সকল "অখণ্ড-মণ্ডলী" কেবল যে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের মন্ত্রশিষ্যদের দ্বারাই স্থাপিত হইতেছে, তাহা নহে। পরন্তু যাঁহারা শ্রীশ্রীবাবার শিষ্য নহেন, কিম্বা, এমন কি যাঁহাদের সহিত শ্রীশ্রীবাবার স্থূলভাবে কোনও চাক্ষুষ পরিচয় পর্য্যন্ত নাই, কোনও কোনও স্থলে তাঁহারাও এই পুণ্যময় মহাগ্রন্থের পাঠদ্বারা নিজেদিগকে এতই উপকৃত বোধ করিয়াছেন যে, সেই উপকারকে সর্ব্বত্র বিসর্পিত করিবার এবং ধারা-বাহিক প্রযত্নের ভিতর দিয়া স্থায়ী করিবার প্রেরণায় নিজ নিজ স্থানে "অখণ্ড-মণ্ডলী" স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই কারণে "অখণ্ড মণ্ডলী"র গঠন এবং পরিচালন সম্পর্কে নানা স্থান হইতে আমাদের নিকটে নানা জিজ্ঞাসা আসিতেছে। সেই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। অখণ্ড-মণ্ডলী যেখানেই গঠিত হউক, তাহার শাশ্বত-মণ্ডলেশ্বর অর্থাৎ স্থায়ী সভাপতিরূপে শ্রীশ্রীবাবাই বিরাজমান রহিবেন।

২। স্থানীয় উৎসাহী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি গৃহীত হইবেন।

৩। "অখণ্ড-মণ্ডলী" কোনও প্রকার রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সম্ভাবনাপূর্ণ কার্য্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আত্মনিয়োগ করিবেন না।

৪। ওঙ্কারই মণ্ডলীর উপাসনা-মন্দিরের একমাত্র বিগ্রহ থাকিবেন এবং

এই বিগ্রহকে সম্মুখে রাখিয়াই "অখণ্ড-সংহিতা" পাঠের, "সমবেত উপাসনা"র এবং "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইবে।

৫। "অখণ্ড মণ্ডলী"র অনুষ্ঠান-সীমায় কেহ পাদুকা নিয়া প্রবেশ করিবেন না বা তাম্বুল-চর্ব্বণ, ধূমপান প্রভৃতি করিবেন না।

৬। সদাচার পরিরক্ষণে ও পরিবর্দ্ধনে ইচ্ছুক যে কোনও ব্যক্তি "অখণ্ড মণ্ডলী"র সভ্য বা কর্ম্মী বা নেতা হইতে পারিবেন। সাম্প্রদায়িক সাধনের পার্থক্যহেতু বা বিভিন্ন গুরুর উপদিষ্ট বিধায় কেহ বর্জ্জনীয় বলিয়া গণ্য হইবেন না।

"অখণ্ড-সংহিতা"র নবম খণ্ড প্রকাশকালে "স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেডের" সেই কিঞ্চিদধিক সাড়ে সাত শত অংশীদারকে ধন্যবাদ জানাইতেছি, যাঁহারা তিনটী করিয়া শেয়ার ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া নিজে-দের অংশের সম্পূর্ণ মালিক থাকিয়াও প্রথম আট খণ্ড একরূপ বিনামূল্যে পাইলেন এবং যাঁহারা আরও তিনটী অতিরিক্ত অংশ ক্রয়ে সম্মত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় নবম খণ্ড হইতে ষোড়শ খণ্ড পর্য্যন্ত পাইবার সম্ভাবনা হইল। উক্ত কোম্পানীর জেনারেল মিটিং-এর নির্দ্ধারণ এখনও হয় নাই, এমন সময়ে এই খণ্ড ছাপা হইতেছে।

যেরূপ বিপত্তিকর অবস্থা-নিচয়ের মধ্য দিয়া আমরা এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি, তাহাতে এই গ্রন্থ খণ্ডের পর খণ্ড ক্রমশঃ যে আমরা আমাদের গ্রাহকদের নিকটে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইতেছি, এই জন্য পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে অকপট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোনও কৃত্য আছে বলিয়া মনে করি না। ইতি

পুপুন্কী অযাচক আশ্রম
পোঃ চাস, মানভূম

বিনীত—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর
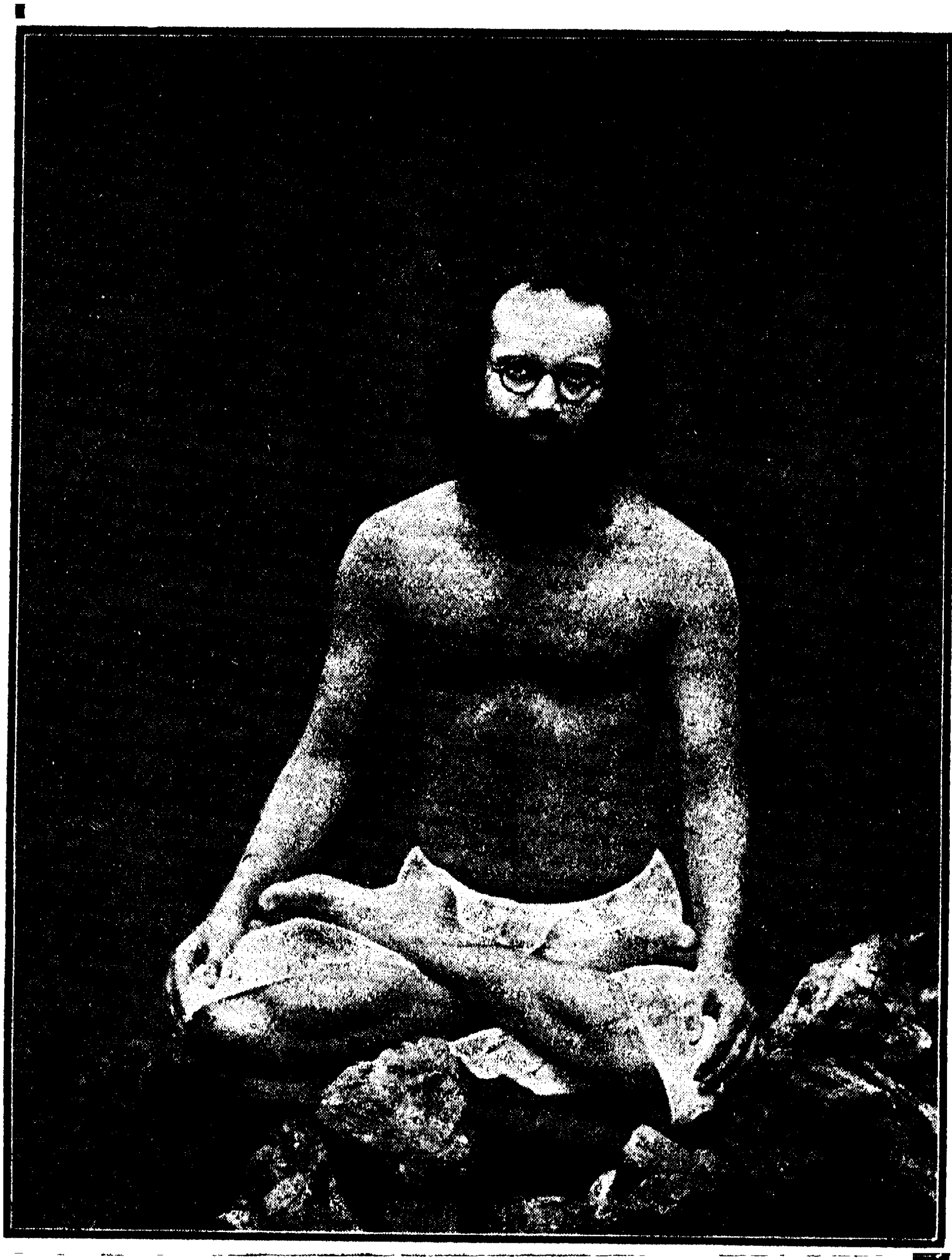
অখণ্ড-সংহিতা—

অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

———— :(*): ————

(নবম খণ্ড)

রহিমপুর

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই পরম পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস বাবা রহিমপুর ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিগত দুই মাসের দেশব্যাপী মহামারীতে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া সম্প্রতি আমাদের তিনজন গুরুভ্রাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের পারলৌকিক কল্যাণার্থে স্থানীয় অখণ্ডেরা আজ সন্ধ্যায় একটী সমবেত প্রার্থনা করিবেন। সকলে যথোচিতভাবে উপবিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীবাবা একে একে প্রত্যেকের জীবন-কথা সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র ধর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বহু সন্তানের পিতা হয়েও আমি নিঃসন্তানেরই মত একাকী এই জগৎটার ভিতরে খেটে যাচ্ছি। মতামতের স্বাধীনতা-দাতা আমি, দীক্ষা দিয়ে কোনো ছেলেমেয়েরই কাণটা ধ'রে টেনে এনে নিজের

অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-সাধনায় লাগাই না, তার ফলে যার যার ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে পূরণ করার জন্যই তারা ছুটে যায়, গুরুদত্ত সাধন তাদের বুকের বল বাড়ায় সত্য, কিন্তু সে বলকে তারা খণ্ড আদর্শের সেবায় অপচয়িত করে, অখণ্ডের সেবা কেউ করে না। সুরেশ কিন্তু আমাকে বুঝতে দিতে চেষ্টা কচ্ছিল যে, আমি অপুত্রক নই।

স্বর্গীয় সুকুমার পাল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় গঙ্গাসাগর রেলষ্টেশনে। গাড়ীর জন্য অপেক্ষা কচ্ছি, এমন সময়ে দুটী ছেলে এসে প্রণাম কল্ল´। তাদের মধ্যে একটী হচ্ছে সুকুমার। জিজ্ঞেস কল্ল´াম,—"আমায় চিন্‌লি কি করে ?" সে বল্লে,—"নোয়াখালি থেকে আমার এক মাষ্টার মশাই পত্র দিয়ে জানিয়েছেন যে আজ আপনি গঙ্গাসাগর দিয়ে কোথায় নাকি যাবেন। আমাদের কিছু উপদেশ দিন।" আমি বল্লাম,—"ব্যায়াম কর্ব্বে, বীর্য্য-ধারণ কর্ব্বে, পরোপকার কর্ব্বে।" সুকুমার বল্লে,—"আরো কিছু চাই, যাতে অভয় মিলে, অমৃতত্ব মিলে, নির্ভর মিলে।" অতটুকু ছেলের মুখে এমন কথা শুনে বিস্ময় লাগ্‌ল। রেল-রাস্তার টুক্‌রো টুক্‌রো পাথর-বিছান অসমতল স্থানেই আসন হ'ল, সে সাধন পেল। অমৃতত্ত্বেরই সন্ধানে সে তার নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছে, কিন্তু আজও আমার কর্ণে তার মধুর কণ্ঠের সেই প্রশ্নই জাগ্‌ছে,—"মৃত্যুকে জয় করা যায় কিসে ?"

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ্‌তে ছিল সে পূর্ণিমার চাঁদের মত স্নিগ্ধ আর প্রাণটা ছিল তার ভক্তিরসের মধুচক্র, এমনি ছিল সুরেন। শেষবার যখন সে আশ্রমে আসে, আমাকে বল্ল,—"বাবা, আমাকে সন্ন্যাস দিতে হবে।" আমি বল্লাম—"সন্ন্যাস কি বাবা লাল কাপড়ে ? ভগবৎ-পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রে দেওয়ারই নাম সন্ন্যাস, তার সাথে বাহ্য অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ অল্প।" সুরেন বল্ল,—"সেই রকম আমাকে হ'তে দাও বাবা, যাতে আমি সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কত্তে পারি।" উৎসর্গের কামনা যখন তার চিত্তকে কাণায় কাণায় পূর্ণ ক'রে ছাপিয়ে

উঠ্ছিল, সেই সময়ে তার দেহান্ত হ'ল। নবতর দেহে সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যোগযোগ্য সুযোগ নিয়ে আবার আস্ছে।

পরলোকপ্রস্থিতের জন্য প্রার্থনার শুভফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এরা যার যার নিজ নিজ কৃতিত্বেই কল্যাণকে করায়ত্ত কর্‌বে। নিজে যে নিজেকে উদ্ধার করে না, কে তাকে উদ্ধার কর্ব্বে? প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তথাপি তোমাদের এ প্রার্থনার একটা উপযোগিতা রয়েছে। প্রথম লাভ তোমাদের নিজ নিজ চিত্তের উৎকর্ষ; দ্বিতীয় লাভ এই যে, তোমাদের সকলের সম্মিলিত চিন্তার শক্তি গিয়ে পরলোক-প্রস্থিতের সংসারমুখী সংস্কারকে বিনাশ ক'রে তার ভবিষ্যৎ অগ্রগমনকে শান্তিময় করে। শ্রাদ্ধাদির ফলও তাই। অকপট চিত্তে আজ প্রার্থনা কর এঁদের মঙ্গলের জন্য, একাগ্র মনে এঁদের মঙ্গলার্থে পরমাত্মার অভয়নাম জপ কর এবং সমগ্র জপফল এঁদের জন্য অর্পণ কর। এতে তোমাদেরও কুশল, এঁদেরও কুশল, সমগ্র জগতেরও কুশল।

শিবপুর, ত্রিপুরা
৩রা ভাদ্র, ১৩৩৯

যোগক্ষেমং বহাম্যহম্

গত রাত্রে শ্রীশ্রীবাবা শিবপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গৌরীভূষণ রায় চৌধুরীর বাড়ী আসিয়াছেন; অদ্য সাধু আপ্তাবুদ্দিনকে দেখিতে গেলেন। ফকীর সাহেবের সহিত ঈশ্বরীয় বিষয়ে বহু কথোপকথন হইল।

প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, যে যতটুকু নির্ভর করে, তার ভার ভগবান্ ততটুকুই নেন। যে অল্প নির্ভর করে, তার অল্প ভার তিনি নেন। যে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তার সম্পূর্ণ ভার তিনি নিজস্কন্ধে গ্রহণ করেন।

অহংবুদ্ধি ও নির্ভর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অহংবুদ্ধি থাকৃতে কখনো নির্ভর আসে না। নিজেকে একেবারে তাঁর ব'লে না জান্‌লে নির্ভর আসে না। আমি যখন

তাঁর, তখন আমার ভালমন্দের হিসাব-নিকাশও তাঁর, এই বুদ্ধি থেকেই নির্ভরের জন্ম হয়।

শিবপুর
৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৯

সৎলোকের সঙ্গের গুণ

শ্রীযুক্ত গৌরীভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যথার্থ যিনি সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গ পাওয়া মাত্র অসংযমীর জীবনে পরিবর্ত্তন আস্‌তে আরম্ভ করে। যিনি ঈশ্বর-প্রেমিক ব্রহ্মময় পুরুষ, তাঁর সঙ্গ মাত্র অপরের চিত্তে ঈশ্বর-প্রেমের সঞ্চারণা হ'তে আরম্ভ করে। পাত্রভেদে এই সঞ্চারণার ক্রিয়া অল্প বা অধিক হ'তে পারে, কিন্তু সৎ-সঙ্গের ফল কখনো ব্যর্থ হবার নয়। যার আধার যত পবিত্র, মহতের সঙ্গ তার পক্ষে তত গভীর ভাবে কাজ করে, সৎসঙ্গের গুণ তার পক্ষে তত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর আতিথেয়তা

প্রাতঃকালীন জলযোগের পরেই শ্রীশ্রীবাবা বাঘাউড়া গ্রামে রওনা হইলেন। বর্ষাকালের ভ্রমণের জন্য একখানা মধ্যমাকৃতি নৌকা শ্রীশ্রীবাবা মাসিক চুক্তিতে ভাড়া করিয়াই রাখিয়াছেন, অতএব কোনও খানে যাতায়াতেরই কোন অসুবিধা নাই। শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে রহিমপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় এবং আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী আছেন। বহুকাল পরে স্বগৃহে শ্রীশ্রীবাবাকে পাইয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহানন্দে মত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে, এতদঞ্চলে শ্রীশ্রীবাবার আগমন-সংবাদ শুনিয়া এখানেই শ্রীশ্রীবাবা আসিয়াছেন মনে করিয়া, বহু দর্শনপ্রার্থী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বাঘাউড়াতেই আসিয়াছেন। আশুবাবু সকলের সেবাযত্নাদির যথোচিত ব্যবস্থায় লাগিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবা সূর্য্যবাবুকে বলিলেন,—আশুবাবুর আতিথেয়তার তুলনা নেই। এই বাড়ীতে এক সময়ে আমি থেকে গেছি, আশুবাবুর বাড়ীর ছেলেদের

আমি পড়াতাম। নিরিবিলি থাকতাম, আর ধ্যানজপে কাটাতাম। নিয়ম ছিল তখন স্ত্রী-মুখ দর্শন না করা, স্ত্রীলোকের সাথে বাক্যালাপ না করা, স্ত্রীলোক যে ঘাটে স্নান করে সে ঘাটে পর্য্যন্ত স্নান না করা। সাধারণ ভাবে থাক্‌তাম, নিজের কাপড় নিজে কাচ্‌তাম, দেখে কেউ কেউ কৃপণ মনে কত্ত। কিন্তু এত ক'রেও নিজেকে লুকিয়ে রাখা গেল না, কি ক'রে চতুর্দ্দিকে প্রচার হ'য়ে গেল এখানে একটা ভারী রকমের মানুষ আছে। দলে দলে লোক আস্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল। তখন দেখেছি, আশুবাবুর আতিথেয়তা। রাত্রি বারোটার সময়ে একদল লোক এসে হাজির, কুণ্ঠা নেই, দ্বিধা নেই, অম্‌নি আশুবাবুর স্ত্রী নিজ হাতে হাঁড়ি চড়িয়ে দিলেন। একশ জন লোক এলেও আশুবাবু বিরক্ত হন নি, যত্ন ক'রে খাইয়েছেন, নিজে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে খাইয়েছেন, বলেছেন,—"আপনি বাড়ীতে আছেন বলেই ত এরা পায়ের ধূলো দিলেন, নইলে ত' এঁদের পাওয়ার ভাগ্য আমার হ'ত না।"

গুরুভাবের উন্মেষ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই বাড়ী থেকেই আমার গুরুগিরির আরম্ভ। এর আগে ছিল আমার বীতিহোত্র আর প্রভঞ্জন, তাদের নিয়েই আমার প্রথম আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী। তাদের নিয়ে এতকাল নিরিবিলি সাধন কত্তাম, তারা আমার বল বাড়াত, আমি তাদের বল দিতাম। ঠিক্ গুরুশিষ্যের মত ভাব আমাদের ছিল না। ছিল প্রেমময় সখার ভাব। কি মহান্ আত্মোৎসর্গের জন্য প্রভঞ্জন আর বীতিহোত্র তৈরী হচ্ছিল, তা আমি জান্‌তাম আর তারা জান্‌ত, জগতের আর কেউ তা জান্‌ত না। কিন্তু এই বাড়ীতে এসে আরম্ভ হ'ল পদ্ধতিবদ্ধ গুরুগিরি। গুরুগিরির তলোয়ার প্রথমে হান্‌লাম এই বাড়ীর ছেলেদেরই ঘাড়ে। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য জীব-হত্যা হ'তে আরম্ভ কর্‌ল। শেষে আমাকে নেশায় পেয়ে বস্‌ল। তখন আমি অসিদ্ধ যোগী,—দীক্ষা দিলেই কি আর কেউ সত্যিকার শিষ্য হয়? ফলে গুরু হলাম আমি শত শত লোকের কিন্তু শিষ্য হ'ল না তার মধ্যে একজনও, একজনও আমার

জীবনাদর্শকে বুঝ্‌ল না, একজনও আমার হাতে হাত মিলাল না, কাঁধে কাঁধ মিলাল না, প্রত্যেক শিষ্যের জন্ম খেটে খেটে আমার জান্ যাবার জোগাড় হ'ল, কারো কারো অসম্ভব রকমের উন্নতির পরেই হঠাৎ গুরুতর অধো-গতির দৃশ্য দেখে নিজের অসম্পূর্ণতা নিজের অসিদ্ধতা স্মরণ ক'রে কেঁদে বুক ভাসালাম। কিছুদিন পরে প'ড়্‌লাম দীর্ঘ দুই বৎসরব্যাপী রক্তবমনের রোগে। রোগ-শয্যায় প'ড়ে নিজ আচরণের হিসাব-নিকাশ হ'ল; পরমাত্মায় পূর্ণ আত্মসমর্পণ এল, পরমাত্মরূপী সদ্‌গুরু অন্তরে আবির্ভূত হ'য়ে বল্‌লেন,— "স্থিরো ভব।" অমনি স্থির হয়ে গেলাম, শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির লোভ কমে গেল, সম্প্রদায় সৃষ্টির কুবুদ্ধি নাশ পেল, প্রতিদান লাভে লোভহীন হয়ে মানবাত্মাকে পরমোন্নতির পথে হাতে ধ'রে টেনে নেবার সামর্থ্য উপজাত হ'ল, আমি আমার হারানো সত্ত্বাকে ফিরে পেলাম।— এই বাড়ীটা আমার জীবনের একটা বিরাট বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করেছে।

বুদ্ধদেবের শিষ্যদের গুরুদ্রোহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান্ বুদ্ধকেও এই বিপ্লব নিজ অন্তরে অনুভব কর্ত্তে হয়েছিল। তাঁরই স্নেহপুষ্ট, তাঁরই তপোবীর্য্যে বীর্য্যবান্ পঞ্চশিষ্য তাঁকে কলা দেখিয়ে বলেছিল,—"তুমি মিথ্যা গুরু, আমরা সত্য গুরুর সন্ধানে চল্লুম"। এই আঘাতের বেদনা তিনি সেই দিন ভুলেছিলেন, যে দিন বোধিদ্রুমমূলে তিনি মৈত্রীর মধুময়ী বাণী অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে লাভ কর্ল্লেন।

অনেক কাজ বাকী আছে

শ্রীযুক্ত আশুবাবুর বাড়ীর দুর্গামণ্ডপ দেখাইয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— এই দালানটাতে আমি ঘুমাতাম। এই গ্রামের এক সাধু পুরুষ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, দীর্ঘকাল তীর্থে তীর্থে ঘুরে স্বগ্রামে এসে যখন এই মন্দিরে শয়ন কর্ল্লেন, তখন তিনি নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন। আশুবাবুর বাড়ীর কোন্ মহিলা একরাত্রি এখানে শয়ন ক'রে মহাকালীর ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছিলেন। আমি এই মণ্ডপে ঘুমিয়েছি পূরা দুটা বছর,

তার মধ্যে মাত্র একটা রাত্রি কিছু অসাধারণ ব্যাপার হয়েছিল। প্রায় প্রত্যহই শেষ রাত্রিতে আর শয়নের পূর্ব্বে কিছুকাল নামকীর্ত্তন কত্তাম। আজও কীর্ত্তনাদি সেরে শয়ন করেছি, দেখ্‌তে পেলাম, ঘরটা যেন আলোতে ভ'রে গেল, আমার চতুর্দ্দিক ঘিরে কত অপরূপ মূৰ্ত্তির বৈষ্ণব মহাপুরুষ খোল করতাল বাজিয়ে আমার শায়িত দেহটা প্রদক্ষিণ কত্তে কত্তে সুমধুর কণ্ঠে নামকীর্ত্তন কত্তে লাগ্‌লেন। আমি ভাব্‌লাম স্বপ্ন দেখ্‌ছি। গায়ে চিম্‌টী কেটে দেখ্‌লাম, আমি জাগ্রত। অতি মধুর অথচ তেজোব্যঞ্জক স্পষ্ট কণ্ঠে একটা প্রশ্ন হল,—"তুই মর্‌বি ?" আমি বল্লাম,—"না, আমার অনেক কাজ বাকী আছে।" অম্‌নি দেখ্‌লাম, ঘর অন্ধকার, কীর্ত্তন নেই, খোল করতালের ধ্বনি নেই, বৈষ্ণব মহাত্মারাও নেই।

অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূৰ্ত্তির অর্থ

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা নৌকাযোগে বাঘাউড়া ত্যাগ করিলেন। সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়ে নৌকা নাটঘরের সমীপবর্ত্তী হইলে সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যবাবু নাটঘরের অৰ্দ্ধনারীশ্বর শিব-মূর্ত্তি দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"বেশ তো।"

নৌকা শিবালয়ের সন্নিকটে থামিল, সকলে অবতরণ করিলেন। কথা হইল, শ্রীশ্রীবাবার পরিচয় এখানে কাহারো নিকট দেওয়া হইবে না, যেহেতু পরিচয় পাইলে আটক পড়িতেই হইবে এবং তাহা হইলে আজ আর নির্দ্ধারিত স্থানে পৌছা যাইবে না।

বিগ্রহ দর্শনের পরে শ্রীশ্রীবাবা সংক্ষেপে অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূৰ্ত্তির ব্যাখ্যা করিলেন। বলিলেন,—এই মূর্ত্তির উদ্ভাবয়িতার লক্ষ্য কোথায় জান? লক্ষ্য হচ্ছে, তোমার ভিতরে অবস্থিত পুরুষ এবং প্রকৃতির সামঞ্জস্যীভূত একত্বের প্রতি। এই যে মূৰ্ত্তি, ইহা শিবের, অর্থাৎ মঙ্গলের, এই মূর্ত্তির পূজা কল্যাণের পূজা, এই মূর্ত্তির ধ্যান কুশলের ধ্যান। কিন্তু এই মূর্ত্তিটি কি? নারী এবং পুরুষের একীভূত মূৰ্ত্তি, নারীত্ব ও পুরুষত্ব এখানে

পরস্পর থেকে পরস্পর পৃথক্ নয়, তাই একের প্রতি অপরের আসক্তি নেই, কামার্ত্ততার জগতের উর্দ্ধে অবস্থিত এই মূর্ত্তির তত্ত্ব। এই মূর্ত্তি তোমাকে বলছেন্,—"হে সাধক, তোমার ভিতরেও এইভাবেই নারী ও পুরুষ ওতঃপ্রোতভাবে একীভূত, নিজেকে শুধু পুরুষ ব'লে পরিচয় দেওয়া তোমার অহমিকা মাত্র, নিজেকে শুধু নারী ব'লে মনে করা তোমার ভ্রম মাত্র, জগন্মাতা ও জগৎপিতার সমষ্টি-বিগ্রহ হচ্ছ তুমি, তোমার সকল আকর্ষণের বস্তু, বাঞ্ছিত বস্তু, লোভনীয় বস্তু তোমারই ভিতরে রয়েছে, যার সাথে প্রেম জমাবার জন্ম তুমি বাইরে ঘু'রে বেড়াচ্ছ, সে তোমার বাইরে নয়, সে তোমার ভিতরে, সে তোমার প্রতি অঙ্গে, সে তোমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ ভাবে জড়িত, অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত, প্রতি রোমকূপে তোমাতে আর তাতে রমণ।"

ঈশ্বরীয় প্রেমের শক্তি

আত্মগোপন করিবার জন্ম লম্বা একটা আলখাল্লা গায়ে দিয়া একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীবাবা এসব বলিতেছিলেন। কিন্তু নাটঘরের শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দে কণ্ঠস্বর দিয়াই শ্রীশ্রীবাবাকে চিনিয়া ফেলিলেন। মহিম বাবুর কোনও কোনও আত্মীয় শ্রীশ্রীবাবার কৃপাপ্রাপ্ত। সুতরাং তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে বিশেষ ভাবেই ধরিয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাবা আর রাজী না হইয়া পারিলেন না।

শ্রীশ্রীবাবা মহিমবাবুর বাড়ীতে পদধূলি অর্পণ মাত্র বাড়ীর আঙ্গিনা দর্শনেচ্ছু নরনারীতে পূর্ণ হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার প্রতি প্রেম দেখিয়ে আর কি লাভ হবে? যাঁকে প্রেম দিলে জগতের সকলকে প্রেম করা হয়, তাঁর প্রতি প্রেম দেখাও, তাঁকে ভালবাস। তবে ত' জন্মকর্ম্ম সার্থক হবে, মানবজীবন সফল হবে, ইহপরকালের পিপাসা মিটবে! প্রেমই শান্তি, প্রেমই শক্তি। লক্ষ জনের মধ্যে একজনও যদি তাঁর প্রেমে প্রেমময় হ'তে পার, ঐ একজনের প্রেমের শক্তিতেই যে জগৎ উদ্ধার হ'য়ে যাবে।

নাটঘর।

৫ ভাদ্র, ১৩৩৯

স্নানধ্যানাদি সমাপনান্তে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবা স্বকীয় আসনোপরি উপবিষ্ট আছেন, পল্লীবাসী বহু ভদ্রলোক সমাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা ভগবৎ-প্রসঙ্গ বলিতে লাগিলেন।

প্রেমিকের ঐহিক দুঃখ অগ্রাহ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রেমিকের প্রেমই সব, ঐহিক দুঃখের ভ্রূকুটি সে গ্রাহ্য করে না। ভালবাসার জনকে ভালবেসেই তার সুখ, ভালবাস্তে পেলেই তার অবিচল আনন্দ, ভালবাসার দায়ে যদি মহৎ দুঃখকেও বরণ কত্তে হয়, তবে তাতেও সে রাজি।

"জয়রাম বাবাজী"র প্রেমিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অযোধ্যাতে ছিলেন এক মহাপুরুষ, নাম তাঁর "জয়রাম বাবা"। পাগলের মত চল্‌তেন, পাগলের মত থাকৃতেন, কোনো আখড়া বা আশ্রম তাঁর ছিল না, হনুমান-ভাবের সাধক ছিলেন তিনি, গাছে গাছে বাস কত্তেন, বর্ষার প্রবল বারিধারাতেও তিনি বৃক্ষশাখেই থাকৃতেন, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়েও তিনি ঐখানেই রইতেন, কদাচিৎ মাটিতে নাম্‌তেন, কেউ কিছু দিলে খেতেন, নতুবা গাছের ফল পেড়ে খেতেন। তাঁর ছিল অদ্ভুত প্রেমিকতা। চীৎকার ক'রে তিনি গান ধর্‌তেন, সুর ছিল না, তাল ছিল না, গানের কোনো ছন্দ ছিল না, কিন্তু চখ বুক জলে ভেসে যেত, আর তিনি গদ্য কথাগুলিতেই যখন যেমন ইচ্ছা সুর বসিয়ে গাইতেন,—"তোদের যার ইচ্ছা আয়রে, এসে আমার গলার মধ্যে দড়ি বেঁধে এই আমের ডালে ঝুলিয়ে দেরে, কিন্তু আমি যেন রামজীকে না ভুলিরে। তোদের যার ইচ্ছা আয়রে, আমার বুকে পাথর বেঁধে এই সরযূতে ডুবিয়ে দেরে, কিন্তু আমি যেন রামজীকে না ভুলিরে। তোদের যার ইচ্ছা আয়রে, লাঠি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দেরে, রক্তের নদী বইতে থাকুকরে, সারা অঙ্গে ফাগুয়ার রং ধরুকরে, কিন্তু আমি যেন রামজীকে না ভুলিরে"।

ভক্তের প্রার্থনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভক্তের প্রার্থনা কিরূপ জানো? ব্যাধির জ্বালায় শরীর দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, আর তিনি বল্‌ছেন,—"ধন্য হে ব্যাধি তুমি ধন্য! তুমি প্রতিদিন আমার পরমারাধ্য ঠাকুরের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ। জন্মে জন্মে যেন আমার এরূপ কষ্টকর দুঃখজনক বেদনাবহুল দুরবস্থায় পড়্‌তে হয়, আর জন্মে জন্মে যেন আমি আমার প্রাণের দেবতার অভয় চরণই স্মরণ করি, এক দিনের জন্যও যেন তাঁকে না ভুলি, এক নিমেষের জন্যও যেন তাঁকে ভুলে থাক্‌তে না পারি।" বিঘ্ন-বিপত্তি তাঁর মাথার উপর দিয়ে ঝঞ্ঝার বায়ুর মতন উন্মত্ত আক্রোশে চ'লে যায়, আর তিনি বলেন,—"হে আমার জীবন-দয়িত, হে আমার প্রাণের প্রভো, তুমি এই ভাবে নিত্য আমায় কৃপা ক'রো। মানুষ, গরু, মহিষের পায়ের তলায়, হাতীর পায়ের তলায়, নিত্য আমাকে পেষণ করো,—তাতে অনাথের নাথ, দীনের বন্ধু তোমার কথা সর্ব্বদা আমার মনে হবে।"

অন্ধ ব্রাহ্মণের প্রেমিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঠিক্ এই রকম আর এক প্রেমিক মহাপুরুষ দেখেছিলাম, কল্‌কাতার রাস্তায়। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে তিনি ইলেক্‌টিক্ বাতির থামের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন। চারদিকের লোকজনেরা হাঁ, হাঁ ক'রে ছু'টে এল। তিনি বল্লেন,—"কিচ্ছু হয়নি বাবুজী, রামজী আমাকে তাঁর কথা মনে করিয়ে দিলেন মাত্র।" আর একটুখানি পথ যেতেই রাস্তায় এক কুকুর উঠ্‌ল ঘেউ ঘেউ ক'রে,—অন্ধ ব্রাহ্মণ বল্লেন,—"জিতা রহো বাচ্চা, তুমি আমাকে রামজীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ।"

প্রেমিকের কাম লালসা থাকে না

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—প্রেমিক পুরুষ যে, সে প্রেমের স্রোতেই ভেসে চলে, দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে কামনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তার দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না। ডাক্তারি শাস্ত্রও তোমাদের বল্‌বে যে, দেহের ভিতরে কতগুলি গ্রন্থি থেকে যৌবন-বর্দ্ধক, সম্ভোগ-

লালসা-বর্দ্ধক, ভোগ-সামর্থ্য-বর্দ্ধক রসস্রোত অনবরত প্রবাহিত হচ্ছে। হচ্ছে ত' হচ্ছেই, কিন্তু প্রেমিকের তাতে কি? ভক্ত হরিদাস নিজ কুটীরে ব'সে হরিনাম কচ্ছেন। রূপসী রমণী এসে তাঁর কুটীর-দুয়ারে ব'সে আছে ভোগের পসরা চখের সুমুখে উন্মুক্ত ক'রে, কিন্তু যেই ভ্রমর হরিপ্রেমের রসে মন মজিয়েছে, মর্ত্ত্যের সব চেয়ে বেশী প্রস্ফুটিতা কমলিনীও তার দৃষ্টি আকর্ষণ কত্তে পারে না। প্রেম যে শুধু দুঃখজয়ই করে, তা নয়; লালসাও জয় করে।

মায়াময় জগৎকে মায়াতীত করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবাকে শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ী মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ দান করিতেই হইবে, শ্রীযুক্ত উমেশের বৃদ্ধা জননীর ইহা একান্ত প্রার্থনা। শ্রীশ্রীবাবা সে প্রার্থনা পূরণ করিলেন। প্রাতঃকালীন জলযোগান্তে তিনি শ্রীযুক্ত উমেশের গৃহে গমন করিলেন।

শ্রীযুক্ত উমেশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—জগৎটা যখন মায়াময়, তখন এই জগতের কর্ত্তব্য উপেক্ষা কর্লে হয় না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উপেক্ষা তুমি কত্তেই পার না। জগৎটা মায়াই হোক্ আর যাই হোক্, তোমার যখন যা কর্ত্তব্য হবে, তা তোমাকে কত্তেই হবে, একটী কর্ত্তব্যকেও তুমি লঙ্ঘন কত্তে অধিকারী নও। নিজের শতসহস্র কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে অবিরল মায়াধীশ পরমাত্মার নাম স্মরণ কর, এতেই এই মায়াময় জগতের মায়াপবাদ খণ্ডিত হবে, মিথ্যা দূর হবে, জগৎ সত্যময় হবে।

পূর্ব্বসংস্কার বিনাশের উপায়

দ্বিপ্রহরের কিছু পরে রওনা হইয়া বেলা কিছু থাকিতেই শ্রীশ্রীবাবা নিকটবর্ত্তী অপর এক পল্লীতে পৌছিলেন। সন্ধ্যার পরে একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূর্ব্বসংস্কার কি যায় না বাবা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যায়, সাধন কর, শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম চালাও, অবিশ্রাম মনটাকে নামের সেবায় লাগিয়ে রাখ।

গুরু-নির্ভর কিসে আসে

প্রশ্ন।—আমি অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে বৃন্দাবনের এক মহাপুরুষের নিকট পত্র লিখ্‌তে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়্‌ল, আপনাকে ignore (অবজ্ঞা) করা হচ্ছে। শেষে ভাব্‌লাম, ভবিষ্যৎ আমার যাই হোক্‌, গুরু-নির্ভর ছাড়্‌ব না।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—আমাকে অবজ্ঞা ক'রেও তোমরা সম্মানিতই কচ্ছ, আমাকে ত্যাগ ক'রেও গ্রহণই কচ্ছ।

প্রশ্ন।—পূর্ণরূপে গুরুনির্ভর আসিবার পথ কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেবল সাধন ক'রে যাও। নামই তোমাকে সত্য গুরুর কাছে পৌছে দেবে। নামই সত্যলাভের পথ, গুরুনিষ্ঠার পথ। কারণ, নামই সত্যিকারের গুরু।

আমরা কোন্ সম্প্রদায়ী ?

প্রশ্ন।—আমরা জ্ঞানী, না কর্ম্মী, না ভক্ত ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমাদের সাধন সামঞ্জস্যের সাধন। জ্ঞান ছাড়া প্রেম হয় না, প্রেম ছাড়া জ্ঞান হয় না, কর্ম্মছাড়া প্রেমও হয় না, জ্ঞানও হয় না। পূর্ণ প্রেমে, পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জীবনই আমাদের জীবন। জ্ঞানপথ, কর্ম্মপথ, ভক্তিপথ এই তিন পথের একটী থেকে আর একটীকে পৃথক করা যায় না। তবে যুগের প্রয়োজন বুঝে কখনো কখনো কোন একটীর একটু আধিক্য আসে,—কিন্তু তা সাময়িক। কঠোর কর্ম্মের মধ্য দিয়ে পরাভক্তি ও পূর্ণ জ্ঞানের সাধনই আমাদের সাধন। সাধকের জীবনের অভিব্যক্তির দাবী বুঝে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার বুঝে, প্রতিবেশ-প্রভাব বুঝে এবং মানসিক উপাদানগুলির সংস্থান বুঝে সাময়িক ভাবে কারো মধ্যে এই তিনটীর কোনো একটার প্রাধান্য আস্‌তে পারে, কিন্তু তাই ব'লেই সে একেবারে Balance (মাত্রা) হারিয়ে ফেল্‌বে তা নয়।

৬ভাদ্র, ১৩৩৯

সাধনের গোপনতা রক্ষা ও পরনিন্দা বর্জ্জন

দুইটী বিদ্যার্থী আজ শ্রীশ্রীবাবার নিকট সাধন পাইল।

দীক্ষা-দানান্তে উভয়কেই শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ করিলেন,—সাধনের কথা লোকের কাছে গোপন রেখে প্রাণপণে সাধন ক'রে যাবে, আর সর্ব্বপ্রযত্নে পরনিন্দা বর্জ্জন কর্ব্বে। এই দুইটী মাত্র উপদেশ যদি পালন কত্তে পার, তবেই বাবা সাধনের ফল অতি অল্প দিনে প্রত্যক্ষ কত্তে পারবে।

জীবনকে ভাগবতী চেতনায় প্রতিষ্ঠিত কর

অপর এক সময় শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত সূর্য্যবাবুকে বলিলেন,—জীবনকে ভাগবতী চেতনায় প্রতিষ্ঠা করাই দীক্ষাদান বা সাধন গ্রহণের উদ্দেশ্য। কর্ম্মী হও, জ্ঞানী হও, আর ভক্তই হও, অপরের পথটাকে প্রাণ খুলে নিন্দা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভের মিথ্যা চেষ্টার জন্য সাধন দেওয়া বা সাধন পাওয়া এক বিপজ্জনক ভুল। জীবনটাকে কর্ম্ম থেকে বঞ্চিত ক'রে ধর্ম্ম প্রচার কর্ল্লে দেশের উদর সে ধর্ম্মের প্রতিবাদ কর্ব্বে। জীবনটাকে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ক'রে ধর্ম্মপ্রচার কর্ল্লে, দেশের মস্তিষ্ক সে ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য ব'লে ত্যাগ কর্ব্বে। জীবনটাকে প্রেম থেকে বঞ্চিত ক'রে ধর্ম্মপ্রচার কর্ল্লে, দেশের হৃদয় সে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্ব্বে। কি গৃহী, কি গৃহত্যাগী, প্রত্যেকের জন্য চাই আজ এমন ধর্ম্ম, যার উদ্দেশ্যও হবে ভাগবতী চেতনাকে জীবের সর্ব্বাবস্থাতেই প্রতিষ্ঠা করা, যার ফলও হবে ভাগবতী চেতনারই সর্ব্বতোভাব প্রতিষ্ঠা-লাভ। তোমার চেতনা ভগবানের চেতনার সাথে অভিন্ন হোক্, তার পরে তুমি জ্ঞানী হও, সো বি আচ্ছা, কর্ম্মী হও, সো বি আচ্ছা, প্রেমী হও, সো বি আচ্ছা।

বর্ত্তমান যুবক ও সাধু-সন্ত

দ্বিপ্রহরের পরে শ্রীশ্রীবাবা নৌকাযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছিলেন। শ্রীযুক্ত নীলমোহন ঘোষের বাড়ীতে তিনি পদধূলি দিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ত্রিপুরা জেলার একটী মহকুমা, হাইস্কুল এখানে তিনটী। সুতরাং সহরের বহু

গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সকল স্কুলের ছাত্রেরাই শ্রীশ্রীবাবার আগমন সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পাদপদ্ম দর্শনে সমাগত হইলেন। চট্টগ্রামের এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ যুগের যুবকেরা সাধু-মহাপুরুষদিগকে মানে না কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটু ব্যাখ্যা ক'রে বল।

ভদ্রলোক কয়েকজন সাধু-মহাপুরুষের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অনুষ্ঠিত কয়েকটী অপ্রীতিকর অশিষ্টতার কাহিনী বিবৃত করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এসব অশিষ্টতার একটী কারণ হচ্ছে, যুবকদের অদূরদর্শিতা, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ও অন্যায় অহমিকা। কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট পথকে সত্য ব'লে জানার পরে অপর যে-কোনও পথকে মিথ্যা ব'লে নির্য্যাতন করার যে বর্ব্বরতা জগতের সব দেশেই সব সময়ে দেখা গিয়েছে, এটা তা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারকে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে অপরের জ্ঞান. বুদ্ধি ও বিচারকে বিনা-বিচারে উপেক্ষা করার যে অভ্যাস আদিম যুগের অসংস্কৃত-মস্তিষ্ক লোকদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, এ সব হচ্ছে তারই পুনরাবৃত্তি। এসব ব্যাপার বর্ত্তমান যুবকদের, এই বিংশ শতাব্দীর যুবকদের শিক্ষা-দীক্ষার গৌরব মোটেই বর্দ্ধন করে না। কিন্তু, এসব অন্যায় ব্যবহারের একটী কারণ, সাধু-সন্তদের ধর্ম্মপ্রচারের ভঙ্গীটীর মধ্যেও বিরাজিত রয়েছে। যে যুগে যিনি আবির্ভূত হবেন, তাঁকে আংশিক ভাবে হলেও সে যুগের দাবী কিঞ্চিৎ পূরণ কত্তেই হবে। এই নির্দ্দিষ্ট যুগটাতে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন ব'লেই, এই যুগের বড় বড় প্রয়োজনগুলি তাঁর কাছে কিছু সেবা দাবী করে। সেই দাবীকে একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে যাঁরা ধর্ম্মপ্রচার কর্ব্বেন, যুগধর্ম্মী যুবকদের কাছে যে তাঁরা অনাদৃত হবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

ভজন-শীল সাধু ও যুগধর্ম্ম

প্রশ্ন।—একান্তভাবে ভজনশীল সাধুর কি যুগধর্ম্ম মান্‌বার প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—একান্তভাবে ভজনশীল সাধুরা সকল যুগের সকল কৃত্য নিজেদের ঈশ্বরারাধনার ভিতর দিয়েই কচ্ছেন। খণ্ডভাবে কোনও নির্দ্দিষ্ট

যুগের বিশেষ কোনও ধর্ম্ম সম্পর্কে তাঁদের কোনও দায়িত্ব বা বাধ্য-বাধকতা নেই,—একথা মান্‌তেই হবে। যুবকেরা যদি যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়ে এঁদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তা নিতান্তই উৎপীড়ন বা সমর্থনের অযোগ্য অনাচার ব'লে গণিত হবে।

সদ্‌গুরু কে?

অপর একটী ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পিপাসা যার লাগে, সে লোণা নদীর জল পেলেও তাই মুখে দেয়। মানুষ মাত্রেই অফুরন্ত পিপাসায় কাতর, কিন্তু কোন্ নদীর জলে সব পিপাসা দূর হবে, তা সে জানে না। দেহ-নদী তার সামনে দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে, সে তাতেই ছুটে যায়, দেহের সুখ-ভোগের মধ্য দিয়ে পিপাসার পরিতৃপ্তি অন্বেষণ করে। কিন্তু শত জন্ম দেহের সেবায় কাটিয়ে দিলেও ত' পরিতৃপ্তি নেই! যে নদীতে ডুব দিলে পূর্ণ শান্তি মিলে, সেই নদীর খোঁজ যিনি ব'লে দেন, তিনিই সদ্‌গুরু।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৭ই ভাদ্র, ১৩৩৯

যোগী কাহাকে বলে?

সরিপপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা জ্ঞানী না ভক্ত?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি যাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য পেয়েছে, আমরা তাঁকেই বলি যোগী। এই তিনটীর একটীকেও যারা অসত্য ব'লে মনে করেন, তাঁরা কুযোগী। এই তিনটীর একটীও যাঁদের নিকট সত্য নয়, তাঁরা অযোগী।

উপাসনা করিতে ইচ্ছা না করিলে কি কর্ত্তব্য

একটী যুবক প্রশ্ন করিলেন,—সব দিন উপাসনা কত্তে ইচ্ছা করে না। এর কি করি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিয়ম ক'রে নাও যে, উপাসনা না ক'রে আহার কর্ব্বে না, প্রাতে উপাসনা না ক'রে জলযোগ কর্ব্বে না, দুপুরের

উপাসনা না ক'রে মধ্যাহ্ন-ভোজন কর্ব্বে না, সান্ধ্যোপাসনা না ক'রে রাত্রির আহার কর্ব্বে না, শয়নকালীন উপাসনা না ক'রে নিদ্রা যাবে না। জেদ্ ক'রে দুই চার দিন আহার ও নিদ্রার ক্লেশ সহ্য কর, তবেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

পরীক্ষা পাশের মন্ত্র

একটী যুবক আসিয়াছেন, পরীক্ষা পাশের মন্ত্র গ্রহণ করিতে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পরীক্ষা পাশের মন্ত্র হচ্ছে খুব ক'রে পড়া, মন দিয়ে পড়া, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে অধ্যয়নে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া, পরীক্ষা পাশের জন্য দিবারাত্রি প্রবল সঙ্কল্প করা এবং সঙ্কল্পের অনুযায়ী কাজ ক'রে যাওয়া।

যুবকটী বলিল,—এই কথা ত আমি জানিই। আমি চাই এমন একটী মন্ত্র, যা জপ করলে পরীক্ষায় পাশ কত্তে পার্ব্ব।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেই মন্ত্র বাবা আমার জানা নেই।

যুবকটী আর অপেক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিল।

চাকুরী পাবার মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এক শ্রেণীর মহাপুরুষেরা চাকুরী পাবার মন্ত্র, ফাঁড়া কাটাবার মন্ত্র, ধনী হবার মন্ত্র, স্ত্রীবশীকরণের মন্ত্র, মোকদ্দমা জয়ের মন্ত্র এই সব দিয়ে দিয়ে এই অবস্থাটী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু চাকুরী পাবার মন্ত্র যে চাকুরীর উপযুক্ত যোগ্যতা সঞ্চয় এবং উপযুক্ত উমেদারী তা ত' কেউ ব'লে দেন না। তারই ফলে এই যুবক চাচ্ছিল এমন একটা মন্ত্র, যাতে পরীক্ষায় পাশ হওয়া যায়। কি দুর্দ্দৈব বল দেখি!

সমাজ ও সাধু-সন্ন্যাসী

একটী যুবক প্রসঙ্গ তুলিলেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীরা সমাজের প্রচুর অন্ন উদরস্থ করেন, অথচ বিনিময়ে সমাজকে কোনও সেবাই দেন না, এমতাবস্থায় সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে অন্নদান সমাজের কর্ত্তব্য কি না।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধু-সন্ন্যাসীদের দ্বারা সমাজের যে কোনো হিতই সাধিত হয় না, এই বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ কি?

যুবক।—সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নই, তবে তাঁদের দ্বারা যতটুকু হিত হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী অন্ন তাঁরা উদরস্থ করেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, —যিনি সমাজের যতটুকু হিতসাধন করেন, তাঁর পক্ষে তার বেশী অন্ন পাবার কোনও অধিকার নেই। সমাজের কাছে তুমি তোমার বক্তব্য পৌঁছাবার চেষ্টা কর। এর ফলে সমাজের যা কর্ত্তব্য সমাজ তা' সম্পাদনের জন্য অল্প সময়েই চেষ্টিত হবেন।

রহিমপুর
১১ই ভাদ্র, ১৩৩৯

নানাস্থান পর্য্যটন শেষ করিয়া গত কল্য রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বহু চিঠিপত্র আসিয়া জমিয়া রহিয়াছে। আজ প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীশ্রীবাবা চিঠিপত্রের উত্তর দানে মগ্ন রহিয়াছেন।

বাঁচিবার মত বাঁচ

দ্বারভাঙ্গার একটী বিহারী ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"Live a life worth living. Live for God and live for the world. Remain not simply a human being but make the best of your life and its opportunities to transform yourself into a highly spiritual and supremely potent force. Be strong in will and stout in heart. Be brave in hopes and steady in action (অনুবাদ:—বাঁচিবার মত বাঁচ। ভগবানের জন্য বাঁচ, জগতের জন্য বাঁচ। কেবল মানব-দেহধারী থাকিলেই চলিবে না, জীবনের এবং সুযোগসমূহের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার কর, যেন তোমার অস্তিত্ব একটা সুমহান্ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন এবং মহাবীর্য্যমণ্ডিত শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। সঙ্কল্পে দৃঢ় হও, সাহসে উদ্বুদ্ধ হও। আকাঙ্ক্ষায় নির্ভীক এবং কর্ম্মে সুনিষ্ঠ হও।)"

গুরুদক্ষিণা

শ্রীহট্ট-নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তুমি আমার সন্তান, তোমার গুরুদক্ষিণা ব্রহ্মচর্য্য প্রচার, সংযমের প্রসার ও

মনুষ্যত্বের বিস্তার। দীক্ষা পাইয়াছ কিন্তু গুরুদক্ষিণা দাও নাই। আজ হইতে তাহা দিবার জন্য কঠোরতপা এবং কঠোরকর্ম্মা হও। তোমার তপস্যাই তোমার বাক্য ও চেষ্টাকে অপরের পক্ষে অমোঘ করিবে। তোমার উদ্যমই নিতান্ত দুর্মেধা যুবককেও ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাতে বিশ্বাসী করিবে। ভগবন্নাম তোমাকে তোমার বল দিবে, ধৈর্য্য দিবে, সাহস দিবে, উৎসাহ দিবে। অবিরত শ্বাসে প্রশ্বাসে ত্রিলোক-পাবন মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিতে থাক এবং সাধন-পূত সদিচ্ছার প্রভাবে চতুর্দ্দিকের অনৈতিকতা-দূষিত বায়ু-মণ্ডকে শুদ্ধীকৃত ক র।”

নিজের ভিতরে ভগবানের শক্তি প্রকাশ পাইবার উপায়

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী একটী বাঙ্গালী বালককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“তোমার মত ছোট্ট একটি ছেলের ভিতরেও ভগবান বাস করেন। যতই সৎ হইতে, মহৎ হইতে চেষ্টা করিবে, ততই ভগবানের শক্তি তোমার ভিতরে প্রকাশ পাইবে।”

দৈব দুর্ব্বলেরই স্কন্ধের ভার

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী অপর একটী বাঙ্গালী যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“ব্রহ্মচর্য্যের মঙ্গলপ্রদ নিয়মাবলী পালন করিয়া কদর্য্য অভ্যাস ও কুৎসিত লালসার মস্তকে পদাঘাত হানিয়া মানুষ নামের যোগ্য হইবার চেষ্টা কর। সত্য বটে, চরিত্র-গঠনের পথে সহস্র বিঘ্ন বিরাজমান, কিন্তু অসীম পরাক্রম সহকারে স্বকীয় পুরুষকারকে জয়-গৌরবে মণ্ডিত কর। দৈব দুর্ব্বলের স্কন্ধেরই গুরুভার, কিন্তু সবল সাহসী যোদ্ধার পদতলে সে কৃতাঞ্জলিপুটে আনত নেত্রে অবস্থান করে। উজান নদীতে নৌচালন কঠিন বটে, কিন্তু উহাই নাবিকের সমধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাধা দেখিয়া টলিও না, বিঘ্ন দেখিয়া হঠিও না, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস কর, ভগবানের নামের শক্তিতে আস্থা স্থাপন কর, নিজের সকল শক্তিকে ভগবানেরই শক্তি জানিয়া আপাত-পরাজয়ে অনধীর হও এবং পরবর্ত্তী সংগ্রামের জন্য সকল শক্তিকে উদ্যত কর।”

ভগবচ্চিন্তাই ভগবদ্দর্শনের উপায়

দ্বারভাঙ্গা নিবাসী অপর একটী বাঙ্গালী ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"প্রত্যেক জীবের ভিতরে ভগবান বাস করেন। কিন্তু যে জন নিয়ত ভগবানের বিষয় চিন্তা করে, সে একদিন তাঁর অসীম কৃপার প্রতাপে নিজের মধ্যে তাঁকে দর্শন করে। তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার আপন হইয়া যায়, পর কেহ থাকে না। তখন মৃত্যুভয় দূরে যায়,—সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সে নিশ্চিন্ত নির্ভয়।"

গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্কার রাখিবে

আশ্রমের জনৈক কর্ম্মী কিছুদিন ধরিয়া উদরের নানাবিধ পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা স্বহস্তে তাঁহার নাভিতে দৈনিক বিশ ত্রিশ কলসী ঠাণ্ডা জল ঢালিতেছেন। জল ঢালিতে ঢালিতে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রস্রাব কর্ব্বার সময়ে তুই জল নিস্ ত ?

কর্ম্মী।—নিই।

শ্রীশ্রীবাবা।—সেই সময়ে জননেন্দ্রিয়টাকে বেশ ক'রে পরিষ্কার ক'রে ফেলিস্ ত ?

কর্ম্মী।—না।

শ্রীশ্রীবাবা। বোকা কোথাকার! পরিষ্কারই যদি না কর্লি, তবে জল নেবার উদ্দেশ্য কি? যতবার প্রস্রাব কর্ব্বি, ততবারই জননেন্দ্রিয় পরিষ্কার কর্ব্বি। গুপ্ত অঙ্গে প্রত্যেকবারই এক ঘটি ক'রে ঠাণ্ডা জল ঢালা খুব উপকারী। এই নিয়ম প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পালন করা উচিত। মলত্যাগে যেমন শৌচ প্রয়োজন, মূত্রত্যাগেও তেমন। ইহা অতীব প্রয়োজনীয় সদাচার।

গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্করণে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অপরিষ্কার উপস্থ পরিষ্কার করার জন্যে তৈল, সাবান বা সোডা কখনো ব্যবহার কর্‌বি না। ফিটকিরি মিশান জল বা ত্রিফলা ভিজান জল দিয়ে মাসে তিনবার ক'রে জননেন্দ্রিয় পরিষ্কার কর্লে তার ফল খুব ভাল হয়। অভাব পক্ষে শাদা জলই যথেষ্ট। অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন, ঘোলাটে,

ময়লা, অপবিত্র বা অন্য কার্য্যে পূর্ব্বে ব্যবহৃত জল কদাচ এই প্রয়োজনে স্পর্শও কর্ব্বে না।

গুপ্তস্থানের রোমাবলি কর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুপ্তস্থানের রোমাবলিকেও বেশী বড় হ'তে দিতে নেই। কিছুদিন পরে পরে কেটে ফেলা উচিত। ক্ষুর বা লোমনাশক সাবান ব্যবহার অত্যন্ত ক্ষতিকর! কাঁচি দিয়েই কাট্‌বি।

প্রলোভনের মুখে ঈশ্বর-কৃপা

বিকাল বেলা গ্রামের অনেকগুলি যুবক গুরুপাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন।

ভোগের প্রলোভন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রলোভন যত শক্তই হোক্, হাল যদি ছেড়ে না দাও, হঠাৎ ঈশ্বরকৃপার দুয়ার খুলে যাবে। প্রলোভনকে জয় করার জন্য তুমি যখন মরিয়া হ'য়ে উঠবে, তখনি ঈশ্বর-কৃপা আস্‌বে। কৃপা মানে ক'রে পাওয়া,—'কৃ' বল্‌তে বুঝায় করা, 'পা' বল্‌তে বুঝায় পাওয়া। "শ্রম কর, তার ফল পাবেই,"—এই হচ্ছে কৃপা শব্দের অর্থ। হাল ছেড়ে দিতে নেই, জয় তোমার হবেই; আশায় বুক বেঁধে পরাজিত হ'তে হ'তেও লড়াই চালাও।

হরষপুরের যুবকের প্রলোভন-জয়ে ঈশ্বর-কৃপা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দৃষ্টান্ত শুন্‌তে চাও? হরষপুর * এখান থেকে দূর নয়। ছনখোলাও * দূর নয়। হরষপুরের একটী ছেলে তার এক চপল-চরিত্রা বিধবা আত্মীয়ার মোহে পড়্‌ল, ফাঁদে সে পা দিল এবং কদর্য্য পাপে সে আসক্ত হ'ল। ছেলেটী যখন রাত্রে পড়্‌তে বস্‌ত, তখন বিধবা মেয়েটী কাছেই বিছানা পেতে ঘুমুবার ভাণ কর্ত্ত এবং যেন ঘুমের ঘোরেই অচেতনে হচ্ছে এই ভাব দেখিয়ে মেয়েটী তার কাপড়-চোপড় এদিক সেদিকে সরিয়ে রাখ্‌ত। তন্ময় হ'য়ে পরীক্ষার পড়া পড়্‌তে ব'সে ছেলেটীর এদিকে তেমন দৃষ্টিই পড়্‌ত

* ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রামদুইটির নাম বদল করিয়া দেওয়া হইল।

না। কিন্তু একদিনের ত' ব্যাপার নয়, রোজই এ রকম চলেছে, শেষে এ দৃশ্য রোজই ছেলেটীর চোখে পড়্‌তে লাগল। প্রথম প্রথম চিত্তচাঞ্চল্য তার একটুও আস্‌ত না। সে ভাব্‌ত,—"মেয়েটীর নিজ মনে সে প'ড়ে আছে, তাতে আমার কি ?" এই সময়ে যদি সে সাবধান হ'ত তবে বিপদ ঘট্‌ত না, কিন্তু নিজের পড়ার স্থান বদ্‌লে নেবার বুদ্ধিই তার মাথায় এল না। আস্তে আস্তে তার মনে কুবুদ্ধি জাগ্‌ল, পরস্পর পরস্পারের মনের ভাব জান্‌ল এবং দুজনই পাপের সমুদ্রে ডুব্‌ল। পরীক্ষার পড়া চুলোয় গেল, সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই তার পড়ার অভিনয় শেষ হত, পরীক্ষায় সে ফেল মার্‌ল। কিছুদিন পর তার খেয়াল হল,—"কচ্ছি কি ?" কিন্তু তখন আত্মদমনের আর ক্ষমতা নেই। একদিন যদি নিজেকে দমন ক'রে রাখে ত' তিনদিন চলে তার প্রতিশোধ। স্ত্রীলোকটীর প্রতি আসক্তি কমিয়ে ফেল্‌বার জন্য সে তার সঙ্গে নানা ছল্‌-ছুতা ক'রে ঝগড়া বাঁধাতে লাগ্‌ল, সংসার একটা দারুণ অশান্তির স্থান হ'য়ে পড়ল, একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার এরূপ ঝগড়ার রুচি দেখে গ্রামময় ছিঃ ছিঃ উঠ্‌ল, কিন্তু কদভ্যাসের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে, যাই রাত্রি হ'ল, অমনি এত ঝগড়ার পরেও দু'জনে মিলে যেত। এভাবে সকল সংগ্রামে হতাশ হ'য়ে সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'ল, ভগবান তাকে সদ্‌গুরু মিলিয়ে দিলেন। গুরুর কাছে কেঁদে কেঁদে সে সব নিবেদন কর্ল্ল। গুরু বল্লেন,—"ভয় কি, তাঁর নামে লেগে থাক্‌, সব জঞ্জাল দূর হ'য়ে যাবে।" কামও চল্‌তে লাগ্‌ল, নামও চল্‌তে লাগ্‌ল, এমন সময়ে কলেরা হয়ে মেয়েটী গেল মারা। ভগবান্‌ বন্ধন ঘুচিয়ে দিলেন। সেই ছেলেটী এখন এমন সংযমী হয়েছে যে, তাকে দেখ্‌লে তোমরা কেউ বিশ্বাসও কর্ত্তে পার্ব্বে না যে, তার জীবনে এই রকমের একটা কলঙ্কিত ইতিহাস আছে।

ছনখোলার যুবকের প্রলোভন-জয়ে ঈশ্বর-কৃপা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আরো দৃষ্টান্ত জান্‌তে চাও ? তবে শোন। ছনখোলা* এখান থেকে পঁচিশ মাইল দূর হ'তে পারে। এই গ্রামের একটী চাষার ছেলে মাটি

* ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রামটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইল।

কেটে ঝুড়িতে বোঝাই ক'রে সেই ঝুড়ি তার এক সধবা আত্মীয়ার মাথায় তু'লে তু'লে দিচ্ছিল,—একটা ঘরের পিঁড়া তৈরী হবে। সধবাটী যুবতী ও তন্বঙ্গী। মাথায় ঝুড়ি তুলে দেবার সময়ে কোনো কোনো বার তার স্তন যুবকটীর বুকে গিয়ে লাগ্‌ছিল। মেয়েটী ইচ্ছা ক'রেই এ কাজ কচ্ছিল কি দৈবাৎ এ ব্যাপার হচ্ছিল, তা' বলা কঠিন। একত্র কাজ অনেকক্ষণ ধ'রে কত্তে থাক্‌লে খুব সুস্তনী মেয়েমানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার স্তন অন্যের গায়ে লেগে যেতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপার থেকে যুবকটীর ভিতরে লালসা জেগে উঠ্‌ল! যুবকটী অবিবাহিত। সে প্রাণপণে আত্মদমনের চেষ্টা কর্ল্ল, কিন্তু তার ভাবভঙ্গীতে যুবতীটী বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ল যে তার মনে মন্দ ভাব এসেছে। যুবতীটী ছিল বাক্‌পটু ও বিদ্রূপ-পরায়ণা। সে এই নিয়ে আরম্ভ কর্ল্ল নানা নির্ল্লজ্জ পরিহাস কত্তে। এর ফল ভাল হল না। দুজনেই মহাপাপে ডুব দিল। যুবকটী ছিল সদ্‌গুরুর আশ্রিত, সে পাপের পঙ্কে ডুবেও প্রাণপণে চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল নিজেকে উদ্ধার কত্তে। কিন্তু পাপের একটা মাদকতা আছে। নেশার ঝোঁকে সে পাপের কাছে আত্মদান কত্ত, কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পাত্ত না। কেঁদে কেঁদে সে বুক ভাসিয়ে দিত, অনুতাপে তার চিত্ত বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌ত, সে প্রতিজ্ঞা কত্ত কিছুতেই আর এ মহাপাপ কর্ব্বে না। কিন্তু তারও প্রতিজ্ঞা করা হ'ল, যুবতীটীও তার কাছে এসে হাজির হ'ল, তখন আর সংযমের বাঁধন থাকৃত না। গুরুপাদপদ্মে গিয়ে ছেলেটী হাজির হ'ল, বল্ল,—"হয় আমার একটা উপায় করুন, নইলে বিষ খেয়ে মরব।" গুরু বল্লেন,—"যাও, বাড়ী গিয়ে সেই মেয়েটীকে আমার ছবিখানা দেখাও, আমার জীবনের সাধনার কথা বল, আমার ব্রতের কথা বল, আর, তুমি যে আমার শিষ্য তাও বল। তাকে অনুরোধ কর, আমাকে মাঝে মাঝে স্মরণ কত্তে, সম্ভব হ'লে ভালবাসতে। তার পরেও যদি দেখ যে লালসা যায় না, নির্ভয়ে সম্ভোগ কর, সম্ভোগকালে অনবরত আমাকে স্মরণ কর। এভাবে এখন চলুক, পরে আবার এসো।" যুবকটী কাঁদ্‌তে কাঁদতে বল্ল,— "আমি এলাম, রিপুঞ্জয় করার বুদ্ধি নিতে, আর আপনি বল্‌ছেন, সম্ভোগ কর।"

শিষ্য বাড়ী চলে গেল, মেয়েটীকে তার গুরুর ছবি দেখাল, তাঁর জীবনের নানা কাহিনী শুনাল, তাঁর জীবনের মহৎ ব্রতের কথা বুঝাল এবং তার গুরুকে নিজ গুরু ব'লে চিন্তা কত্তে সে অনুরোধ কল্ল। এ সবের ফলে যুবকটীর মনে সংযমের ভাব পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা বাড়্ল বটে, কিন্তু লালসা গেল না। একদিন সে পূর্ব্বাভ্যাস-মত সম্ভোগে রত হয়েছে, এমন সময়ে হঠাৎ স্ত্রীলোকটী উঠে বস্ল। যুবক জিজ্ঞাসা কর্ল্ল,—"ব্যাপার কি ?" যুবতীটী বল্লে,—"এমন গুরুর শিষ্য হ'য়ে তুমি এমন কাজ কর্ব্বে, আর আমি তোমাকে সাহায্য ক'রে নরকগামিনী হব, সে হবে না। এখনি তুমি এখান থেকে যাও, আর আমার সাম্নে কখনো এস না।" এতদিনে যুবকটী তার সংযমের পূর্ণ সামর্থ্যকে ফিরে পেল। এই ঘটনার পরে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হয়েছে। এখন যদি তুমি তাকে দেখ্তে যাও, তার প্রতি তোমাদের ভক্তির উদ্রেক না হ'য়ে পার্ব্বে না, এতটা আধ্যাত্মিক উন্নতিই সে করেছে।

গম্ভীরনাথ-শিষ্যের প্রলোভনে ঈশ্বর-কৃপা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গোরক্ষপুরের মহাত্মা গম্ভীরনাথের এক শিষ্য গিয়ে তাঁর পদতলে প'ড়ে বল্তে লাগলেন,—"প্রভো, এক পরনারীকে আশ্রয় দিয়ে তার সঙ্গ ক'রে আমার পাপময় দিন কাটুছে, আমার একটা উপায় করুন।" গম্ভীরনাথ বল্লেন,—"ওকে তাড়িয়ে দাও।" শিষ্য বল্লে,—"সে ক্ষমতা আমার নেই, ওর লালসায় আমি অন্ধ হ'য়ে গেছি।" গম্ভীরনাথ বল্লেন,—"তব্ সাদি কিয়ো, তবে ওকে বিয়ে কর।" শিষ্য বল্লে,—"সমাজের ভয়ে তাও করার উপায় নেই।" গুরু বল্লেন,—"তবে জোরসে নাম চালাও, বাকী যা হবার নামের বলে হবে।" শিষ্য প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেও যখন বিফল-মনোরথ হলেন, তখন গুরুদত্ত নামেই একান্ত চিত্তে ডুব দিলেন। সহস্রবার পদস্খলিত হ'য়েও তিনি লালসা-জয়ের আশা ছাড়্লেন না, শত পরাজয়ের মধ্যেই অফুরন্ত নাম-সেবা কত্তে লাগ্লেন। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন, সে কুলটা গৃহে নেই, সন্ধান নিয়ে জানলেন, অন্য এক পুরুষের প্রেমের আশায় স্বেচ্ছায় সে নারী অন্যত্র চ'লে গেছে। "যত পতিতই হ'য়ে

থাকি, লালসা-জয় কর্ব্বই”,—এরূপ জিদ ক’রে অবিরাম নাম-সেবা কত্তে কত্তে তাঁর উপরে অপ্রত্যাশিত ভাবে ঈশ্বর-কৃপা এসে গেল।

গোপীরমণ ঠাকুরের প্রলোভনে ঈশ্বর-কৃপা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এতক্ষণ দৃষ্টান্ত দিয়েছি তোমাদের মত সহজে ভঙ্গ-প্রবণ অগঠিত-চরিত্র যুবকের প্রলোভনে ঐশ্বরিক সহায়তার বিষয়ে। এখন একজন যোগী পুরুষের প্রলোভন-জয়ের কাহিনী বল্‌ব। গোপীরমণ ঠাকুর একজন সাধক ব্যক্তি। নানাস্থানে তাঁর অনেক শিষ্য আছে। তাঁর আগেকার জীবনের একটা চমৎকার কাহিনী শোন। হরিদ্বারে ইনি একবার কুম্ভমেলাতে যান। লোকের ধাক্কাধাক্কিতে একটি মথুরাবাসিনী যুবতী মেয়ে হঠাৎ জলে প’ড়ে যায়। লাফ দিয়ে ইনি জলে পড়েন এবং খরস্রোতার কবল থেকে নিজ প্রাণকে অত্যধিক বিপন্ন ক’রে মেয়েটীকে উদ্ধার করেন। মেয়েটীকে নিয়ে ইনি যখন তীরে উঠেন, তখন মেয়েটীও সংজ্ঞাহীন, ইনিও সংজ্ঞাহীন। মেয়ের আত্মীয়-স্বজনেরা দুজনকেই ধরাধরি ক’রে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলেন, সুস্থ হ’লে পরে দুজনকে নিয়েই তাঁরা মথুরা চ’লে গেলেন। গোপীরমণ ঠাকুর কিছু দিন মথুরা বাসের পরে তীর্থ দর্শনের জন্য অন্যত্র গমনে ইচ্ছা প্রকাশ কর্ল্লে মেয়েটী এবং তার মা-বাপ অনুনয় বিনয় ক’রে তাঁকে আরও কতকদিন রাখ্‌লেন। ক্রমে মেয়েটীর সাথে গোপী ঠাকুরের অত্যন্ত প্রণয় হ’য়ে গেল। তিনি যে সদ্‌গুরুর আশ্রিত, ভগবানকে লাভের জন্য যে পিতামাতা, আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ ক’রে বেরিয়েছেন, একথা তিনি ভুলে গেলেন, তাঁর ধ্যান-জপ চুলোয় গেল, তিনি ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ কর্ব্বার জন্য গৃহদ্বার বন্ধ ক’রে সকামা রমণীর মত্র হস্তধারণ কচ্ছেন, এমন সময়ে গৃহদ্বারে করাঘাত হল। দুয়ার খুলে তাকিয়ে দেখেন,—হিমগিরিবাসী গুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত। গুরু বল্লেন,—“স্ত্রীসম্ভোগে অমৃতত্ব পাবে না, যাতে অমৃতত্ব পাবে, তার জন্য চল আমার সাথে।” লজ্জিত শিষ্য গুরুর অনুবর্ত্তন কর্ল্লেন এবং দ্বাদশ বর্ষ পরে দেশে ফিরে এসে নিজ সাধন-বলে বহু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হ’লেন।

রহিমপুর
১২ই ভাদ্র, ১৩৩৯

ঈশ্বরের মধ্যে বাঁচ

অদ্য শেষ রাত্রে উঠিয়াই শ্রীশ্রীবাবা অসংখ্য পত্রের উত্তর দিতে বসিলেন। একজন দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী বিহারী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"Live a God-life. Know yourself always in Him and Himself always in you. Let not a single breath pass unheeded. Har dam la'ga' raho re bhai." (ঈশ্বরীয় জীবন যাপন কর। নিজেকে সর্ব্বদা তাঁর মাঝে অবস্থিত বলিয়া জানো। তাহাকে সর্ব্বদা নিজের মাঝে বিরাজমান বলিয়া অনুভব কর। একটী নিঃশ্বাস ও বৃথা যাইতে দিও না। হরদম্ লাগা রহো রে ভাই)।

ঈশ্বরে বিশ্বাস

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী একটী বাঙ্গালী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ঈশ্বরে বিশ্বাস কর এবং ঈশ্বরের শক্তিতেই জগতে দুর্লভ কীর্ত্তি অর্জ্জন কর।"

নারীরাই সোণার ভারতের নির্ম্মাণকারিণী

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে স্থানীয় সাহা-পরিবারের একটী মহিলা, শ্রীমান্ উমাকান্ত সাহার ভগ্নী, শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনে আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার নিকটে যোগ-বাশিষ্ঠের চূড়ালা-উপাখ্যানটী বর্ণনা করিলেন। বলিতে কি, এই উপাখ্যানটী শ্রীশ্রীবাবার অত্যন্ত প্রিয়।

উপাখ্যান বর্ণনের পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মনে করিস না মা, এসব মিথ্যা গল্প মাত্র। এসব কাহিনীতে অতিরঞ্জন থাক্‌তে পারে, কিন্তু সবই সত্য ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। চূড়ালার মত ব্রহ্মাজ্ঞা মেয়ে ভারতবর্ষে ছিলেন, একজন দুই জন নন, অসংখ্য ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ স্বামীদের অজ্ঞানান্ধতা দূর কত্তেন, তাঁদের ভিতরে সত্য চিন্তা, শ্রেষ্ঠ চিন্তা জাগরিত ক'রে দিতেন,

স্বামীদিগকে তপস্বী কত্তেন, স্বামীদের ভিতরের ব্রহ্মত্ব ফুটিয়ে তুল্‌তেন। এসবই অতীতের কথা, কিন্তু মা মিথ্যা কথা নয়। একবার ভারতে যে ঘটনা ঘটেছে, আবার তা ঘট্‌বে। তোদের মত মেয়েরা আবার ভারতকে সোণার মানুষে পূর্ণ কর্ব্বে। তোদেরই চেষ্টায় পুনরায় তোদের স্বামীরা মানুষ হবে, তোদের পুত্রেরা মানুষ হবে, ইন্দ্রিয়ের সেবা ছেড়ে সবাই অতীন্দ্রিয়ের সেবায় আনন্দ পাবে। বিশ্বাস কর মা, নারীরাই সোণার ভারত নির্ম্মাণ করবে। বিশ্বাস সঞ্চয়ই মহৎ কার্য্যের অর্দ্ধেক আয়োজন, এটা জান্‌বে।

ওঙ্কারের উচ্চারণ

শ্রীমান্ উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,---ওঙ্কারের উচ্চারণ কি বাবা ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ওঙ্কারের উর্চ্চারণ "ওম্"ও নয়, "অউম্"ও নয়, অবিচ্ছেদ ওম্ জপ কত্তে কত্তে, ঐ নামে মন লাগিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে নিজের ভিতর থেকে এমন একটা ধ্বনির অনুভব আসে, একটা continuous sound (অবিশ্রাম ধ্বনি), যার অনুরূপ কোনও ধ্বনি human alphabets (মানবীয় বর্ণমালা) দ্বারা fully expressed (সম্যক্ প্রকাশিত) হ'তে পারে না। মুখে যাকে ওম্ বলা হয়, that is nothing but the nearest approximation of Pranava (তাহা প্রণবের নিকটতম অনুরূপ-ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নয়)।

নাদ সাধন বা শব্দ যোগ

উমাকান্ত।---এমতাবস্থায় আমরা কি ভাবে কাজ ক'রে যাব ?

শ্রীশ্রীবাবা।—ওম্ বা ওঁ এতদুভয়ের যে উচ্চারণ মনে মনে জাগে, সেই উচ্চারণেই অবিরাম নাম ক'রে যাবে, আর, লক্ষ্য কত্তে থাক্‌বে যে, এর ভিতরে থেকে কোন্ অনুভূতি জেগে উঠছে। তানপুরা দিয়ে যখন গায়কেরা গান গায়, তখন তানপুরার চারটা তারের ঘেও-ঘেও আওয়াজ তার কর্ণকে গভীরতর সুরে প্রবেশ করবার উপলক্ষ্য রূপে থাকে। ঐ আওয়াজের মধ্যে কাণ লাগিয়ে রাখলে ক্রমশ সে "পা-সা-সা-সা" আওয়াজকে ভেদ ক'রে, আরও

কত স্বর, কত শ্রুতি ওর ভিতরে লক্ষ্য কত্তে পারে। এজন্য খুব বড় যোগী হবার দরকার পড়ে না। কিছুদিন অভ্যাসের পর যে-কোনও তানপুরা-সঙ্গতের গায়ক সেই অপ্রকটিত স্বরলহরী শুন্‌তে পায় ও উপলব্ধিতে আন্‌তে পারে। ওঙ্কার-সাধকেরও তাই। মনে মনে "ওম্" "ওম্" উচ্চারণ ক'রে যাও, আর লক্ষ্য কত্তে থাক, এই "ওম্" "ওম্" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ধ্বনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ কচ্ছেন। কিছুদিন অভ্যাস কর্লেই একটা অনির্ব্বচনীয় নাদের স্ফূরণ টের পাবে। সেই নাদ-স্ফূরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে বিশ্বাস, আনন্দ ও উৎফুল্লতার উদয় হ'তে থাক্‌বে। একেই বলে নাদ-সাধন বা শব্দযোগ।

প্রাণলয় বা শ্বাস-যোগ

উমাকান্ত।—শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপ কত্তে গেলে ত' আপনার কথিত প্রণালীতে কাজ ঠিক্ ঠিক্ হয় না।

শ্রীশ্রীবাবা।—প্রথমে হয় না। কারণ, শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ নাদ-সাধনের বা শব্দ-যোগের নীচের থাকের প্রণালী। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ-কালে মন থাকে শ্বাসেই সমধিক, নামকে তার সঙ্গে অবিরাম যুক্ত ক'রে রাখবার জন্য যতটুকু মনোযোগ নামে দিতে হবে, মাত্র ততটুকু নামের দিকে থাকে। অতএব, শ্বাসই এখানে প্রধান, নাম কতকটা অপ্রধান। এই প্রণালীকে বলা হয় প্রাণলয় বা শ্বাসযোগ। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থিরতা লাভ এই প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য। এই প্রণালীতে নামের সাধন কত্তে কত্তে শ্বাস এমন স্ববশে এসে যায় যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান-পতন আর মনকে চপল কত্তে পারে না। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাস-বর্জ্জিত স্থির-প্রাণ অবস্থাও এতে এসে যায়। সেই যে স্থিরপ্রাণ অবস্থা, তা শব্দযোগ বা নাদসাধনের পক্ষে খুব অনুকূল। এই জন্যই শব্দযোগীরাও শ্বাসযোগের চর্চ্চা ভক্তিভরেই ক'রে থাকেন।

রূপ-সাধনা

উমাকান্ত।—কিন্তু রূপধ্যানের বিষয়ে কি করা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যেক নামই এক একটা নির্দ্দিষ্ট রূপকে suggest

করে (ইঙ্গিত দেয়)। যেমন, ক্লীং নাম কৃষ্ণ-মূর্ত্তির ইঙ্গিত দেয়। ক্রীং মন্ত্র কালী-মূর্ত্তির ইঙ্গিত দেয়। ওঁ এই মন্ত্র এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্টরূপের ইঙ্গিত দেয় না। ওঙ্কার সকল নামের সার, সকল নামের সমাহার, সকল নামের প্রাণ, সকল নামের সর্ব্বাবয়ব। এ'কে বলা চলে বিশ্বনাম। সুতরাং ওঙ্কার ইঙ্গিত দেয়, বিশ্বমূর্ত্তির। বিশ্বমূর্ত্তি কোনও চিত্রপটে আঁকা চলে না। কোনও ভাষায় তার বর্ণনা সম্ভব হয় না, তিনি রূপহীনও নন, তিনি অপরূপ, অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ তাঁর রূপ, ভাষায় সীমাবদ্ধ নয় সেই রূপ, তুলিকায় সীমাবদ্ধ নয় সেই রূপ, সপ্তবর্ণেত নয়ই, ত্রিসপ্তকোটী বর্ণেও সেই রূপ-বৈচিত্র্যের ইতি হয় না, এমন তাঁর রূপ। সেই রূপকে পূর্ব্ব থেকেই কল্পনায় আনা চলে না। অতএব সাধক নিবিষ্ট চিত্তে পবিত্র ওঙ্কার জপ কত্তে কত্তে লক্ষ্য ক'রে যাবেন যে, কোন্ নাদ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে প্রতিনাদিত হ'য়ে উঠ্ছে, আর তার সঙ্গে কোন্ রূপ আপনি নিজেকে ফুটিয়ে তুল্ছে। জোর ক'রে রূপ ফুটাবার দরকার নেই, নাম ক'রে যাও, আর চখের সামনে পুঞ্জীভূত অন্ধকার কখনো গভীর, কখনো তরল হ'য়ে ক্রমাগত যে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে নানা রূপ ধরছে, তাকে লক্ষ্য ক'রে যাও। সেই রূপের মাঝে তোমার অভিনিবেশকে ঠেলে নিয়ে গুঁজে দিতে হবে না, শত চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল রূপ-বৈচিত্র্য নিজের ভিতরে নিজে আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে যখন একটা স্থায়ী স্থির অচপল বিগ্রহে গিয়ে আপনি দাঁড়াবে, তখন তাতে দেবে চিত্তকে যোগ ক'রে। তখন নাম আর রূপ এক অভেদ বস্তুর অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে স্পষ্টই তোমাতে অনুভূত হবে।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—অনেক সাধনপন্থীরা আছেন, যাঁরা শুধু রূপকে নিয়েই ব্রহ্মে মজেন। কিন্তু নাম ছাড়া রূপকে ফুটান যায় না। এজন্যই স্বীকার কত্তে হয় যে শব্দযোগই অপর পন্থাগুলির আদি ভিত্তিভূমি।

সাধনই অনুভূতির প্রকৃষ্ট উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুনে রাখ্‌লি এই পর্য্যন্ত। শেষ তক্ সব হয়ত' তোর মনেও থাক্‌বে না। কারণ, সাধন ছাড়া কখনো অনুভূতি জন্মে না।

শত বাক্যালাপে যে বিষয় বুঝা যায় না, অল্পক্ষণের নিবিষ্ট সাধনেও সেই অনুভূতি জাগে। আমার সন্তান ব'লে তোরা সর্ব্বত্র গর্ব্বানুভব করিস্। আমি বলি, আমার যারা সন্তান, সবাই প্রাণপণে সাধক হ। সাধনাই সৌভাগ্যের প্রসূতি।

ভোগাসক্তি দমনের উপায়

শ্রীমান্ উমাকান্ত তার ভগ্নীকে লইয়া চলিয়া গেলে পরে, দক্ষিণপাড়ার একটি বিবাহিত যুবক নিজ কতকগুলি মানসিক বিঘ্নের কথা শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইন্দ্রিয়-সুখের আসক্তি ভয়ঙ্কর। যে আস্বাদ করেছে তারও, যে আস্বাদ করে নি, তারও। দিল্লীর লাড্ডু-বিশেষ, যো খায়া সো বি পস্তায়া, যো নেহি খায়া সো বি পস্তায়া। এ আসক্তি যখন জগতের সকল লোককেই ঘোল খাইয়েছে, তখন তোমার মনে আসক্তি আছে ব'লেই তুমি নিজেকে অধম পামর মনে ক'রে হতাশ হ'য়ে যেয়ো না। আসক্তি আছেত' থাকুক, তুমি প্রাণপণে নিজেকে ভগবানের পায়ে অর্পণ করার চেষ্টা কত্তে থাক। তোমার ইন্দ্রিয়নিচয় ভগবানের, তাদের উদ্দাম চাঞ্চল্যও ভগবানের। তোমার মনপ্রাণ সব ভগবানের, মনের দুর্ব্বার আসক্তিও ভগবানের। এই ভাবনার সাধনা কর, সিদ্ধিদাতা তোমাকে অচিরেই সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় ক'রে গ'ড়ে তুল্‌বেন।

মনের পাপ

জিজ্ঞাসু আরও কিছু নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মনে মনে ইন্দ্রিয়-সেবা করেছ, তাতে কি হয়েছে? আগে করেছ, ত, এখন আর করো না। দেহের খাঁচার মধ্যে থেকে দেহের প্রভাবকে সহজে অতিক্রম করা যায় না। এজন্য অতিমাত্র হতাশ হওয়া কাজের কথা নয়। যে মন অভ্যাসবশে বারংবার অসংযত চিন্তা করেছে, সেই মনকে অভ্যাসবশেই সংযত কর। বিশ্বাসের বলে মনকে তাজা কর।

হতাশ এবং নিরুদ্যম হ'য়ে প'ড়ো না। জৈব কারণে যদি কারো মনে কখনো পাপ কামনা জেগে উঠে, অমনি নিজেকে মহাপাপী মনে না ক'রে বিবেকের বলে বিচারের অঙ্কুশাঘাতে, সৎসঙ্গের গুণে, ভগবানের নামের শক্তিতে, অবিশ্রাম পরকল্যাণ কর্ম্মে আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়ে সেই কামনাকে দূর ক'রে দাও।

ভোগলিপ্সা জাগিবার কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সঙ্কল্পকে দৃঢ় কর, অবিরাম নাম কর, অনুক্ষণ নিজেকে ভগবানের পায়ে অর্পণ কত্তে থাক, আর ভোগলিপ্সার উত্তেজক কারণ সমূহ থেকে প্রাণপণে দূরে থাক। এক এক জনের এক এক কারণ থেকে ভোগলিপ্সার উত্তেজনা আসতে পারে। এজন্য আত্মবিশ্লেষণ ক'রে দেখা দরকার। মনকে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর, খুঁজে দেখ, তোমার ভোগ-লিপ্সার উত্তেজনা কোথা থেকে আসে। যেই খুঁজে পেলে উত্তেজনার মূল কোথায়, অমনি তাকে বর্জ্জন কর। নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন কর, নিষ্ঠুর ভাবে বর্জ্জন কর। ভোগলিপ্সার উদ্দীপনের অনেক কারণ থাকতে পারে। যারা সম্ভোগপরায়ণ কামুক বা যারা এসব বিষয়ে আলাপ কত্তে ভালবাসে, তাদের সঙ্গ মনকে দুর্ব্বল কত্তে পারে। যাদের পরিবার-মধ্যে সংযমের সমাদর নেই, নর-নারী নির্লজ্জ ও উদ্দাম, তাদের সংসর্গে মন উন্মার্গগামী হ'তে পারে। ভোগোত্তেজনা-মূলক গ্রন্থ পাঠ, ভোগলিপ্সু নর-নারীর চরিত্রালোচনা, ভোগবাদীর চিত্র দর্শন প্রভৃতির দ্বারা ভোগোত্তেজনা আস্‌তে পারে। ছবিতে বা কার্য্যে ভোগ-দৃশ্য দর্শন ভোগোত্তেজনাকে জাগাতে পারে। তাই এসব বর্জ্জন ক'রে চলা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য হবে।

ভোগোত্তেজনা প্রশমনের চরম পন্থা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— কিন্তু এসকল প্রাথমিক পন্থা। চরম পন্থা হচ্ছে, ভগবানকেই সকল ভোগের মালিক ব'লে জ্ঞান করা, নিজেকে বা জগৎকে ভোগের কর্ত্তা ব'লে কণামাত্র ধারণা বা অভিমান না রাখা। উদ্যানে কোটি

•কোটি ফুল ফুটছে, সব ফুলের মধু ভ্রমরে শেষ কত্তে পারে না, সব ফুলের সৌরভ মানুষে নিতে পারে না। এসব সম্পূর্ণরূপে ভোগ কচ্ছেন ভগবান্ স্বয়ং। মানুষের নাক দিয়েও তিনিই সৌরভ গ্রহণ কচ্ছেন, ভ্রমরের মুখ দিয়েও তিনিই মধু পান কচ্ছেন। জগতের সকল স্ত্রীপ্রাণীকে তিনিই ভোগ কচ্ছেন পুরুষ প্রাণী হ'য়ে, জগতের সকল পুরুষপ্রাণী হ'তে তিনিই তৃপ্তি সংগ্রহ কচ্ছেন, স্ত্রীপ্রাণী হ'য়ে। তোমার চ'খে যদি হঠাৎ সে দৃশ্য প'ড়েই গেল, কাণে যদি হঠাৎ সে ঘটনার বর্ণনাই এল, তাতে তোমার বিক্ষোভের বাবা কোনও কারণই নেই। ভগবান নিজের তৃপ্তির জন্য তাঁর কাজ যেখানে যা' ইচ্ছা করুন, তাতে তোমার উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হবার কি আছে? ঐরাবত থেকে ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত, দেবতা থেকে বনমানুষ পর্য্যন্ত কারও ভোগের ক্ষমতা নিজের আয়ত্তে নয়। সব ভোগের ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেই অবস্থিত, তিনি যখন যে আধারের ভিতর দিয়ে যে ভাবে যতটুকু ভোগ কত্তে চান, কত্তে পারেন। তোমার জন্য ভোগের ক্ষমতা যখন স্বায়ত্ত নয়, তখন কেন তুমি বৃথা ইন্দ্রিয়-লালসায় নিজেকে বিচলিত হ'তে দেবে বাবা?

ভগবানকে কর্ত্তা কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— নিজের স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হ'য়ে যাও। নিজেকে ভগবানের কোলে ফেলে দাও। ভোগ, ত্যাগ সব তাঁর হ'য়ে যাক্। ত্যাগেরও অভিমান তুমি ক'রোনা, ভোগেরও অভিমান তুমি ক'রো না। ত্যাগের মালিকও তিনি, ভোগের মালিকও তিনি। তুমি তাঁকে তোমার জীবন-তরণীর কর্ত্তা কর, তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব হউন, তিনিই তোমার সর্ব্বেশ্বর হউন।

বিদ্যার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা

কিছুকাল হইতে একটী চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক পিতৃগৃহ ছাড়িয়া ভগবানের ডাকে শ্রীশ্রীবাবার পাদ-প্রান্তে আসিয়া আশ্চর্য্য নিষ্ঠার সহিত সর্ব্ববিধ পরিশ্রম করিতেছে।

এই বালকের প্রসঙ্গ উঠিতেই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ছেলেদের লেখাপড়া

শিখিয়ে উপযুক্ত ক'রে তোলা দরকার। জীব-সেবা কত্তে হ'লে ত্যাগ এবং তপস্যার সঙ্গে বিদ্যার্জ্জনেরও প্রচুর আবশ্যকতা রয়েছে।

বিনয় ও বিদ্যা

পরে শ্রীশ্রীবাবা পুনরায় বলিলেন,—কিন্তু সবক্ষেত্রেই "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" ব'লে অপেক্ষা না ক'রে "বিনয়ো দদাতি বিদ্যাং" কথাটাও মনে রাখা উচিত। বিদ্যার্জ্জনের জন্য দুর্ব্বিনয় বিদ্যাকে অবিদ্যায় পরিণত করে। বিনয় বিদ্যাকে যত সহজ-লভ্য করে, অন্য কিছুই তা করে না।

দৃষ্টান্তের শক্তি

সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ রায় ইংরাজী পড়া বুঝিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবার নিকটে আসিলেন। সত্যভূষণ স্থানীয় হাইস্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র।

শ্রীশ্রীবাবা পড়াইতে পড়াইতে বলিলেন,—মানুষ তার কাণথেকে তার চোখকে বেশী বিশ্বাস করে। এজন্যই সহস্র উপদেশ :থেকে একটি দৃষ্টান্তে কাজ বেশী হয়। আমরা যখন সৎভাবে চলি, তখন নিজেদের অজ্ঞাতসারে অপরকে সংশোধন করি। নিজেরা ভালভাবে চ'লে অপরকে ভাল হবার পথে যেরূপ সাহায্য আমরা কত্তে পারি, এমন আর পারিনা কিছুতেই। একটি ঘড়ি যদি সময় ঠিক রাখে, তবে তার সঙ্গে মিলিয়ে শত শত ঘড়ি ঠিক হ'তে পারে। যে ঘড়ি সময় ঠিক রাখে না, তার সঙ্গে মিলাতে গিয়ে আবার হাজার ঘড়ি ভুল চলে। আমি ভাল হ'লেও লোকে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্ব্বে, আমি মন্দ হ'লেও একদল লোক আমার অনুসরণ ক'রে মন্দ হ'তে থাকবে। দৃষ্টান্ত যেন সংক্রামক ব্যাধি। একটা সহরকে সহর চরিত্রহীন লম্পটের দ্বারা পূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে, যদি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি চরিত্রহীনতা ও লাম্পট্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আচরণের বর্জ্জনীয় অংশ পর্য্যন্ত লোকেরা অন্ধের মতন অনুকরণ করে। একটা দেশকে দেশের যুবকেরা কেমন ক'রে চুল ছাঁট্‌বে, কেমন সুরে কথা কইবে, কতখানি লম্বা পাঞ্জাবী পরবে, কেমন ঢংএ চল্‌বে, এসবও অনেক সময়ে একটি বড় মানুষের আচরণের অনুকৃতির মধ্য দিয়ে

প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। দৃষ্টান্তের শক্তি এত অদ্ভুত। একটা জাতিকে জাতি হয় ত বিলাসী নটের সম্প্রদায়ে পরিণত হ'য়ে যেতে পারে একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তির নট-বিলাস দে'খে, আবার, একটা দেশকে দেশ হয়ত অর্দ্ধনগ্ন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত হ'য়ে যেতে পারে, একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সর্ব্বসুখ-বিলাস বর্জ্জন দেখে।

দৃষ্টান্ত কি ভাবে ক্রিয়া করে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দৃষ্টান্ত কিভাবে ক্রিয়া করে, জানো? এক দিন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বাগ্মিতার প্রবাহে কি বলেছিলাম বা সহস্র করতালি সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে জনমণ্ডলীর সমক্ষে কত টাকা দান ক'রে ফেলেছিলাম, দৃষ্টান্ত অনুসরণকারীরা তার দিকে বড় তাকায় না। একাদশীর উপবাসের দিন আমি কত লক্ষবার হরিনাম জপ কল্লুম, তা' হয়ত লোকে লক্ষ্যও কর্ব্বে না, তারা খুজ্‌বে আমি প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বাকী চৌদ্দ দিন কি ভাবে কাটাই, তার ইতিহাস।

ক্ষুদ্র ব্যক্তির দৃষ্টান্তও লোকে অনুসরণ করে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু বড় বড় লোকদের দৃষ্টান্তই যে লোকে অনুসরণ করে, তা নয়, ক্ষুদ্র ব্যক্তির দৃষ্টান্তও লোকে অনুসরণ করে। অনেক সময়ে লোকচক্ষে নগণ্য ব্যক্তির দৃষ্টান্তই অসংখ্য লোকে অনুসরণ ক'রে তাকে লোকচক্ষে বড় ক'রে দেয়। যেমন নফর কুণ্ডু। কেউ বড় তাঁকে চিন্‌ত না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে দিলেন মুদ্দফরাসের জীবন রক্ষা কত্তে। অনেকে তাঁর জীবনকে অনুসরণ করেছেন। অপ্রসিদ্ধ একটি জোয়ান অব আর্কের দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র ফরাসী কৃষককে মহাবীরে পরিণত কর্ল্ল এবং তার পরে জোয়ান লোকচক্ষে বড় হলেন। তুমি বড়মানুষ নও, তাই ব'লে তোমার মনে কর্‌বার কোনো হেতু নেই যে, তোমার দৃষ্টান্তকে লোকে অনুসরণ কর্ব্বে না। যত ক্ষুদ্রই তুমি হ'য়ে থাক না কেন, তোমার দৃষ্টান্তও অপরের ইষ্ট বা অনিষ্ট কত্তে পারে।

উদ্দেশ্য ও উপায়ে দৃষ্টান্তের প্রভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— উদ্দেশ্য তোমার যতই মহৎ হোক, উপায় যদি হয়

অসৎ, তবে লোকে তোমার অসদুপায়ের কুদৃষ্টান্তটুকুই অনুসরণ কর্ব্বে, তোমার উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিই দেবে না। জগতে অনেক সৎকাজ অসৎ উপায়ের দ্বারা সম্পাদনের চেষ্টা হ'য়ে থাকে। তাতে সৎকাজটি হোক আর না হোক্, জগতে অসদুপায় গ্রহণের জন্য বিস্তৃততর ক্ষেত্রই মাত্র তৈরী হ'তে থাকে।

জীবনের মহালক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবার দুইজন প্রিয় ভক্ত দ্বারবঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত দর্শনে অনেক বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালী বালক ও যুবকেরা সত্য জীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা সেই সকল যুবককে আজ শেষ রাত্রে উঠিয়া পত্র লিখিতেছেন।

একজনকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জীবনের লক্ষ্য নহে রমণীর প্রেম
জীবনের লক্ষ্য নহে লালসা-পূরণ,
জীবনের লক্ষ্য নহে ইন্দ্রিয়-বিলাস,
জীবনের লক্ষ্য নহে ধন-উপার্জ্জন,
জীবনের লক্ষ্য নহে যশ, লোকমান,
লক্ষ্য,—জগতের তরে আত্ম-বলিদান।

"এই মহালক্ষ্য লাভে বাহু চাহে বল,
হৃদয় উৎসাহ চাহে, সঙ্কল্প প্রবল,
মন চাহে একনিষ্ঠা, তীব্র একাগ্রতা,
বীর্য্যের ধারণা চাহে ক্ষীণা দেহলতা,
পবিত্র দর্শন চাহে নয়ন-যুগল,
পবিত্র বচন চাহে রসনা চঞ্চল,
কর্ণ চাহে ঈশ্বরের প্রেমময়ী কথা,
স্পর্শেন্দ্রিয়—সংযমের নির্ম্মল শুদ্ধতা,
—এসব প্রার্থনা তোরে পূরিতে হইবে,
জীবনের মহালক্ষ্য তবে লাভ হবে।"

জীবন-গঠনের ইঙ্গিত

দ্বারভাঙ্গা রাজ হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর একটী ছাত্রের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জীবন-গঠনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হও। চরিত্রবল লাভ করিতে হইবে, মনোবল লাভ করিতে হইবে, বাহুবল লাভ করিতে হইবে। আত্মরক্ষা ও আর্ত্তত্রাণের জন্য যত প্রকার সদ্‌গুণ উপার্জ্জন প্রয়োজনীয়, সবই একান্ত নিষ্ঠা ও অসীম আত্মবিশ্বাস সহকারে আয়ত্ত করিতে হইবে। সংযমী হও, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হও, সদাচারী হও। সদ্‌গ্রন্থ, সচ্চিন্তা ও সৎসঙ্গের বলে নিজের যাবতীয় দুর্ব্বলতা বিদূরিত কর, পাপবুদ্ধি প্রশমিত কর, পুণ্যের পবিত্র জ্যোতিতে জীবনাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া লও, জগতে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা সঞ্চয় কর। প্রত্যহ উপাসনা করিবে, প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে, প্রত্যহ নিজের চরিত্রের দোষগুণ বিশ্লেষণ করিবে, প্রত্যহ নিজেকে পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা শুদ্ধতর, পবিত্রতর, উন্নততর করিবার জন্য প্রয়াসী থাকিবে। প্রত্যহ কোনও না কোনও পরোপকার সাধন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুশীলনে চেষ্টিত থাকিবে।"

সাধুসঙ্গ

দ্বারভাঙ্গার অপর একটী ছেলের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সাধুসঙ্গের সুফল অপরিসীম। যে যাহার সঙ্গ করে, সে তাহার মত হইয়া যায়, নিয়ত সঙ্গলাভের দ্বারা এক ব্যক্তির সদাচার-প্রবণতা ও ভাবভক্তির গভীরতা অনেকটা অজ্ঞাতসারেই অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং সাধুসঙ্গ ও সাধুজনের উপদেশ গ্রহণকে জীবনের সার্থকতা-সম্পাদনের এক সুমহান উপায় বলিয়া জানিবে।

"কিন্তু সাধুজনের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য সকল সময়ে সুলভ নহে। তখন মনের দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গ করিতে হয়, মনের দ্বারা নিজেকে সাধু-সমীপে উপনীত করিতে হয় এবং মনেরই দ্বারা তাঁহাদের মধুময়ী বাণী শ্রবণ করিতে হয়। সৎগ্রন্থপাঠ এই মানসিক সৎসঙ্গের পরম সহায়ক। * * * ভগবানই জগতে পরম সদ্‌বস্তু, তাঁর নামের সঙ্গই শ্রেষ্ঠ সৎসঙ্গ।"

অদৃশ্য সহায়

দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাইস্কুলের জনৈক উচ্চশ্রেণীর ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে লিখিলেন,—

"উত্থান-পথ পিচ্ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু যাহারা উঠিতেই চাহে, নামিতে চাহে না. চলিতেই চাহে, থামিতে চাহে না, সর্ব্বদাই যে তাহাদের আত্মোন্নতি-সাধন-পথে অপ্রত্যাশিত সহায় মিলিয়া যায়, একথাও সমান সত্য। শতসিংহ-বিক্রমে, অযুত হস্তীর বল লইয়া, অপরাজেয় পৌরুষে অগ্রসর হইতে থাক। মঙ্গলময় প্রভু প্রতি পদবিক্ষেপে তোমার সাথে থাকিয়া হাতে ধরিয়া অদৃশ্যভাবে তোমাকে টানিয়া নিবেন।"

বীর্য্যই ব্রহ্ম, বীর্য্যই প্রাণ

লাহেরিয়া-সরাই হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর জনৈক ছাত্রের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"লক্ষ্য যার মহাউর্দ্ধে, মন যার উচ্চগামী, তারই জন্য জগতের সকল শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধি। সংযমী হও, সদাচারী হও, বীর্য্যধারণে দৃঢ়সঙ্কল্প হও। বীর্য্যই ব্রহ্ম, বীর্য্যই প্রাণ,—বীর্য্যক্ষয়ই নাস্তিকতা, বীর্য্যহীনতাই মৃত্যু।"

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু

দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জগতে যত কিছু সুন্দর বস্তু আছে, তন্মধ্যে আমার বিবেচনায় চরিত্রবান কিশোরের পবিত্র মুখমণ্ডলের মত সুন্দর আর কিছুই নাই। চরিত্রের দীপ্তিতে যাহা উজ্জ্বল, ব্রহ্মচর্য্যের ভাতিতে যাহা জ্যোতির্ম্ময়, আত্মবিশ্বাসের স্থিরতায় যাহা প্রশান্ত, আত্মপ্রসাদের বিভূতিতে যাহা প্রসন্ন, এমন সুন্দর মুখগুলি দেখিবারই লোভে আমি লোলুপ অন্তরে দেশ-দেশান্তরে পর্য্যটন করি, দীন কাঙ্গালের মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াই। শুধু আমিই নহি, জগৎজোড়া সকল মানব এমন সুন্দর মুখের জ্যোৎস্নামাখান

কমনীয় কান্তি দর্শনের জন্য ব্যাকুল। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মুখে, যীশু, বিবেকানন্দ, জগদ্বন্ধুর মুখে এই কান্তি ছিল, এই জ্যোতি ছিল, এই প্রভা ছিল,—তাই দেখ, কতজন তাঁহাদের স্মৃতি বুকে ধরিয়া অবহেলে আত্মবিলোপ করিয়া গেল। ব্রহ্মচর্য্যের বলে তোমরা তেমন হও, আমার নয়ন-মন-ভোলা অপরূপ রূপ লইয়া চ'খের সুমুখে দাঁড়াইয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ কর।"

সুন্দরের উপাসনা ও ভারতীয় সভ্যতার পুরাতন চেতনা

দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর জনৈক ছাত্রের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"পবিত্রতায় যে সুন্দর, সংযমে যে সুন্দর, সেই যথার্থ সুন্দর। জগতে আর যত সুন্দর, সবই অসুন্দর, সবই কদর্য্য, সবই কুৎসিত।

"ভারতের ঋষিরা সুন্দরের উপাসক ছিলেন, তাই তাঁরা সংযমকে, ব্রহ্মচর্য্যকে, আত্মজয়কে শিক্ষার মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই মূল কয়েক শতাব্দীব্যাপী বহিঃসভ্যতার সংঘর্ষে উৎপাটিতপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে নবরূপে নববেশে ভারতীয় সভ্যতার নব বিকাশ তোমাদের উপর নির্ভর করে। যদি তপস্বী হও, পুনরায় মহামহীরুহ ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যোজনব্যাপী শিকড় চালাইবে, পুনরায় তার দেশদেশান্তরব্যাপী শাখা-প্রশাখা স্নেহের শীতল ছায়া বিলাইয়া জগতের সকল শত্রুকে বন্ধু করিবে, সকল পরকে আপন করিবে।

"কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ক্ষীণ এক নবীন আত্মচেতনাকে দেখা যাইতেছে। তোমরা তোমাদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই চেতনার পূর্ণ জাগরণ সম্পাদন কর। অভারতীয় সভ্যতার মদির-লালসা ও উন্মত্ত অসংযম ভারতীয় তপস্যার যতটুকু ক্ষতি করিয়াছে, তোমরা তোমাদের জীবনের সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনার দ্বারা তাহার চতুর্গুণ পূরণ করিয়া লও।"

অপবিত্র পারিপার্শ্বিকে দেহমনকে পবিত্র রাখিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমীয় কর্ম্মীদের সহ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী পোদ্দারের ভবনে মাধ্যাহ্নিক ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।

আহারান্তে শ্রীযুক্তা বিনোদিনী সাহা ও শ্রীযুক্তা অবলা পোদ্দার কতকগুলি প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কি নারী, কি পুরুষ, সকলেরই জন্য জান্‌বে, ঐ একই উপদেশ, যে উপদেশ আমি শত শতবার প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকলকে দিয়ে আসছি, এবং যে উপদেশ আমি নিজে প্রাণপণে নিজের জীবনে পালনের চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি। সেটী হচ্ছে, অবিরাম নিজেকে ভগবানের পুজার অঞ্জলি ব'লে মনে করা, নিজেকে ভগবানের ভোগের নৈবেদ্য ব'লে জ্ঞান করা, নিজেকে ভগবানের সেবার গঙ্গাজল ব'লে ধ্যান করা। এই ভাবটার যত কর্‌বে অনুশীলন, ততই হবে তোমার মন পবিত্র, চিত্ত পবিত্র, হৃদয় পবিত্র। হিন্দু বিধবা বাহ্যত ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করে বটে, কিন্তু তার জন্য পবিত্র পারিপার্শ্বিক নেই। অনেক বিধবাকে এমন সব পরিবারে আমৃত্যু জীবন কাটিয়ে দিতে হচ্ছে, যেখানে তার চখের সামনে পবিত্রতার দৃষ্টান্ত নেই, কাণে পবিত্রতার বাণী পৌঁছে না। সেই অবস্থাতেও সে নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্র রেখে চল্‌তে পারে, দেহে মনে প্রাণে পূর্ণ নির্ম্মলতা বজায় রাখ্‌তে পারে, এমন কি পরিবারের আবহাওয়া পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত ক'রে দিতে পারে, যদি সে নিজেকে ভগবানের পূজার অঞ্জলি ব'লে অহর্নিশ ধ্যান জমাতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে সত্যি সত্যি সে তার দেহ-মন দিয়ে দিব্য সৌরভ ছড়াতে আরম্ভ করে, সংসারে সহস্র অপবিত্রতার পূতিগন্ধকে সেই পরম সৌরভের মহিমায় সম্পূর্ণ দূর করে সে দিতে পারে।

ধর্ম্মার্থে উলঙ্গ থাকা

অপরাহ্নে নিজ নিজ বিহিত ধ্যানজপাদির পর শ্রীশ্রীবাবা কথা প্রসঙ্গে আশ্রমীয় কর্ম্মী বালকদের নিকটে নাগা সাধুদের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন।

জনৈক ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা বাবা, এই যে সাধুরা একেবারে উলঙ্গ থাকেন, এর তাৎপর্য্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেকে মনে করেন, উলঙ্গ হ'য়ে ঈশ্বর-ভজনা কর্লে ধর্ম্ম হয়, তাই থাকেন। অনেকে লজ্জা জয় করার জন্য থাকেন। কেউ কেউ

নিজ নিজ সুপ্ত প্রবৃত্তিকে অনুসন্ধান ক'রে বে'র করার জন্য থাকেন। অনেকে অভ্যাসবশত থাকেন, অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। অনেকে বস্ত্রের অধীনতা স্বীকার কত্তে চান না, এই জন্য উলঙ্গ থাকেন। কেউ মনে করেন,—"বিশ্ব-মাতার পবিত্র ক্রোড়ে যখন অবস্থান কচ্ছি, তখন মায়ের কোলের শিশুর আর কাপড়-পরার দরকার কি?" এইরূপ নানা ভাব থেকে নানা জনে উলঙ্গ থাকেন।

উলঙ্গ থাকার কুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু উলঙ্গ থাকার সুফল বা প্রয়োজনীয়তা এদের নিজেদের পক্ষে যতই বিরাট বা গভীর হউক, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সব সময়ে এই দৃষ্টান্ত মঙ্গলকে প্রসব করে না। বর্ত্তমান মানব যে সভ্যতাকে বিকশিত ক'রে তুলেছে, তার মাঝে উলঙ্গ থাকার খুব সম্মানজনক স্থান নেই। উলঙ্গ হ'য়েই মানুষ ইন্দ্রিয়-ঘটিত সকল অসংযমের অনুষ্ঠান ক'রে থাকে ব'লে, কেউ সৎবুদ্ধি নিয়ে উলঙ্গ হ'লেও, অপরের মনে ইন্দ্রিয়-ঘটিত অসংযমমূলক চিন্তা আস্‌তে পারে। একজন ভাস্করানন্দ বা ত্রৈলঙ্গস্বামীকে উলঙ্গ দেখ্‌লে কামুকতা মনে না এসে বরং সর্ব্বদেবদেব দিগম্বর মহেশ্বরের কথাই মনে আসা স্বাভাবিক হ'লেও অন্য বহু সাধারণ ব্যক্তিকে উলঙ্গ দর্শন কর্লে মনে কামুকতার স্মৃতিই জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্যই ধর্ম্মের নামে উলঙ্গ হওয়া বা উলঙ্গ হ'য়ে সাধন-ভজন করাকে আমি তেমন সমাদর প্রদান করি না।

স্ত্রীলোকের উলঙ্গ হওয়া

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পুরুষদের মধ্যে ধর্ম্মার্থে যাবজ্জীবন উলঙ্গ হ'য়ে অবস্থান করার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে এত প্রচুর যে, অনেক সময়ে সে দৃশ্য হয়ত সাধারণের দৃষ্টিতে কাম-সন্ধুক্ষণকারী ব'লে ঠেকেও না। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে উলঙ্গ হ'য়ে থাকা অতি বিপজ্জনক। মহাকালী স্বয়ং উলঙ্গিনী হ'লেও রমণী জাতিকে যখনই উলঙ্গিনী করার চেষ্টা হয়েছে, তখনই দেশ ধ্বংস হয়েছে।

ধর্ম্মের নামে যাকে উলঙ্গিনী করা হয়েছে, পরিশেষে তাকে দিয়েই জগতে অসম্ভব রকমের অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যাবিলোন, মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি সব দেশেই ধর্ম্মের নামে উলঙ্গ হওয়া বা রমণীকে উলঙ্গিনী করার চেষ্টা থেকে পরিশেষে ভীষণ ব্যভিচার এসেছে এবং দেশ ও জাতির সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুলকারণগুলিকে সঞ্চয় করেছে। ভারতবর্ষে নারীমধ্যে মহাকালীর অভিমান জাগিয়ে তান্ত্রিক সাধকেরা নারীকে যেখানে যেখানে উলঙ্গিনী করিয়েছেন, সেখানে সেখানে ক্রমশঃ ঘোরতর কদর্য্য ব্যাপারসমূহ ধর্ম্মের স্থান অধিকার করেছে। এই জন্তই আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, ঈশ্বরধ্যানহেতু একেবারে সম্পূর্ণ দেহ-বুদ্ধি-বিরহিত হবার পূর্ব্বে কেউ উলঙ্গভাবে অবস্থান কল্লে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে সমাজের অনিষ্ট সাধনই কর্ব্বেন।

মুসলমান ফকিরাণীর উলঙ্গ থাকা

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানের একটী সিদ্ধ-তপস্বিনীরূপে সম্মানিতা মুসলমান ফকিরাণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই মহিলাটীর মনে একটা ভাবের সৃষ্টি হ'ল যে খোদা সর্ব্বময়। খোদা তাঁর নিজের ভিতরেও আছেন, চতুর্দ্দিকে যত কিছু মানুষ গরু গাছ লতা সব কিছুর ভিতরেও আছেন। সুতরাং বস্ত্র পরিধান ক'রে আর লজ্জানিবারণের প্রয়োজন কি? তিনি উলঙ্গিনী হ'য়ে রইলেন। সম্মুখে তাঁর বয়স্ক ছেলেরা, রোজ তাঁর দরগায় কত পুরুষ আসে যায়, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি দিগম্বরী হ'য়ে নির্ব্বিকার চিত্তে দিন কাটাতে লাগলেন। ছুটে এলেন মুসলমান মৌলভীরা। শরিয়তের বিধান লজ্যিত হচ্ছে ব'লে তাঁদের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল, সবাই এসে তাঁকে বুঝাতে লাগ্‌লেন যে, ন্যাংটা হওয়া পাপ। ফকিরাণী বল্লেন,—"দিনে রাত্রে মলমূত্র ত্যাগ কত্তে, স্নান কত্তে কতবার ন্যাংটা হতে হচ্ছে, তাতে যদি পাপ না হয়, তবে কি পাপ হবে শুধু সর্ব্বক্ষণ ন্যাংটা থাক্‌লে?" যুক্তিতে যখন চল্‌ল না, তখন ভক্তেরা সবাই ফকিরাণীর কাছে ভিক্ষা চাইল, যেন তিনি কাপড় পড়েন। তখন তিনি তাদের প্রার্থনা রক্ষা

কর্ল্লেন এবং উলঙ্গিনী মূর্ত্তি ত্যাগ কর্ল্লেন। ফকিরাণী যে উলঙ্গিনী হয়েছিলেন, এটা তার সর্ব্বতোভাবে অনিন্দনীয় নির্দ্দোষ প্রেরণার ফল। তবু তিনি যে বস্ত্র পবিধান কত্তে রাজি হলেন, তাতে সমাজের কল্যাণ করা হয়েছে।

রহিমপুর
১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৯

বিনয় ভাগ্যবানেরই লক্ষণ

অদ্য রাত্রে দীর্ঘকাল নিঃশব্দ থাকিবার পরে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—দেখ্, ব্রাহ্মণ-সন্তানের ভিতর যখন বিনয় দেখি, তখন বুঝি, তিনি ভাগ্যবান্। বিদ্বান্ ব্যক্তির ভিতরে যখন বিনয় দেখি, তখন বুঝি, তিনি ভাগ্যবান্। মহাপুরুষের ভিতরে যখন বিনয় দেখি, তখন বুঝি, তিনি ভাগ্যবান্।

যথার্থ বিনয়

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—যার নিকটে তোমার কোনও প্রকার স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা নেই. তার কাছেও যখন তুমি বিনীত হও, তখন বুঝ্‌ব, এ বিনয় প্রকৃত বিনয়। মূর্খ, অপদার্থ, নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির প্রতিও যখন তোমার বিনয়ের হ্রাস নেই, কুলী, মজুর বা চাকরের প্রতিও যখন তোমার বিনয়ের অন্তর্ধান নেই, তখন বুঝব, তোমার বিনয় যথার্থ বিনয়।

রহিমপুর
১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৯

প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর একটী ছাত্রকে লিখিলেন,—

"প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে,—ব্যায়াম ব্রহ্মচর্য্যের সহায়ক। প্রত্যহ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিবে,—সদ্‌গ্রন্থ সৎসাহসের উত্তেজক। প্রত্যহ চরিত্রবান ব্যক্তির সঙ্গ

করিবে,—সৎসঙ্গ চরিত্রের ক্রটী-সংশোধক। প্রত্যহ উপাসনা করিবে,—উপাসনা চিত্ত-চাঞ্চল্য-নিবারক।"

পাপদৃশ্য-সম্পর্কিত-চিন্তা পরিহারের উপায়

অপরাহ্নে নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে একটী যুবক আসিয়া তার প্রাণের বেদনা শ্রীশ্রীবাবার চরণে নিবেদন করিল। যুবকটীর মন পাপাসক্ত হইতে হইতে এমন হইয়াছে যে, দিবারাত্রি সে স্ত্রীলোকের গুপ্ত অঙ্গই চিন্তা করে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চমৎকার! কোনো কোনো তান্ত্রিক সাধককে যা চেষ্টা ক'রে কত্তে হয়, তা তোর আপনা থেকেই ত' হ'য়ে যাচ্ছে। ঘাবরাচ্ছিস্ কেন? আয় আমার সাম্‌নে এসে ব'স্।

যুবকটী বসিলে শ্রীশ্রীবাবা সুস্পষ্টস্বরে ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—এই মন্ত্রটী মনে রাখিস্। থাক্‌বে ত?

যুবক সম্মতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এখন মনে মনে যোনির চিন্তা কর্। এমনভাবে কর্, যেন স্পষ্ট যোনিটী তোর চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। এখন তার ভিতরে স্পষ্ট ক'রে ওঙ্কার অঙ্কিত রয়েছে ব'লে চিন্তা কত্তে চেষ্টা কর্, আর বারংবার নাম জপ্‌তে থাক্। ওঙ্কারের চেয়ে পবিত্রতম বস্তু তিন্ ভুবনে কোথাও নেই। সারাদিন এভাবে ওঙ্কারের ধ্যান জমাবি। যখন স্ত্রীযোনির চিন্তা আস্‌বে, তখন ত আর তাড়াতে চাইলেই সে তোকে ছাড়্‌বে না। বেশ, তাড়াবার চেষ্টা করার দরকার নেই। তাকেই ধ্যান কর্, কিন্তু তার মাঝে ওঙ্কারের উপস্থিতি চিন্তা ক'রে আর অবিশ্রাম ওঙ্কার জপ ক'রে ক'রে। দেখ্‌বি, কতকদিন পর যোনিচিন্তা আপনি চ'লে যাবে, পরম সত্য ওঙ্কারই তোর পরম-শান্তি হ'য়ে থেকে যাবেন। যে কু-স্মৃতিকে কিছুতেই তাড়ানো যায় না, তাকে তাড়াবার এই হচ্ছে উপায়।

স্ত্রীরোগের কারণ

সন্ধ্যার পরে নিলখি গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মহিলাল সাহা আসিয়াছেন।

নানা কথার পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বর্ত্তমান কালে স্ত্রীলোকদের নানাবিধ জরায়ুরোগের যতগুলি কারণ আছে, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে, অত্যধিক কামচিন্তা ও অত্যধিক কামচর্চ্চা। এই দোষ দূর হ'লেই দেখ্‌বি, ভারতের নারী সহজে তাদের স্বাস্থ্যকে পরিবর্ত্তিত কত্তে পাচ্ছে। তোরা তোদের প্রাণ দিয়ে নিজ নিজ পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকদের মনকে কামুকতার ঊর্দ্ধে নেবার চেষ্টা কর্, তোদের দেখাদেখি ক্রমশঃ সমগ্র দেশ এই পথে ছুট্‌বে।

রহিমপুর
১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৯

চির-ব্রহ্মচারিণীর দায়িত্ব

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা জনৈকা ব্রহ্মচারিণী কিশোরীকে লিখিলেন,—

"চিরব্রহ্মচর্য্য লইয়াছ, তার মানে চিরদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছ। নিজে ব্রহ্মচারিণী রহিয়াই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইবে না, তোমার নিজের ত্যাগ, সংযম ও শুচিতার ভাব ব্যাপকভাবে সমগ্র নারীজাতির ভিতর প্রসারিত করিবার চেষ্টাও তোমাকে করিতে হইবে। আজ তুমি তরুণী কিশোরী, আজ তোমার আত্মগঠনই বড় কথা। কিন্তু তোমার আত্মগঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে ভবিষ্যৎকালের সহস্র সহস্র নারীর আত্মগঠনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে, একথা একবারের জন্যও ভুলিলে চলিবে না।

আদর্শ-নিষ্ঠার ফল

"কল্যাণীয়া আ—তোমার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেছে এবং তোমার মতই ত্যাগীর জীবন যাপনে উৎসাহ অনুভব করিতেছে জানিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। যতক্ষণ তুমি তোমার জীবনের পরমাদর্শের সহিত প্রাণপণে যুক্ত রহিবে, ততক্ষণ জগতের সকল নরনারী তোমার প্রতি এইরূপ সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করিবে। ইহা তোমার জন্য আমার ভবিষ্যৎ-বাণী বা আশীর্ব্বাদ। অথবা জানিও, ইহা সর্ব্বজনীন এক সত্য, যাহার ব্যত্যয় নাই।

পুরুষ সম্পর্কে ব্রহ্মচারিণীদের কর্ত্তব্য

"কল্যাণীয়া আ—র পুরুষ আত্মীয়েরাও তোমার প্রতি অতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেছেন জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। কিন্তু পুরুষেরা যতই শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিপ্রবণ হউক না, তোমার পক্ষে মনে প্রাণে তাহাদের সম্পর্কে অলঙ্ঘনীয় সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। কোনও পুরুষকেই তোমার উপরে কোনও দিক দিয়া কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে দিবে না। বলিতে গেলে এতকাল তুমি পুরুষদের সংস্পর্শে পর্য্যন্ত আসিতে পাও নাই, তুমি যেমন আসিতে চাহ নাই, আমরাও তেমন আসিতে দেই নাই। ইহার ফলে তোমার ভিতরে যে নিজস্বতা জন্মিয়াছে, তাহাই প্রধানত তোমার প্রতি পুরুষদের এত তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টির কারণীভূত হইয়াছে। কিন্তু শত আকর্ষণেও যেন তাহারা তোমার সান্নিধ্য হইতে সম্মানজনক দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হয়, এরূপ গাম্ভীর্য্য যেন তোমার চরিত্র, আচার, ব্যবহার, বাক্য ও জীবনপ্রণালীকে কখনও পরিত্যাগ না করে।

গুরুভ্রাতাদের সংস্রবে ব্রহ্মচারিণীর কর্ত্তব্য

"নিঃসম্পর্কিত পুরুষদের সম্পর্কে ত' তোমাকে এই দৃঢ়তা লইয়া চলিতেই হইবে, এমন কি গুরুভ্রাতাদের সম্পর্কেও এই দৃঢ়তাকে পরিত্যাগের কোনও হেতু নাই জানিও। যেহেতু তুমি সাংসারিক সকল সুখ-কল্পনা পরিহার করিয়াছ, যেহেতু তুমি ছয় বৎসর বয়স হইতে একই গুরুর চরণধ্যান করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছ, যেহেতু গুরুর সেবাকে জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া সর্ব্বতোভাবে তুমি সেই সুমহৎ ব্রতের উপযুক্তা হইতেই চেষ্টা পাইয়া আসিতেছ, সেই হেতু গুরুভ্রাতাদের মত প্রিয় বস্তু তোমার আর কিছু থাকিতে পারে না। এই জন্যই ছয়মাস তোমার চখের উপরে একই গৃহে কাছে কাছে অবস্থান করা সত্ত্বেও যাহাদিগকে তোমার সহিত পরিচয় স্থাপনের বা কথা বলিবার কোনও সুযোগ প্রদান করা হয় নাই, আজ অল্প কয়দিনের চিঠিপত্রের পরিচয়েই তুমি তাহাদের প্রতি একান্ত মমতাশীলা হইয়াছ এবং ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারই বটে। কিন্তু ইহাদের সহিত যখন তোমাকে

মিশিতে হইবে, কথা বলিতে হইবে, তখন প্রয়োজনীয় ভাব-বিনিময়ের ব্যাপারেও তোমাকে তোমার বৈশিষ্ট্যের গাম্ভীর্য্য এমন ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে হইবে, যাহাতে কোনও প্রগল্‌ভতার অনুচিত শাসন আসিয়া তোমার জীবনের কুঞ্জে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করিতে পারে। তোমাকে মনে রাখিতে হইবে যে, গুরুভ্রাতারা যতক্ষণ সত্যনিষ্ঠ, যতেন্দ্রিয়, সদাচারী ও শুদ্ধাত্মা, ততক্ষণ তোমার সংস্রবে আসিবার যোগ্য, যে তাহা নহে, সে তোমার কেহ নহে। বড় যখন হইবে, তখন হয় ত কত কদাচারী গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নীর সংশোধনের ভার আসিয়া তোমার উপরে পড়িবে। কিন্তু কচি গাছে শক্ত বেড়া রাখা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎকে ভুলিও না

"ভবিষ্যৎকে কখনও ভুলিও না। তাহা হইলেই বর্ত্তমানের আচরণ আপনি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। আমার সন্তান-মণ্ডলীর মধ্যে তার স্থান হইবে সর্ব্বোচ্চে, যে কুমারী আমরণ সতীত্বের তীব্র উন্মাদনাকে অন্তরে রাখিয়া, চরিত্রের অনবদ্য আদর্শকে বক্ষে ধারণ করিয়া জীব-কল্যাণার্থে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। নিজ সুকৃতির ফলে সে সৌভাগ্য তোমারই হইতে পারে। দেশ ও জাতির উদ্ধারের জন্য যে সকল কর্ম্মীর প্রয়োজনীয়তা আমি অনুক্ষণ অনুভব করিতেছি, তন্মধ্যে নারী-কর্ম্মীর স্থান আমার দৃষ্টিতে সর্ব্বোচ্চে। তুমি যদি তোমার ভবিষ্যৎকে না ভোল, তাহা হইলে পরমাত্মার কৃপায় তোমার তথাকথিত জ্যেষ্ঠেরা নিতান্ত কনিষ্ঠের মতই তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। সদ্‌গুরুসেবাই তোমার জীবনের পরম লক্ষ্য যতকাল থাকিবে, ততকাল তোমার কর্ত্তৃত্ব মান্য করা কাহারও পক্ষেই ভারপ্রদ বা অসম্মানজনক হইবে না। ভবিষ্যৎকে ভুলিও না এবং ভবিষ্যতের জন্যই আপ্রাণ প্রয়াসে নিজেকে অমৃতময় নামের মধুতে পরিপূর্ণ কর।

জোর করিয়া সন্ন্যাসের ভাব দিও না

"কল্যাণীয়া আ—র ভিতরে জোর করিয়া সন্ন্যাসের ভাব প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিও না। সন্ন্যাসের শুভ্র জীবন প্রত্যেকের জন্য নয়। সকলেই সন্ন্যাসী

হইতে পারে না। সন্ন্যাসের জন্য প্রধানত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি নিয়া আসিতে হয়। পবিত্র গার্হস্থ্য যতই মহনীয় হউক এবং আমি গৃহীদিগকে উপদেশ দিবার কালে সংযত গার্হস্থ্যের যতই প্রশংসা করি না কেন, * * * অন্তর আমার সন্ন্যাসের মহনীয় মহিমায় আশ্চর্য্যরূপে বিশ্বাসী। গার্হস্থ্যকে আমি সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু সন্ন্যাসকে যাঁহারা অযথা নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি অন্তরে ক্ষমা করিতে পারি নাই। কেহ সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইলে এইজন্যই আমি মনে মনে আনন্দে আত্মহারা হই, যদিও বাহিরে সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে দুই-দশটা শাণিত যুক্তি দিয়া সন্ন্যাসেচ্ছুর আকাঙ্ক্ষার গভীরতা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি। * * * অবশ্য, ঐ সকল যুক্তি আমার প্রাণের যুক্তি নহে। * * * শ্রীমতী আ—কেও ভাল করিয়া পরীক্ষা কর। কে জানে, হয় ত শ্রীমতী আ— তার পিতার প্ররোচনাতেই সাময়িকভাবে সন্ন্যাসের দিকে ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছে এবং কোনও কারণে পিতার মত-পরিবর্ত্তন ঘটিলে হয় ত শ্রীমতী আ—রও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইতে পারে।

চিরকৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষার সহিত পৈত্রিক সংস্কারের সম্বন্ধ

"শ্রীমতী আ—র পিতার সাংসারিক জীবন আমি জানি না, জানিবার জন্য কখনও কৌতূহলীও হই নাই। পিতার জীবনে ত্যাগের অনুশীলন থাকিলে, ত্যাগ-স্পৃহা যত সহজে সন্তানে আসে, তত সহজে শুধু মুখের উপদেশে আসিতে পারে না। * * * শ্রীমতী আ— পিতার জীবন হইতে এমন কিছু যদি পাইয়া থাকে, তবে স্বভাবই তার রুচিপ্রবৃত্তি চিরকৌমার্য্যের পথে স্থায়িতর হইবে। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, কদাচিৎ মাত্র ইহার অন্যথা পরিদৃষ্ট হয়।

পিতামাতা কিজন্য কন্যাকে চিরকুমারী রাখিতে ইচ্ছুক হয়

"কিন্তু কিজন্য শ্রীমতী আ—র বাবা নিজ কন্যাকে চির-কৌমার্য্যের পথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর

করে। অনেকে নিজেরা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া কন্যাকে নিত্যপথে চলিবার সুযোগ দিতে চাহেন। ইঁহারা জগতের নমস্য। অনেকে রুগ্না কন্যাকে বিবাহ দিলে বিবাহিত জীবনে মেয়েটা অধিকতর রুগ্না হইবে, ইহা ভাবিয়া কন্যাকে চিরকুমারী রাখিতে চাহেন, ইহারাও ভাল লোক। অনেকে কন্যাকে বিবাহ দিতে পারেন না বলিয়া কোনও আশ্রমে সরাইয়া দিয়া দায়িত্ব-মুক্ত হইতে চাহেন, ইহারা বিপন্ন ও কৃপার পাত্র। অনেকে নিজ কন্যাটীকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিবার অভিনয় করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে তোমারই সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে পারে। ইহারা বর্জ্জনীয় ব্যক্তি। ধীরভাবে লক্ষ্য করিয়া যাও এবং প্রথমে জানিতে চেষ্টা কর যে, কোন্ উদ্দেশ্য নিয়া শ্রীমতী আ—র পিতা নিজ সুন্দরী জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বারংবার তোমার কাছে রাখিয়া যাইতেছে এবং তাহাকে চিরকৌমার্য্যের পথে পরিচালিত করিবার প্রেরণা প্রদান করিতে তোমাকে অনুরোধ করিতেছে। তার পরে শ্রীমতী আ— সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিও।

ভবিষ্যতের পিতা এবং চিরকুমারী কন্যাগণ

"ভবিষ্যতে আরও শত শত কন্যার পিতা হয় ত তোমার কাছে আসিবেন এবং নিজ নিজ কন্যাকে তোমার নিকটে জীব, জগৎ ও ভগবানের সেবার জন্য উপঢৌকন দিয়া যাইবেন। হয় ত সহস্র সহস্র কুমারী কন্যার ভিড়ে তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। নিজে দেবীত্বের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া উঁচু হইয়া লও, চতুর্দ্দিকে হইতে তোমাকে দেখিয়া সহস্র সহস্র মনুষ্য-মুণ্ড দুই করে কুমারী কন্যাকে অঞ্জলিরূপে আনিয়া তোমার আদর্শের পায়ে অর্পণ করিবে। সেদিনও সবাইকে তুমি চিরকৌমার্য্যেরই জন্য গঠন করিতে পারিবে না। অনেককে চিরকৌমার্য্যের জন্য গ্রহণ করিয়াই হয় ত সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতে হইবে। অনেককে বিবাহ দিবার সর্ত্তে গ্রহণ করিয়াও হয় ত চির-কৌমার্য্য-ব্রতচারিণী রাখিতে হইবে। একটী আ— আজ তোমার চিত্তকে মথিত করিতেছে, সেদিন শত শত আ— তোমাকে ঘিরিয়া ধরিবে। আজ তুমি শ্রীমতী আ—সম্পর্কে সকল উদ্বেগ বর্জ্জন করিয়া, তাকে প্রয়োজন মত

মঙ্গলপ্রদ উপদেশসমূহ প্রদান কর এবং সর্ব্বপ্রযত্নে শুধু নিজেকেই মহত্তর কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর।

অরতি জনসংসদি

"আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি যে, আরও অনেক মেয়েরা তোমার সংস্রব-মাত্র পবিত্রতার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। তোমার সংস্রব পাইয়া সমগ্র জগৎ পবিত্র হউক, ইহাই আমি কামনা করি। তবু, আত্মগঠন-সময়ে জন-সংসদে রুচিহীনতাই বিশেষভাবে প্রয়োজন। পূর্ব্বের ন্যায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন এখন তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রয়োজনের দাবীর উর্দ্ধে জনসংসদে মিশিও না। আত্মগঠনের পক্ষে ইহা আবশ্যকীয়।"

২০শে ভাদ্র, ১৩৩৯

অদ্য বেলা দশ ঘটিকায় রহিমপুর হইতে নৌকাযোগে শ্রীশ্রীবাবা কাশীপুর রওনা হইলেন। কাশীপুরের শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস দে শ্রীশ্রীবাবার কৃপাপ্রাপ্ত। অদ্য শ্রীযুক্ত হরিদাসের পত্নী জ্যোৎস্না দেবী শ্রীশ্রীবাবার কৃপা পাইলেন। এই দম্পতীকে শ্রীশ্রীবাবা ছয় মাসের জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রদান করিলেন। দম্পতী গভীর শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত গ্রহণ করিলেন।

সংযম ও দাম্পত্য প্রেম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দাম্পত্য জীবনটা প্রেমের উৎস-স্বরূপ। কিন্তু এই প্রেমকে সত্যরূপে আস্বাদন কত্তে হ'লে দু'জনের ভিতরে সংযমেরও প্রয়োজন। শুধু সম্ভোগ আর বিলাস-ব্যসন দিয়ে প্রেমকে আস্বাদন করা যায় না। দাম্পত্য জীবনের যত দৈহিক ব্যবহার, সেগুলি প্রেমের পিপাসাকে পরিবর্দ্ধিত করে, পরিতৃপ্ত করে না। প্রেম-পিপাসার পরিবৃদ্ধির জন্য তোমাদের দেহের সর্ব্ববিধ ব্যবহার বৈধ, কিন্তু প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি লাভের জন্য সংযমের একান্ত আবশ্যকতা। কখন কোন্‌টী তোমাদের প্রয়োজন, তা' বুঝে তোমরা জীবন শিক্ষা কর।

নামের সেবার সঙ্কল্পকে দৃঢ় কর

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—আমৃত্যু সংযমই পালন কর্ব্বে, এমন কোনও জিদের এখন দরকার নেই। কিছুদিন সংযত জীবন, কিছুদিন সংসারী জীবন, এভাবে পর্য্যায়ক্রমে ত্যাগ ও ভোগ উভয়ের সাময়িক অনুশীলন প্রয়োজন মত কত্তে থাক। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলময় নামের সাধনে মনকে গভীর হ'তে গভীরতর ভাবে লগ্ন কত্তে যত্নবান হও। নামের গুণে তোমাদের মধ্যে আপনা আপনি সর্ব্ববিধ ভোগ থেকে বিরত নিত্যানন্দময় শুদ্ধাবস্থার প্রতিষ্ঠা হবে। শুদ্ধতা গায়ের জোরে আসে না, আসে নাম-সাধনের জোরে। চিরকাল সংযতই থাক্‌বে বা মধ্যে মধ্যে সংসারী ভাবেও চল্‌বে, সেই বিষয়ে কোনও পৃথক্ সঙ্কল্প অন্তরে পোষণ না ক'রে আমৃত্যু নিষ্ঠায় যে ভগবানের পরম-পবিত্র নামের সাধন ক'রে যাবে, এইটাই তোমার প্রখর ও প্রবল সঙ্কল্পের বিষয় কর। যে নামে মজে, তার সকল দিকের সকল অপূর্ণতা আপনি দূরীভূত হয়ে যায়।

নামের নেশা

মহিমবাবু অতিশয় ভক্তলোক। ধনী হইলেও ধনগর্ব্ব নাই, মানী হইয়াও অভিমান নাই। শিশুর মত সরল মন এবং জলের মত তরল হাসি লইয়া তিনি শ্রীশ্রীবাবার সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে মত্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—অনেকের অনেক রকমের নেশা থাকে। কারো থাকে মদের নেশা, কারো থাকে গাঁজার নেশা, কারো থাকে মেয়ে মানুষের নেশা, কারো থাকে নামের নেশা। মদের নেশা যার থাকে, সে ভিক্ষা ক'রেও মদ খায়। গাঁজার নেশা যার থাকে, সে যক্ষ্মা ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়েও গাঁজা খাওয়া ছাড়তে পারে না। মেয়ে মানুষের নেশা যার থাকে, সে বারংবার প্রত্যাখ্যাত-প্রবঞ্চিত হ'য়েও আলেয়ার আলোর পশ্চাতেই ছুটে বেড়ায়। আর নামের নেশা যার হয়েছে, সে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে কোনো অবস্থাতেই নাম ছাড়্‌তে পারে না। যার এই রকম নামের নেশা হয়, জগতে সেই ধন্য, তারই মনুষ্যজন্ম সার্থক।

নিত্য বস্তুর নেশা ও অনিত্যের নেশা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতের সকল নেশা যাতে ছু'টে যায়, তারই জন্য নামের নেশা প্রয়োজন। জগতের সকল পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে খ'সে পড়ে, তারই জন্য জীবনকে নামের সেবার সম্যক্ অধীন করা অত্যাবশ্যক। মদ, গাঁজা, ভাং, চরশ, যশ, মান, মেয়েমানুষ—এ সকল অনিত্য বস্তুর নেশা যাতে চিরতরে কেটে যায়, তারই জন্য নামের নেশার আবশ্যকতা। বড় নেশায় ধর্‌লে আর ছোট নেশার প্রভাব থাকে না। নাম নিত্য সত্য, নিত্যের নেশা একবার জম্‌লে অনিত্যের সকল নেশা চিরতরে খতম্ হ'য়ে যায়। এই জন্যেই অনাদি কাল থেকে সাধু-সজ্জনেরা নামের নেশা জমাবারই আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন।

নামের নেশা কি ভাবে জমে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একদিনে কারো মদের নেশা হয় না। রোজ রোজ খেতে খেতে তবে গিয়ে নেশাতে দাঁড়ায়। নামের নেশাও সেই ভাবেই জমাতে হয়। রোজ নামের মধু পানের অভ্যাস কর, একদিনও বাদ দিও না, একদিনও ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ো না,—ভাল লাগুক আর না লাগুক, নাম জ'পে যাও। প্রেমে বা অপ্রেমে, শ্রদ্ধায় বা হেলায়, প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে অবিরাম তাঁর নাম জপ। একবার ধ'রে আর ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন নেই,—"ধরেছি ত' মরেছি, যতক্ষণ এই দেহ আছে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নাম ছাড়্‌ব না,—" এই জিদ নিয়ে নামের পিছনে প'ড়ে থাক্‌লে আপনি নেশা জ'মে যাবে। ধ্রুব-প্রহ্লাদেরও একদিনে নামের নেশা জমে নাই, দিনের পর দিন কাঁদ্‌তে হয়েছে। বিদুরের মত ভক্তগণ বা নারদাদি মুনিগণও একদিনে নেশায় মজগুল্ হন নি। আপ্রাণ সাধন ক'রে তবে তাঁরা নেশায় মজেছেন। আমার-তোমারও তাই কত্তে হবে।

ভক্তের মুক্তিলোভ থাকে না

মহিমবাবু অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে সুমধুর নাম-মাহাত্ম্য শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভক্তি এলে আর মুক্তিলোভ থাকে না। ব্রজবালারা কেউ মুক্তি চান্‌নি। কবীর, দাদু, তুকারাম, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি একজন ভক্তও জীবনে একবারের জন্য মুক্তি প্রার্থনা করেন নি। ভক্তের পক্ষে মুক্তি-প্রার্থনা নিরর্থক। বন্ধন আছে কিম্বা নেই, সেই বিচারেরও তাঁর অবসর নেই। তিনি তাঁর পরমদয়িতকে ভালবেসেই খালাস। ভালবাসার বলে তাঁর অজ্ঞাতসারেই সকল বন্ধন টুটে যায়। নামের নেশা একবার জন্মালে ভক্তি আপনা থেকেই উপজাত হয়। ভক্তির মাতা নেই, পিতা নেই, অহেতুক সে জন্মে এবং ভিতরের আর বাইরের সকল বন্ধন কাটে।

ভক্তি ও বিনয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ভক্তির বাধা প্রতিষ্ঠার লোভ। দশজনে জানুক আমি কেমন ভক্ত, একথাটা মনে জাগ্‌লেই ভক্তিলতার নবীন কিশলয়গুলি প্রখর তপন-তাপে দগ্ধ হ'তে সুরু করে। যে যত বড় ভক্ত, সে তত নীরব, সে তত নিভৃত-পথচারী, সে তত বিনয়ী। বিনয় ভক্তির প্রসারক। ছদ্ম-বিনয় নয়, প্রকৃত বিনয় ভক্তির সহায়ক। সাধনে নিষ্ঠা থাক্‌লে বিনয় আপনা আপনি বিকশিত হয়। বিনয়ের স্থান মুখে বা চ'খে নয়, বিনয়ের স্থান বুকে। সুকোমল ভাষা বা আনত চক্ষুই বিনয়ের প্রমাণ নয়, বিনয়ের প্রমাণ অন্তর্দৃষ্টিতে, নিয়ত আত্মানুসন্ধানে, পরচ্ছিদ্রান্বেষণে-সম্যক্-বিরত মনের আত্ম-দর্শনে। বিনয় ভক্তের অলঙ্কার। প্রকৃত ভক্তের ইষ্টনিষ্ঠ চিত্ত বিনয়ের প্রাণ।

প্রয়োজন ঐকান্তিকতার

অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। গ্রামের কতিপয় জিজ্ঞাসু যুবক সদুপদেশ যাচ্ঞা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংখ্যার উপরে নির্ভর ক'রো না। নির্ভর ক'রো ঐকান্তিকতার উপরে। একনিষ্ঠ কর্ম্মী পাঁচ জন মিলিত হ'লে একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি ক'রে ফেল্‌তে পারে। একনিষ্ঠ জ্ঞানী পাঁচজন মিলিত হ'লে জগতের সকল অন্ধকার দূর ক'রে দিতে পারে। একনিষ্ঠ ভক্ত পাঁচ জন মিলিত হ'লে জগতের সকলের প্রাণে শান্তির ও প্রেমের মলয়-সমীরণ

প্রবাহিত ক'রে দিতে পারে। শত শত অপকর্ম্মীকে এক ঠাঁই কর, দেখ্‌বে, সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে এরা গড়া জগৎকে শতখান ক'রে ভাঙ্‌ছে। শত শত অজ্ঞানকে একত্র জড় কর, দেখবে, শত যত্ন ব্যর্থ ক'রে এরা প্রজ্বলিত আলোক-শিখা গুলিকে নিবিয়ে দিচ্ছে। শত শত অভক্তকে এনে সঙ্ঘবদ্ধ কর, দেখ্‌বে, তোমার শত আবেদন তুচ্ছ ক'রে এরা শান্তিপূর্ণ জগৎকে অশান্তিতে পূর্ণ কচ্ছে, প্রেমপূর্ণ জগৎকে অপ্রেমে দগ্ধ কচ্ছে। দলের ভক্ত হ'য়ো না, ভক্ত হও বলের, কর্ম্ম-বলের, জ্ঞান-বলের, প্রেম-বলের।

সকল প্রেম সেই সর্ব্বেশ্বরকে দাও

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী কয়েকটী ছেলেকে পত্র লিখিলেন। সেই পত্রগুলির অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একজনকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"যিনি সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ, তিনি তোমারও প্রাণস্বরূপ হউন। একমাত্র তাঁহাকে ভালবাসিলেই তোমার নিখিল জগৎকে ভালবাসা হইবে। একমাত্র তাঁহার নামটী স্মরণ করিলেই যে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানের ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে অখিল প্রাণিগণের স্মরণ করা হয়, একথা বিশ্বাস কর। তাঁহাকে প্রেম দিলে সেই প্রেম সকলের কাছে পৌঁছিবে। দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তি সব সেই সর্ব্বময়কে দাও। তাহা হইলেই নিখিল জগতের প্রত্যেকটী পরমাণু উহার অংশভাগী হইবে। কারণ, তিনি ইহাদের একজনকে ছাড়িয়াও নহেন।"

পরের হিত ও নিজের হিত

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"যাহারা সাধন-দ্বেষী, তাহাদের সহিত সাধন-ভজন বিষয়ে কোনও আলোচনা না করাই সঙ্গত। অপর দশ রকমে যদি তাহাদের হিত করিতে পার, কর। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও কথা পাড়িবার পূর্ব্বে ধীরভাবে কাল-প্রতীক্ষা করাই উচিত। আজ যে বিদ্বেষী আছে, কাল সে হয় ত অন্তরে

সাধনের অনুরাগ অনুভব করিতে পারে। অকপট ও নিঃস্বার্থ সেবাবুদ্ধি-পরিচালিত সৎসঙ্গ দানের ফলে বিনা উপদেশে অনেক তথাকথিত নাস্তিকের মনে ভগবদ্‌ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা অনুরাগী, নিজের সাধনানুরাগ বর্দ্ধনের জন্যই তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবে। অপরের উপকার করিতে যাইয়া তোমার নিজের উপকার ভুলিয়া যাইও না। পার্থিব ব্যাপারে নিজের ক্ষতি করিয়া পরের হিতসাধন সঙ্গত, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরের হিতসাধনের ভিতর দিয়া নিজের হিতবর্দ্ধনের চেষ্টা সঙ্গত।"

যথার্থ মানুষ হও—এই আশীর্ব্বাদ

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জীবনের লক্ষ্য রাখ উন্নত মহান্,
লক্ষ্য রাখ প্রাণপণ সেবা জগতের,
পরার্থ-সাধন তরে করি' আত্মদান,
কৃতার্থ করহ এই জন্ম মানবের।
পশুপক্ষী আদি কত জন্মে আর মরে,
নেত্রপাত কেহ নাহি করে ক্ষণতরে॥

"মনুষ্য-জনম নহে হেলায় খেলায়
মিথ্যা কুহকের মাঝে করিতে কর্ত্তন,
আত্ম-সুখ-লালসার চরণ-তলায়
বলি দিতে দেহ, আত্মা, চিত্ত, বুদ্ধি, মন।
নিজেরে ভুলিয়া যায় জগতের তরে
যথার্থ মানুষ নাম সেজনাই ধরে॥

"তোমাতে দেখিতে চাহি সে দেব-মূরতি,
তোমাতে দেখিতে চাই ত্যাগের প্রকাশ,
তোমাতে দেখিতে চাই তপস্যার দ্যুতি,
তোমাবে ফুটাতে চাই ব্রহ্মের আভাস।

তুচ্ছ করি' বাধা, বিঘ্ন, দুঃখ, পরীবাদ,
যথার্থ মানুষ হও,—মোর আশীর্ব্বাদ।"

আয় পুত্র! সত্যশুদ্ধ তপোব্রত নিয়ে

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"লক্ষ লক্ষ পুত্র যার, সেও অপুত্রক,
পুত্র যদি নাহি হয় ধর্ম্মের রক্ষক,
পুত্র যদি নাহি হয় তপস্বী, সাধক,
ধৃতবীর্য্য, মহাবীর, রিপু-সংযমক।
পুত্র যার আত্মসুখে রহিল মজিয়া
কি লাভ হইবে তার শত পুত্র দিয়া ?

"তোমরা সন্তান মোর, নয়নের মণি,
তোমাদেরে দিয়া আমি নিজ ভাগ্য গণি ;
তোমাদের চরিত্রের পূর্ণ নির্ম্মলতা
জেনো মোর জীবনের গৌরব-বিধাতা।
তোদের সততা আর ত্যাগ অকপট
আঁকিতেছে মোর জীবনের চিত্রপট ॥

"আয় পুত্র, সত্যশুদ্ধ তপোব্রত নিয়ে
পবিত্র করিতে ধরা চরণাঙ্ক দিয়ে ;
তৃষিত ক্ষুধার্ত্ত এই তপ্ত ধরণীর
মুখে দিতে শুদ্ধ করে স্নিগ্ধ ক্ষীর-নীর,
সর্ব্বদেহ-মনে তারে দিতে আলিঙ্গন
সর্ব্বস্ব তাহার কাজে করি' সমর্পণ ॥"

ধর্ম্ম বনাম অপকার্য্য

ত্রিপুরা জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী কোনও স্থানের এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কৃষ্ণ-প্রেমের নাম করিয়া যদি সমাজের কোনও স্তরে ব্যভিচারাদি অপকর্ম্ম বা সমাজ-বিধ্বংশী কদাচার প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অভিপ্রায় পূরণের জন্য হইয়াছে, ইহা বোধ হয় একজন কু-বৈষ্ণবেও স্বীকার করিবেন না। শাস্ত্র এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কুকার্য্য করিবার রীতি জগতের নানা দেশেই নানা সময়ে দেখা গিয়াছে। ইহা শাস্ত্র বা ধর্ম্মের দোষ নহে। স্বকীয় বিকৃত অন্তরের বিষ-বিজৃম্ভন উপলক্ষে কামুক ব্যক্তিরা আত্মদোষস্খালন হিসাবে নিজ নিজ অপচেষ্টাকে অনুগত-জনমধ্যে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং শাস্ত্র-জ্ঞান-বঞ্চিত ও কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত গ্রাম্য ব্যক্তিরা সেই ধোকায় ঠকিয়াছেন। তুমি যে-সকল বিষয় লিখিয়াছ, তাহার সরল অর্থ আমি এইরূপ বুঝি। আমার মতে ধর্ম্ম-বস্তু অপকার্য্যের সহায়ক বা প্রশ্রয়দাতা হইতে পারে না।"

রহিমপুর

২১শে ভাদ্র, ১৩৩৯

অখণ্ড সাধকের দাম্পত্য-জীবন

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা উজানিসার-নিবাসী জনৈক ভক্তকে পত্র লিখিলেন,—

"দাম্পত্য জীবনে সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া চলা যে সাধকের এক বিশেষত্ব, একথা কখনও বিস্মৃত হইও না। অখণ্ড গুরু ব্রহ্মচর্য্যের সাধ্যানুযায়ী অনুশীলনকে শিষ্যের উপরে বাধ্যকর করেন। সম্যক্ পালনে সমর্থ হও বা না হও, ইহা যে তোমাদের আদর্শ, তাহা কখনও ভুলিতে পার না। ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা রিপু-সংযমন, সম্ভোগ-লালসা পরিত্যাগ, সম্ভোগ-প্রয়াস অপসারণ—এইগুলি অখণ্ড গৃহীর তপস্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। অখণ্ড স্বামী স্বকীয় স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহকারিণী করিবেন, অখণ্ড স্ত্রী স্বামীর সহায়তায় আধ্যাত্মিক জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসিনী হইবেন। সংযম-ব্রত পালনান্তে তাঁহারা সন্তান-লাভে চেষ্টিতা হইবেন এবং সন্তান-লাভান্তেও পুনরায় সংযম-ব্রত পালন করিবেন। অখণ্ডের গার্হস্থ্য-জীবন সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠিত দাম্পত্য সংযমের মধ্য দিয়াই মনোহর শান্ত-শ্রী ধারণ করিবে।"

অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা আকুবপুর রওনা হইলেন এবং রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকায় আকুবপুর পৌঁছিলেন।

আকুবপুর
২২শে ভাদ্র, ১৩৩৯

ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণীর আজ দীক্ষা হইবে।

দীক্ষার অর্থ

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—মাগো, দীক্ষা নেওয়ার মানে শুধু কাণে কাণে একটী মন্ত্র নেওয়া নয়। প্রাণে প্রাণে মন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নেওয়াই হচ্ছে দীক্ষা। এমন দিন আস্‌বে, যে দিন কেউ কারো কর্ণে কোনও মন্ত্র শুনিয়ে দেবে না, কিন্তু তার দীক্ষা হয়ে যাবে।

মৃতবৎসার প্রতীকার

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর গৃহে বহু ভক্তেরাই আসিতেছেন এবং শ্রীশ্রীবাবাকে নিজ গৃহে নিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। একজনের একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চল, যাব তোমাদের বাড়ী।

গ্রামের পশ্চিম দিকে একটী বাড়ীতে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবা বসিয়াছেন। যার যার প্রাণের প্রার্থনানুযায়ী এক এক জনে এক এক রকমের প্রশ্ন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা উত্তর দিয়া যাইতেছেন। এই সময়ে এক পুত্রশোক-কাতর দম্পতী আসিয়া প্রণত হইলেন এবং পুত্র-ভিক্ষা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা কালোপযোগী সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তৎপরে বলিলেন,—দুজনেই এক বৎসরের জন্য সংসর্গ-ত্যাগী থাক। এই ব্রহ্মচর্য্য-পালন-কালে স্বামী নিজ লিঙ্গমূলে প্রত্যহ ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান কর। স্ত্রী নিজ জরায়ুর ভিতরে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান জমাও। প্রত্যহ শয়ন-কালে এই ধ্যানে বস্‌বে এবং যতক্ষণ দেহ নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে আপনি শয্যায় না শায়িত হয়, ততক্ষণ ধ্যান চালাবে। এভাবে এক বছর কাটিয়ে শুভদিন দেখে স্নান কর্ব্বে, প্রীতি-প্রদ পবিত্র বস্ত্র পরিধান কর্ব্বে, মনের আনন্দে ইষ্টপূজা কর্ব্বে, ধূপধূনার সৌরভে গৃহ আমোদিত কর্ব্বে, কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ কর্‌বে এবং তৎপরে

শরীরের প্রত্যেকটী আন্দোলনে ভগবানের নাম স্মরণ কত্তে কত্তে গর্ভাধান কর্ব্বে। মনে রেখো, গর্ভাধান সামান্য কাজ নয়।

বৃদ্ধ বয়সে ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্ভব কিনা ?

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বৃদ্ধ বয়সে ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্ভব কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বৃদ্ধ বয়সে যদি অসংযম সম্ভব হয়, তবে সংযম কেন সম্ভব হবে না ? আহার যার পক্ষে সম্ভব, অনশনও তার পক্ষে সম্ভব। ভোগ যার পক্ষে সম্ভব, ত্যাগও তার পক্ষে সম্ভব।

সন্তান কাণা-খোঁড়া হয় কেন ?

এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ী যাইতে পথে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে শারীরিক কারণ বশতঃ যাহাদের সন্তান মরিয়া মরিয়া যায়, তাহাদের বিশেষ কিছু করণীয় আছে কি না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাহাদের সর্ব্বাগ্রে নিজ নিজ শরীরের রক্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদন প্রয়োজন। টোট্‌কা ব্যবস্থায় চল্‌বে না, বৈজ্ঞানিকভাবে রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার যে, কোন্ দোষে এসব অনর্থ হচ্ছে। কাণা, খোঁড়া, অন্ধ ও মৃত সন্তান ত' পিতামাতার রক্তের দোষে হয়।

হুজুগ বর্জ্জন কর

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাড়ীতে আসিয়াছেন। আনন্দ-কোলাহলে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা মধুর উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে যে কাজই কর, হুজুগের প্রভাব অতিক্রম ক'রে ক'রো। আজ খুব কতক্ষণ নাম-কীর্ত্তনের আনন্দে লম্ফঝম্ফ কর্‌লাম। কাল সকালে হ'ল শরীর ব্যথা, বিকালে হ'ল, শিরঃপীড়া। আজ বলিরাজার মত দাতা হ'য়ে ত্রিভুবন বিষ্ণুপাদপদ্মে অর্পণ কর্ল্লাম, কাল সাধারণ লোকের মত দারিদ্র্য-দুঃখ অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল। আজ জোয়ারের নূতন জল দেখে প্রাণপণে দুশ' ডুব দিলাম, কাল ধর্‌ল আমাকে সর্দ্দি-জ্বরে। সব কাজই আতিশয্য বর্জ্জন ক'রে কর্‌বে।

নামকেই জগৎপতি বলিয়া জানিবে

এই বাড়ীতে একটী ছোট্ট মেয়ের দীক্ষা হইল। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামকেই জগৎপতি ব'লে জান্‌বি। নাম সকলেরই প্রভু, সকলেরই রক্ষক, সকলেরই পরিত্রাতা।

সাত্ত্বিক লক্ষ্য লইয়া শ্রম কর

একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবৎ-সাধনাই তোমার জীবনের পরম লক্ষ্য হবে। আর অন্য যত শ্রম কর্ব্বে, সবই হবে তপঃসাধনার আনুকূল্য-সৃষ্টির জন্য। যেখানে যে কর্ম্ম কর, লক্ষ্য রাখ্‌বে সাত্ত্বিক। তোমার এই পরিশ্রমের ফলে হয় তোমার নিজের আধ্যাত্মিক কুশল হোক্, নতুবা জগতের আধ্যাত্মিক কুশল হোক্। ভগবৎ-সাধনের জন্য বা জীবহিতার্থে যিনি তনুরক্ষা করেন, তাঁর শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে যে শ্রম, তাও গৌণভাবে ভগবৎ-সাধনেরই সহায়ক। কাজ যা' করার কর, কিন্তু কাজের উদ্দেশ্য ভুলে যেও না। "কর্ম্মই ব্রহ্ম" এই কথার মানে এই নয় যে, কাজ নিয়েই ম'জে থাক্‌বে,—একথার প্রকৃত মানে এই যে, তোমার কর্ম্ম তোমার ব্রহ্মলাভের সহায় হোক্।

হায়দ্রাবাদ (ত্রিপুরা)

২৩শে ভাদ্র, ১৩১৯

অদ্য বেলা দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা হায়দ্রাবাদ গ্রামে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পালের বাড়ীতে এক ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান হইল। ভ্রাতা নৃপেন্দ্রকুমার গ্রামের যুবকদের মধ্যে গভীর উৎসাহ সঞ্চারিত করিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রায় দুই ঘণ্টার মত চলিল।

কর্ম্মের ভিতর দিয়াই সাধনা

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ম্ম বর্জ্জন ক'রে নয়, জীবনকে অফুরন্ত কর্ম্মের অদ্বিতীয় আধারে পরিণত ক'রেই তার ভিতর দিয়ে ভগবৎসাধন কত্তে হবে। আলস্যকে প্রশ্রয় দিবে না, নিরলস প্রযত্নের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হ'তে হবে। জীবন সাধনারই জন্য, বৃথা কাটাবার জন্য নয়, কিন্তু ধর্ম্মকে কর্ম্মের

সঙ্গী ক'রে, কর্ম্মকে ধর্ম্মের সঙ্গী ক'রে জীবনের সকল অনুশীলন পরিচালন কত্তে হবে। এমনভাবে কর্ম্ম কর, যেন কর্ম্মের বন্ধন না বেড়ে যায়, এমন ভাবে কর্ম্ম কর যেন তা প্রথার দাসত্বে পরিণত না হয়। এ জন্য যদি আবশ্যক হয়, জীবনের কতকটা সময় নীরবে নিভৃতে তপোবনে বাস ক'রে সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত এবং লিপ্ততার ভাবকে নিরস্ত ক'রে নাও। কাজ কর, কিন্তু নির্লিপ্ত হ'য়ে। সাধন কর, কিন্তু নিরহঙ্কার চিত্তে। সর্ব্বকর্ম্ম বর্জ্জন ক'রে সাধন করার রীতি যে যুগে ছিল, সে যুগ আজ কি আছে? আজ গৃহস্থ অন্নাভাবে জর্জ্জরিত, দেশ দারিদ্র্য-পীড়নে প্রপীড়িত, মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-সম্ভার বিজ্ঞান-বলে সহস্র যোজন দূরে অপসারিত; নিরুদ্বেগ শস্যোৎপাদনের সেই ক্ষেত্রাবলি নেই, তার স্থানে নিত্য কলহের উত্তেজক নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে; নিশ্চিন্তগ্রাস গোধন আজ প্রাচীনের স্বপ্নমাত্রে পরিণত হয়েছে। তপস্বীর তপোভার বহনের দায়িত্ব কি আজ নানা-চিন্তা-সমাকুল উদ্বেগ-বহুল গৃহস্থের স্কন্ধে ন্যস্ত করা যায়? আজ তপস্বী নামে একটা পৃথক্ শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গৃহস্থের ত্যাগের উপরে দাবী চালান সঙ্গত নয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের জীবনের জ্বলন্ত জাগ্রত কর্ম্মের মাঝে প্রত্যক্ষ তপস্যা এবং তপোজাত নির্ভুল অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে।

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা পালের বাড়ীতেই অবস্থান করিলেন।

২৪শে ভাদ্র, ১৩৩৯

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা পালের বাড়ীতে সমাগত যুবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানান্তর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দে মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তাঁহার ভবনে আগমন করিলেন। গিরীশ বাবুরা একটী হরিসভা স্থাপন করিয়াছেন। তৎসম্পর্কেই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

হরিসভা ব্যক্তিত্ববোধ-বিনাশক প্রতিষ্ঠান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হরিসভা কথাটার মানে হচ্ছে, এই সভা শ্রীহরির সভা, তোমারও নয়, আমারও নয়। এই সভার মালিক তিনি, চালক তিনি,

প্রভু তিনি, তুমিও নও, আমিও নই। হরিসভা স্থাপন করার মানেই হচ্ছে, নিজের অহমিকা অভিমান ব্যক্তিত্ববোধ বিসর্জ্জন দেবার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়া।

হরিসভা আহরক প্রতিষ্ঠান

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—"হরি" শব্দের মানে আহরণকারী, ক্ষুদ্র তুচ্ছ সকল খণ্ড বস্তুকে একত্র জড় ক'রে যিনি একটী অখণ্ড সত্তায় পরিণত করেন। সুতরাং হরিসভার মানে হচ্ছে, আহরণের সভা, যেই সভাতে ছোট-বড় সবাইকে মিলিয়ে একজনের অনুচর, একজনের কিঙ্কর, অসীম অদ্বিতীয় অনন্ত-স্বরূপ একজনের চরণ-সেবক করে। এই জন্যই হরিসভার সদস্যেরা একজন আর একজনের প্রাণের প্রাণ হবেন, এটা আশা করা সঙ্গত।

হরিসভা সংসারী ভাবের অপহারক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোনো কোনো গ্রামে দেখা যায়, একদলের লোক একটা হরিসভা করেছে ত' আর একদলের লোকের একটা পৃথক্ করে হরি-সভা স্থাপন করা চাই। এসব নিতান্ত সংসারী-হিসাবের কাজ। এদের হরিসভায় যখন সপ্ত-মাদল মহোৎসব হয়েছে, তখন ওদের হরিসভায় চৌদ্দ-মাদল হওয়া চাই। এযেন, একজন জমিদার তার বিড়ালের বিয়েতে যখন দশ হাজার টাকা খরচ করেছেন, তখন আর একজন জমিদারের বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে বানরের বিয়ে দেওয়া চাই। হরিসভার মত প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় প্রতিযোগিতাবুদ্ধি থাকা দোষের কথা। যে সভা সংসারীর সকল পঙ্কিলতা হরণ কর্ব্বে, তারই নাম হবে হরিসভা। তা না হ'য়ে যদি এমন প্রতিষ্ঠানটী সংসারী মানাপমানবুদ্ধি বাড়িয়ে চলে, তবে ত' এর উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে গেল। হরিসভার প্রত্যেকটী অধিবেশন ও অনুষ্ঠান হবে অন্তরের দীনতা, সরসতা ও সরলতার বর্দ্ধক।

হরিসভা ও নেশার চর্চ্চা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোথাও কোথাও দেখি, সভার দিনে একদিকে ব'সে কথক ঠাকুর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কচ্ছেন, অন্য দিকে ব'সে শ্রোতারা হুকায় টান

দিচ্ছেন। এ যেন কেমন একটা অসম্ভ্রান্ত ভাব। সৎচর্চ্চা করার জন্যেই যখন এই প্রতিষ্ঠান, তখন একটা দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য পান, তামাক, বিড়ি এসব খাওয়া বন্ধ রাখার মত সংযমের বল প্রত্যেকেরই থাকা ভাল। নইলে, যাঁর নামে এই সভা, তাঁকে অসম্মান করা হয়। যেদিন সভার অধিবেশন নয়, সেদিন পাশা-খেলার যা একটা আড্ডা কোথাও কোথাও জম্‌তে দেখা যায়, তাতে যে হরিসভার মূল উদ্দেশ্যের কি শত্রুতা করা হয়, তা কিন্তু কেউ চিন্তা করে না। নেশাই যদি কত্তে হয়, তবে তাস-পাশার নেশা নয়, এখানে এসে ভগবানের নামের নেশা জমাবার চেষ্টা করাই সবার উচিত।

হরিসভা ও নামের নেশা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতের অধিকাংশ লোক একটা না একটা নেশার ঝোঁকে চল্‌ছে। যে নেশায় নিত্যকালের সুখ, তার দিকে কারো দৃষ্টি নেই, ক্ষণসুখের লোভে সবাই নেশার চেষ্টা করে। কেউ গাঁজার, কেউ কোকেণের নেশায় ভোর হ'য়ে থাকে। কিন্তু হরিনামের নেশা আর কয়জনের হয়? তারই জন্য না হরিসভার সৃষ্টি! "মোহান্ধ জীব, ভগবানের পানে তাকাও, নিজের সাথে তাঁর চিরসম্বন্ধ নির্ণয় কর, তাঁকে ভালবাস, তাঁর প্রেমে মজ"—এই কথা শেখাবার জন্যই না হরিসভার প্রতিষ্ঠা!

অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা হায়দ্রাবাদ হইতে আকুবপুর ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সৎকথার প্রস্রবণ ছুটিল। কত জনে কত রকমের প্রশ্ন করিলেন, কত রকমে শ্রীশ্রীবাবা তাহার জবাব দিলেন।

কথা ও কাজ

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বহু প্রশ্নের জবাব দিয়া পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কথার পর কথা ব'লে আর কথার পর কথা শুনে লাভ কি হবে বাবা, কথামত কাজ করাটাই বিশেষ প্রয়োজন। আমার মুখে হয়ত তুমি হাজার কথা শুন্‌লে কিন্তু কাজ কল্লে না একটাও। এতে লাভের হিসাবে কি জমা হবে? আমার মুখে একটী কথা শুন্‌লে, আর একটী কথাই প্রাণপণে ধ'রে রাখলে, সেই একটী

কথাকেই পালন কর্ব্বার জন্য প্রাণ দিলে। এতেই কথার সার্থকতা। হাজার কথার চেয়েও একটা কাজ বড়।

সার্ব্বজনিক গুরুবাদ প্রয়োজন

রাত্রি এগারটায় শ্রীশ্রীবাবা পাণ্ডুঘর চলিলেন। বর্ষাকাল চতুর্দ্দিকেই জল। সর্ব্বত্রই নৌকায় যাতায়াত হইতেছে। নৌকায় বসিয়াই আলোচনা চলিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্যক্তিগত গুরুবাদ একটা সর্ব্বজন-মিলন-বিরোধী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। অথচ সৎপাত্র থেকে দীক্ষা গ্রহণ সাধন-জীবনের উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। রামের গুরু একজন, শ্যামের গুরু আর একজন, যদুর গুরু একজন, মধুর গুরু আর একজন। ভিন্ন ভিন্ন গুরুর ভিন্ন ভিন্ন রকমের গোঁড়ামি আছে, যে গোঁড়ামিটা ব্যক্তিগত ভাবে তার হয়ত ইষ্টনিষ্ঠাবর্দ্ধক; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যেরা সেই সব গোঁড়ামিগুলিকে নিজ নিজ জীবনে এমন প্রাণান্ত যত্নে অনুশীলন কত্তে লাগলেন যে, আসল সাধন শিকায় তোলা রইল, অন্ধ কুসংস্কারের প্রাচুর্য্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সঙ্ঘে সঙ্ঘে দারুণ কোলাহলময় কলহ অপরিহার্য্য হয়ে উঠল। এজন্যই প্রয়োজন ব্যক্তিগত গুরুবাদের স্থলে সার্ব্বজনিক গুরুবাদ। যে ব্যক্তিই যার কাছ থেকে দীক্ষা নিক, গুরু থাকবে সকলের এক। তাহ'লে কলহ ও মতভেদ ক'মে যাবে।

কাঁহারা দীক্ষাদানের যোগ্য ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—দীক্ষা দেবেন তাঁরা, যাঁরা নিজেদের জীবনে উচ্চ আদর্শকে রূপবন্ত কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছেন ;—গৃহী হউন আর সন্ন্যাসী হউন, নিজ নিজ আশ্রমোপযোগী কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভিতর দিয়ে জন-সমাজ ও জগতের হিতকামনা কচ্ছেন ; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী যাই হোন, নিজের জীবিকা-সংগ্রহের চেষ্টার সাথে সাধক-জীবনের আধ্যাত্মিক উচ্চতার সামঞ্জস্য-বিধান কত্তে সর্ব্বদা চেষ্টিত রয়েছেন ;—পথভ্রান্তকে সুপথে এনে, অলসকে কর্ম্মপথে পরিচালিত ক'রে, অবিশ্বাসী অন্তরে সাধন-ভজনের বিশ্বাস অনুপ্রবিষ্ট

ক'রে অদীক্ষিতকে দীক্ষা প্রদান ক'রে জীবের অকপট হিতসাধনে চেষ্টিত রয়েছেন, কিন্তু নিজেরা কখনও "গুরু" ব'লে পূজা পাবার ইচ্ছাও করেন না, চেষ্টাও করেন না। ব্যক্তিগত সাধন-সিদ্ধিতে তাঁরা যত বড়ই হ'য়ে থাকুন, নিজেদের অন্তরে কণামাত্র গুরুভাব পোষণ না ক'রেই যাঁরা দীক্ষাপ্রার্থীকে ও দীক্ষাপ্রাপ্তকে সেবা দিয়ে যাবেন, সাধনে উৎসাহ যোগাবেন, সৎকার্য্যে প্রেরণা দেবেন, অপরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা বিস্তারে সহায়তা কর্ব্বেন, দীক্ষাদানকার্য্য একমাত্র তাঁদেরই করা উচিত। দীক্ষাদান-কার্য্য যদি কারো আর্থিক লাভের বা সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জ্জনের কিম্বা লোক-প্রভাব বর্দ্ধনের উপায় স্বরূপ করা হয়, তবে দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য পঙ্গু হ'য়ে যাবে।

কাহারা দীক্ষা পাওয়ার যোগ্য

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—শুধু দীক্ষাদাতার মনের ভাব এরূপ হ'লেই চল্‌বে না, দীক্ষা-গ্রহীতারও ভাব অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। দীক্ষাদাতা নিজে যাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি পেয়ে আজ সাধারণ মানবের চেয়ে বড় হয়েছেন, তিনি তাঁরই শক্তি, তাঁরই আশীর্ব্বাদ নবদীক্ষিতের ভিতরে সঞ্চারিত কচ্ছেন। ক্ষার্থীর মনেও এই ভাব সুস্পষ্ট থাকা দরকার। এই ভাব সুস্পষ্টভাবে সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাকে দীক্ষা দেওয়াই উচিত নয়। একই প্রণালীর সাধন সহস্র সহস্র লোকে কচ্ছ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষাদাতাকে অবলম্বন ক'রে তোমরা শত শত ভিন্ন ভিন্ন দল ও সম্প্রদায় গঠন ক'রে পরস্পর কাটাকাটি কচ্ছ, আত্মীয় আত্মীয়ের গায়ে লাঠি মার্‌ছ, এই অবাঞ্ছনীয় দুর্গতি থেকে যদি সমসাধকদের রক্ষা কত্তে চাও, তাহ'লে এই ছাড়া আর পন্থা নেই। প্রত্যেক দীক্ষার্থীর মনকে আদিগুরুর শিষ্য হবার জন্য তৈরী ক'রে নাও আগে, তারপরে আদি গুরুর প্রতিনিধিরূপে তাঁর আশীষ-পূত সাধন পন্থা অকপটে দীক্ষার্থীকে দান কর। ব্যক্তিগত গুরুপদকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে এই ভাবেই তোমাদিগকে সার্ব্বজনিক গুরুবাদকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে।

কিছুক্ষণ কথা বলিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা নৌকার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি বারোটায় নৌকা পাণ্ডুঘর পৌছিল।

পাণ্ডুঘর

২৫ ভাদ্র, ১৩৩৯

শ্রীশ্রীবাবা প্রাতঃকালীন ধ্যান-জপের পরে যখন সাবসর হইয়াছেন, তখন নানা গ্রামের সজ্জনেরা সৎকথালোচনা তুলিলেন। কোনও এক পল্লীতে আমাদের একটী গুরুভ্রাতা গভীর ত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠা সহকারে একটী লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়া উহা পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধেই প্রথমে কথা উঠিল।' শ্রীশ্রীবাবা তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অভিক্ষা শব্দের চল্‌তি মানে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"অভিক্ষা" শব্দের মানে কি? মানে ছাড়া ত' আর কোনো শব্দ হ'তে পারে না! অভিক্ষা শব্দের চল্‌তি মানে হ'ল আত্ম-শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস। যার আত্মশক্তিকে বিশ্বাসের অল্পতা নেই, সে অপরের কাছে যাচঞা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করে এবং নিজের যেদিকে যতটুকু শক্তি আছে, তার সম্পূর্ণ প্রয়োগ কত্তে চেষ্টা করে। এভাবে তার প্রস্ফুট শক্তি কাজে লাগে, অস্ফুট শক্তি বিকশিত হয়। অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথে সে পিতৃবীর্য্য ও মাতৃরজের ভিতর দিয়ে যতটুকু পৈত্রিক বা মাতৃক সদ্‌গুণ নিয়ে এসেছিল, সব সদ্‌গুণগুলির প্রকাশের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়।

অভিক্ষার মহত্তর অর্থ

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু অভিক্ষা শব্দের একটা মহত্তর মানে আছে। সেইটী হচ্ছে, সম্যগ্‌রূপে ভগবন্নির্ভর। তাঁর প্রেমময় জগতের যেখানে যে মঙ্গলস্ফুরণ প্রয়োজন, আবশ্যকীয় উপাদান ও উপকরণ সন্নিবেশ দ্বারা তিনি নিজেই তা যথাকালে পূরণ ক'রে নেবেন, এই বিশ্বাস। আমি ত' তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র! এই যন্ত্রটাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠরূপে যোগ্যতমভাবে ব্যবহার কর্ব্বার জন্য যখন যা যোগক্ষেম বহন প্রয়োজন, তা নিজের গরজেই ত' করবেন। আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে শুধু, যখন যেটুকু সুযোগ ও সুবিধা তিনি নিজে থেকে

আমার কাছে এনে দিচ্ছেন, আত্মশুদ্ধির জন্য, পরকল্যাণের জন্য, জীবমঙ্গলের উদ্দেশ্যে, তাকে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে এনে ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থেকে কাজ করা।

অহমিকা, কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ অভিক্ষাকে প্রথম অর্থে বোঝে, কেউ বা দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তির শক্তির স্ফূরণ খুব ঘটে, কিন্তু সঙ্গোপনে অন্তরের ভিতরে অহমিকা সঞ্চিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তির অহমিকা বিনষ্ট হয়। প্রথম-সাধকের অহমিকা সহায়ক, উৎসাহ-বর্দ্ধক, উত্তেজক। অগ্রসর সাধকের অহমিকার বিনাশই প্রয়োজন। রাজসিক কর্ম্মীর অহমিকা থাকবে, সাত্ত্বিক কর্ম্মীর অহমিকা লোপ পাবে। অহমিকা থাকার কুফল এই যে, অসাফল্যে বেদনা-বোধ অবশ্যম্ভাবী। অহমিকা নাশের সুফল এই যে, সাফল্যেও অসাফল্যে সমভাব ও শান্তভাব স্বাভাবিক। কর্ম্মের চেয়ে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কারণ, কর্ম্মে কর্ম্মবন্ধন বাড়ে, কর্ম্মযোগে বন্ধন কাটে। ফলের প্রতি নিরাকাঙ্ক্ষ হ'য়ে কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কর্ম্মযোগে সিদ্ধি আসে না। আত্মসমর্পণই কর্ম্মের বন্ধনকে কাটে।

নিজের মত ও পরের মত

অপর একজনের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি-প্রকৃতি বিভিন্ন থাকবেই। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টিরই একটা আনুসঙ্গিক সর্ত্ত। বৈচিত্র্যের প্রয়োজন না থাকলে সৃষ্টি হ'তই না। রুচি-প্রকৃতির এই বিভিন্নতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রথার মুলে কোনও সত্যিকারের ঐক্য নিহিত রয়েছে কিনা, তা আবিষ্কারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত ও প্রথার আলোচনা খুব প্রশস্ত। নিজের মত ও প্রথাকে বড় ব'লে দেখাবার জন্য অপরের মত বা প্রথার আলোচনা খুব ভাল কাজ নয়। অপরের মত ও পথের আলোচনা-কালে চরিত্র-মধ্যে নীতিমত্তা, সংযম, সহিষ্ণুতা, সত্যশীলতা ও শ্রদ্ধা

পরিপূর্ণভাবে থাকা দরকার। তাতে একপক্ষের কথায় অপরপক্ষের কুশল হ'তে পারে। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-সাধকদের ভিতরে এ সকল সদ্‌গুণ প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়েছে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারকদের ভিতরেও এগুলি আসা দরকার।

প্রয়োজন—সততা ও মনুষ্যত্বের

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কত ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি লোকপ্রিয় হবার জন্য পরনিন্দা করে। অথচ হয়ত মনে মনে জানে যে যার মুণ্ডপাত করা হচ্ছে, সেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে আছে। কত অদূরদর্শী ব্যক্তি দল-গঠনের সুবিধার জন্য অপরের দোষ বর্ণনা করে। অথচ হয়ত মনে মনে জানে যে, যার দোষ-কীর্ত্তন করা হচ্ছে, সে তেমন দোষী নয়। আমরা কত সময়ে নিজের দোষ ঢেকে রাখ্‌বার জন্য পরের দোষ প্রচার করি, নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে চলবার জন্য অপরের দায়িত্বের প্রতি অঙ্গুলী-প্রসারণ করি। এসব ক'রে সাময়িক কেউ করতালি পায়, কারো বা অস্থায়ী প্রতিপত্তি জন্মে, কিন্তু নিজের বা পরের, সমাজের বা দেশের কারো কোনো সত্যিকারের মঙ্গল এতে হয় না। প্রয়োজন লোকপ্রিয়তার নয়, প্রয়োজন হচ্ছে সততা ও মনুষ্যত্বের। প্রয়োজন দল-বৃদ্ধির নয়, প্রয়োজন হচ্ছে ধর্ম্মনিষ্ঠাজনিত বলবৃদ্ধির।

মানুষ হওয়া প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—সততা ও সংযম ব্যতীত মানুষ কখনো মানুষ হয় না, আর দেশও কখনো মানুষের দেশ হয় না। যেখানে মানুষেরা সব খাঁটি মানুষ, সে দেশই মানুষের দেশ। আমরা চাই এদেশ মানুষের দেশ হোক, কিন্তু নিজেরা কর্ব্ব কুক্কুরের জীবন যাপন। আত্মকলহকেই ধর্ম্ম ক'রে নেব। এ দেশ কি ক'রে মানুষের দেশ হবে? বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি হবে। সাতজন নেতার আটটা দল হবে। নিজেরা কেউ নিজেদের কর্ত্তব্য পালন কর্ব্ব না, অপরের শুধু কর্ত্তব্যের ত্রুটী প্রদর্শন ক'রে বেড়াব। এ দেশকে কেন লোকে মানুষের দেশ বল্‌বে? এদেশকে মানুষের দেশ কত্তে হ'লে দল-গঠনের চেষ্টার চেয়ে, সম্প্রদায়-পুষ্টির চেষ্টার চেয়ে, নিজেদিগকে মানুষ করার চেষ্টা প্রবলতর হওয়া প্রয়োজন।

মনুষ্যত্ব ভেদবুদ্ধির প্রশমক

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভেদবুদ্ধিকে বিনাশ করে। অমানুষ জীবে জীবে ভেদ করে, জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে বিদ্বেষ পোষণ করে। আর মানুষ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ববর্ণকে নিজের আপন ব'লে জানে। যে জাতির হোক্, যে বর্ণের হোক্, একটী ব্যক্তি যদি অধঃপাতে যায়, তাতে আমারই অধঃপাত হ'ল ; "যে জাতি বা যে বর্ণের লোকই উন্নতির পথে ধাবিত হোক, তাতে আমারই অভ্যুদয় হ'ল,"—প্রকৃত মানুষ এইভাবে বিচার করে। "আমার সঙ্গে সমগ্র সমাজের, সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশের সম্পর্ক,—তাই আবার আমার অধঃপাতই সমগ্র সমাজ, জা।ত ও দেশের অধঃপাত হ'ল,"— প্রকৃত মানুষ এইভাবে বিচার করে। "সকলের মঙ্গলে আমার মঙ্গল, আমার মঙ্গলে সকলের মঙ্গল,"—এই চিন্তা প্রকৃত মানুষের প্রতিক্ষণে স্মরণে থাকে। "কাউকে বাদ দিয়ে কারো কুশল হ'তে পারে না, প্রত্যেকের কুশল-অকুশলের প্রত্যেকেই অংশীদার",—এই খেয়াল সে কখনো হারায় না।

দম্পতির সাময়িক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত

জনৈক ভক্ত এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে শ্রীশ্রীবাবা অদ্য তিন বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রদান করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—গৃহস্থ-জীবনে আমৃত্যু সংযম সমাজ-বৃদ্ধির পরিপন্থী,—স্থলবিশেষে ব্যক্তিগত প্রীতি-বিকাশেরও বিঘ্ন। কিন্তু সাময়িকভাবে ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে পূর্ণ সংযমে প্রতিষ্ঠিত থাকা সর্ব্বাবস্থাতেই হিতকর। তোমাদের এই বিশ্বাস এই তিন বৎসরকাল থাকা প্রয়োজন যে, তোমাদের এই ব্রহ্মচর্য্যপালন একটা নিয়মের শাসন নয়, এর সাথে তোমাদের ঐহিক ও ও পারত্রিক কল।াণের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, এর সাথে তোমাদের ব্যক্তিগত হিত এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের হিত যুক্ত রয়েছে। একটা কঠোর নিয়মরূপে নয়, একটা মধুময় কর্ত্তব্যরূপে তোমরা একে পালন কর। সর্ব্বদা যত্ন নাও, যেন একের দ্বারা অপরের হিত বর্দ্ধিত হয়, একের চেষ্টায় অপরের কর্ত্তব্য পালন সহজ হয়। মনের চঞ্চলতা অপসারণের জন্য উভয়েই মনকে সর্ব্বদা সংসারীর ঊর্দ্ধে রেখে ভগবানের পবিত্র নামের সাধন কর।

দাম্পত্য-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন, এদেশে কোনো নূতন বস্তু নয়, অসম্ভব ব্যাপারও নয়।

ভাবী সন্তানের জন্য জনক-জননীর তপস্যা

অপরাপর জিজ্ঞাসুদের একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জনক-জননী যখন ভাবী সন্তানের জন্য তপস্যা করেন, তখনই মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের প্রকৃত গৌরব প্রাপ্য হয়। সন্তানের জন্ম যখন খোশ-খেয়ালেই হ'য়ে যায় না, পরন্তু সুকঠোর সংযম সাধনাই যখন সন্তানকে মাতৃ-জঠরস্থ এবং ভূমিষ্ঠ করে, তখনই এই জন্ম ইতর প্রাণীদের সাধারণ জীবসৃষ্টির দায়িত্বজ্ঞানহীন পর্য্যায় অতিক্রম ক'রে যায়। তখনই দেহের সীমাবদ্ধতার উপর পিতামাতা এবং সন্তানের মন ও আত্মার সীমাহীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জনক-জননী এই কর্তৃত্বকে কঠোর কৃচ্ছ্র-প্রভাবে লাভ করেন, আর, সন্তান প্রাপ্ত হয় উত্তরাধিকার স্বরূপে। পিতামাতা যত্ন নিলে যে ইচ্ছানুযায়ি-গুণসম্পন্ন সন্তান-সন্ততির জন্মদান কত্তে পারেন, আর কেউ একথা বিশ্বাস করুক আর না করুক, আমি কিন্তু দৃঢ়রূপেই বিশ্বাস করি। তপস্যার প্রভাবে সৃষ্টি-শক্তিকে মানুষ নিজ করায়ত্ত কত্তে পারে এবং বংশানুক্রমিকভাবে এই সাধন-প্রবাহ চল্‌তে থাক্‌লে জগতের প্রয়োজন অনুযায়ী বংশধর ও বংশধারিণীগণকে নির্ভুলরূপেই সৃষ্টি কত্তে পারে।

অতীত সুকৃতি-দুষ্কৃতি ও বর্ত্তমান সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, আমাদের বর্ত্তমান সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমাদের বংশানুক্রমিক অতীত সুকৃতি ও দুষ্কৃতিরই ফলস্বরূপ। অতীত কার্য্য ও চিন্তারাশিই আমাদিগকে বর্ত্তমান দুর্দ্দশার বা সৌভাগ্যের পরিবন্ধনে এনে ফেলেছে এবং বর্ত্তমানের কার্য্য ও চিন্তা দ্বারাই ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হবে। আজ যদি সমাজের প্রকৃতই কোনও সংস্কারের আশু আবশ্যকতা এসে থাকে, তবে তা হচ্ছে অবৈধ বীর্য্যক্ষয়ের দ্রুত নিরোধ,—অর্থাৎ কুমার জীবনে প্রাণপণ যত্নে সর্ব্বথা মৈথুন-ত্যাগ এবং বিবাহিত জীবনে কল্যাণ-সঙ্কল্পহীন শুভবুদ্ধি-বর্জ্জিত ক্ষণ-সুখ-লক্ষ্য বৃথা-মৈথুন বর্জ্জন।

বংশানুক্রমিক কল্যাণ-সাধনা

শ্রীশ্রীবাবা পুনরায় বলিলেন,—আমি বংশানুক্রমিক কল্যাণ-সাধনায় একান্তই বিশ্বাসবান্। বংশানুক্রমিকভাবে গার্হস্থ্য জীবনকে ধর্ম্ম-সাধনা ব'লে গ্রহণ কর্ব্বার চেষ্টা হ'য়েছিল ব'লেই আজ পর্য্যন্তও, আংশিকভাবে হ'লেও, ভারতীয় গৃহীর জীবন স্বার্থের সাথে পরার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য-বিধান ক'রে চল্‌তে সমর্থ হচ্ছে। বিষাক্ত, বিস্বাদ ও ক্ষতিকর উদ্ভিজ্জকেও যেমন কৌশলী উদ্যান-শিল্পীরা ধারাবাহিক উৎপাদনের দ্বারা কালক্রমে নির্ব্বিষ, সুস্বাদু ও উপকারী আহার্য্যে পরিণত করেছেন, বর্ত্তমান পাপ-পঙ্কিল মানব-জীবনকেও বংশানুক্রমিক পবিত্রতার সাধনার দ্বারা অকল্যাণলেশবিহীন ও সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ক'রে তুল্‌তে হবে। স্বভাব-কামুকের বংশধরকেও স্বভাব-প্রেমিক ক'রে তোল্‌বার অব্যর্থ উপায় হচ্ছে, বংশানুক্রমিক সংবৃত্তির অনুশীলন।

ভোগলিপ্সা-প্রেরিত বিবাহ

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভোগ-লিপ্সা যে বিবাহের প্রেরয়িতা, সে বিবাহে পুরুষানুক্রমিক দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা থাকে না। তারই জন্যে সে বিবাহ না হয় সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপালন, না হয় সমাজ-সংগঠনের পোষক, না হয় উন্নতিশীলতার পারম্পর্য্য-রক্ষক। ফলে মুখ্যতঃ তা পরিণত হয় একমাত্র পশু-প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় এবং গৌণতঃ তার দ্বারা দেহের ও মনের পুরুষানুক্রমিক অপকর্ষ বিধানই ঘ'টে থাকে। এর প্রকৃত ফল কি ? না, দেশ ও সমাজের অভ্যুত্থান-সম্ভাবনাসমূহের মূলে কঠোর হস্তে কুঠারাঘাত।

সুখ কি ?

বেলা দশ ঘটিকার সময়ে আকুবপুর হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ, শ্রীযুক্ত শশিমোহন, শ্রীযুক্ত প্রকাশ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন,—বাবা, সুখ কিসে মিলে ?

শ্রীশ্রীবাবা সুমধুরকণ্ঠে তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন,—

দিবা-বিভাবরী ভাবিতাম আমি
সুখের পাইব দেখা।
কে জানিত সুখ নিরাশা-নিদান,
সলিলে দলিল লেখা ?

কাঁদিতাম আমি করি হাহাকার,
"কৈ কোথা সুখ, এস একবার,
এস এই দীন হৃদয়-কুটীরে,
রহিতে পারি না একা।"

একদিন এসে প্রাণ-প্রভু মোর
কহিল,—"থামারে কাঁদাকাটি তোর,
সুখ তারি তরে নিবে গেছে যার
আশার রশ্মি-রেখা।"

"সুখ না চাহিয়া শান্তি যে চায়,
শত দুঃখেও সুখ সেই পায়,
ভুলে সব কিছু যে করেছে ব্রত
হরিনাম জপ শেখা "

নিলখি

২৬শে ভাদ্র, ১৩৩৯

রহিমপুর হইতে প্রাতে আটটায় রওনা হইয়া অদ্য অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা নিলখি পৌছিয়াছেন। পৌছিয়াই তাঁহাকে একটি ধর্ম্ম-সভাতে বক্তৃতা দিতে হইল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানকীনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহের প্রাঙ্গণে সভার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জাতি-বিদ্বেষ কেন দূর হয় না?

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কলহ আজ যেন আমাদের এক নিজস্ব বিশিষ্টতায় পরিণত হয়েছে! এর কারণ কি বন্ধু? এক কারণ, আমরা অনুদার, সঙ্কীর্ণচেতা, স্বার্থপর ও অবিবেচক। আর এক কারণ, আমরা চিন্তার্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা, সাধনার্জ্জিত উপলব্ধি দ্বারা পরিচালিত হবার সৎসাহস হারিয়েছি, সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাদের আগ্রহ নেই, সত্যের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় অনুরাগ নেই, আমরা লোকাচারের দাস, প্রথার কিঙ্কর, গতানুগতিক, স্থানু। যখন আমরা যে সমাজ-গণ্ডীর ভিতরে বাস করি, তখন সেখানে সভয় দৃষ্টিতে খোঁজ করি, অধিকাংশের মত কোন্ দিকে,—এখন এই 'অধিকাংশ' সমাজের নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর, আত্মতোষক ও হৃদয়-হীন ব্যক্তিরাই হউক না কেন, ক্ষতি নেই। সকল মানুষই যে সমান, একথা আমরা শত যুক্তিতেও বুঝব না। কেন বুঝব না? যেহেতু সত্য কথাকে বুঝতে গেলে অমুকের শাসন হ'তে পারে, তমুকের উৎপীড়ন হ'তে পারে, বড়কর্ত্তা রক্ত চক্ষুতে তাকাতে পারেন, ছোট কর্ত্তা চাবুক নিয়ে আস্‌তে পারেন। সত্যের জন্য উৎপীড়ন সইবার আমাদের সাহস নেই, আর তারই জন্য সব চেয়ে বেশী মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিরাই অনায়াসে পদাঘাতে আমাদের বিবেকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। এজন্যই যতবার জাতি-বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা মহামানবেরা করেছেন, ততবারই দুদিনের উৎসাহপূর্ণ অভিযানের পরে সেই চেষ্টার মূলশুদ্ধ উৎপাটিত হ'য়ে গেছে।

সুদীর্ঘকালস্থায়ী বক্তৃতায় শ্রীশ্রীবাবা আরও বহু হিতকর কথা কহিলেন। সকলেরই প্রাণে কথাগুলি লাগিল।

ওঙ্কারই সকল ধ্বনির প্রাণ

সন্ধ্যার পরে এই গ্রামের একটী নিরক্ষরা সধবা মেয়ে দীক্ষিতা হইলেন। তাঁহার স্বামী ইহার পূর্ব্ববার দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা মেয়েটীকে উপদেশ দিতে দিতে বলিলেন,—জগতের যেখানে যত শব্দ শোন,

সকল শব্দেরই প্রাণ হচ্ছে ওঙ্কার। একটী লোকের গায়ে যদি আট দশ রকমের জামা পরা থাকে, আর একে একে তার সবগুলি জামা যদি খু'লে ফেলা যায়, তাহ'লে সর্ব্বশেষে তার প্রকৃত মূর্ত্তিটা প্রকৃত শরীরটা সকল জামার নীচ থেকে বেরিয়ে আসে। ঠিক্ তেমনি জগতের সকল শব্দকেই একটা একটা ক'রে সাধন কত্তে কত্তে যদি তাদের বাইরের আবরণটা ছাড়িয়ে ফেলা যায়, তাহ'লে একদিন দেখা যাবে, তাদের শেষ মুর্ত্তিটা হচ্ছে ওঙ্কার বা প্রণব। সকল শব্দের ভিতরে সকল মন্ত্রের ভিতরে সকল ধ্বনির ভিতরে ওঙ্কার তার প্রাণ-স্বরূপ রয়েছেন। প্রণব ছাড়া শব্দ নেই, প্রণব ছাড়া মন্ত্র নেই। এই কথাটী স্মরণে রেখে জগতের প্রত্যেক শব্দে ওঙ্কারের ঝঙ্কার শোন্‌বার জন্য চেষ্টা কর্ব্বে। শিশু ক্রন্দন কচ্ছে, তার কান্না থামাবার জন্য তাকে কোলে নিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা কত্তে থাক, তার সেই কান্নার শব্দের ভিতরেই প্রণবের মধুময় রেশ্ শোন্‌বার জন্য। শ্বাশুড়ী কোনও অপরাধের জন্য কঠোর কণ্ঠে শাসন কচ্ছেন, সেই শাসন থেকে নিজের ভবিষ্যৎ আচরণকে নির্দ্দোষে ক'রে গঠন কর্ব্বার জন্য উপদেশ সংগ্রহ কর এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আপাত-পরুষ কণ্ঠস্বরের মাঝে ওঙ্কারের ধ্বনি শুন্‌তে চেষ্টা কর। পিতা স্নেহময় কণ্ঠে আদর কচ্ছেন, প্রতিবেশী কেউ কোনও সংবাদ জানাচ্ছেন, স্বামী প্রেমমাখা স্বরে আহ্বান কচ্ছেন,—সকল শব্দের ভিতরে একমাত্র ওঙ্কারের নিত্য অবস্থিতি অনুভব কর্ব্বার চেষ্টা কর। কোকিলের কুহরণে, কাকের কা-কা রবে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, মেঘের গর্জ্জনে অনুক্ষণ এই একটী নামই আস্বাদন কর।

ওঙ্কার সর্ব্বজনীন মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তুমি হয়ত ভাব্‌তে পার, "আমি একটী নিরক্ষরা মেয়ে, আমি কি এত বড় কঠিন সাধন কত্তে পার্ব্ব?" খুব পার্ব্বে মা, খুব পার্ব্বে। একদিন এই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটী মেয়ে ওঙ্কার-মন্ত্রে নিত্য উপাসনা কত্তেন। সেদিন এই পবিত্র মন্ত্র তালাচাবি দিয়ে সিন্দুকে বদ্ধ করা ছিল না। সেই দিন এই মন্ত্র সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি ছিল। আকাশের সূর্য্যরশ্মির উপরে যেমন কারো একক অধিকার নেই, চাঁদের আলোর উপরে, মলয় বায়ুর উপরে,

বর্ষার বারিধারার উপরে যেমন সকলের সমান অধিকার, সঙ্কীর্ণতা ছে'ড়ে যে বদ্ধ গৃহ-কোণ থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেই এ রশ্মি, এ আলো, এ বায়ু, এ বারিধারার সুখ-স্পর্শ অনুভব কত্তে পারে, প্রণব-মন্ত্রেরও তাই ছিল। তাই সেদিন ব্রাহ্মণ ছাড়া আর দ্বিতীয় জাত ছিলেন না, তাই সেদিন স্ত্রীলোকেরাও যজ্ঞসূত্র পরিধান কত্তেন। আবার সেদিন ফিরে আস্‌বে। মুচি, মেথর, চণ্ডাল বা নিষাদ ব'লে একজনও অনাদৃত থাক্‌বেন না, স্ত্রীলোক ব'লে একজনেও উপেক্ষিত হবেন না।

নিলখি

২৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

অদ্য বেলা আট ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ মোহন সাহা এবং শ্রীযুক্ত জগৎ চন্দ্র সাহা নানা বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবার সহিত আলোচনা করিতেছেন।

বংশানুক্রমিকতা ও শিক্ষা

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা মানুষ যে ভবিষ্যতে মহৎ হ'য়ে উঠ্‌বে, তার জন্য দুটী দিকে সমান সুব্যবস্থা থাকা দরকার। একদিকে দরকার এমন ব্যবস্থার, যাতে পিতা আর মাতার কাছ থেকে স্বভাবতই সে কতকগুলি উৎকর্ষ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'তে পারে। অপরদিকে দরকার এমন ব্যবস্থার, যাতে পৈত্রিক ও মাতৃলব্ধ সদ্‌গুণগুলি শিক্ষার গুণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে পূর্ণ রূপে বিকশিত হ'তে পারে এবং পৈত্রিক ও মাতৃলব্ধ ক্ষতিজনক অপকর্ষগুলি শিক্ষা প্রভৃতির প্রভাবে হয় হীনবীর্য্য, নয় লুপ্ত হ'য়ে, যেতে পারে। একটা শিশু যে ভবিষ্যতে একজন মহাত্মা হয়, অপর একটা শিশু যে ভবিষ্যতে একটা গুণ্ডা বা জুয়াচোর হয়, কখনো তার অন্তর্নিহিত মূল কারণ থাকে তার পৈত্রিক অধিকারে, কখনো থাকে শিক্ষার ও সঙ্গের মাঝে। তুমি বেশ দৃঢ় বলশালী ও স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে কিনা, সেটা সম্পূর্ণ-ই পিতা-মাতার উপরে নির্ভর করে। প্রখর বুদ্ধি, প্রগাঢ় প্রতিভা, কঠোর

সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যবান্ মনোভাবের স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে তুমি ভূমিষ্ঠ হবে কি না, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তোমার পিতা-মাতার উপর। পিতামাতার দোষে তুমি এমন দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'তে পার, যা সহজেই রোগ-প্রবণ, যা অস্বাস্থ্যের আবাসভূমি। পিতা-মাতার দোষে তুমি এমন সব প্রবণতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'তে পার, যাতে তুমি স্বভাবতই অল্পবুদ্ধি, অসহিষ্ণু, অধৈর্য্যের আকর। কিন্তু আবার যত্নের গুণে, সেবার ফলে, শিক্ষার ফলে, সংসর্গের ফলে তোমাকে ক্রমশঃ এমন ভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, যাতে তুমি আংশিক হ'লেও বলশালী হ'তে পারো, আংশিক হ'লেও বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা সম্পাদন কত্তে পার, আংশিক হলেও অসহিষ্ণুতা, বদ্‌মেজাজি ভাব, অধৈর্য্যভাব প্রশমন ক'রে চল্‌তে পার। আবার তুমি স্বাস্থ্যবান্ হবার যথেষ্ট predisposition (প্রবণতা) নিয়ে জন্ম-গ্রহণ করা সত্ত্বেও যত্নের ত্রুটীতে, কুশিক্ষার দোষে, কুসঙ্গের কুফলে নিত্য-রোগা হ'তে পার, অকালে মারা যেতে পার, প্রগাঢ় প্রতিভার স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে এসেও একটা মাথা-পাগল বা জড়বুদ্ধি হাবাতে পরিণত হ'তে পার। যক্ষ্মারোগীর পুত্রকন্যারা স্বভাবতই যক্ষ্মারোগের একটা প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জন্মাবধি যত্ন নিলে তার অল্প হোক, অধিক হোক, প্রতিকার করা যায়, অনেক ক্ষেত্রে যক্ষ্মারোগের আশঙ্কা নির্ম্মূলও ক'রে দেওয়া যায়। এসব দেখে আমেরিকার লোকেরা শিক্ষা ও লালন-ব্যবস্থার উপরে নিদারুণ বিশ্বাসী। দুচার জন পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া আমেরিকার আর সকলেই মনে করে যে, শিশু যেমন লোকের রজোবীর্য্যেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, লালন-পালনের গুণে, শিক্ষার গুণে তাকে একটা দিগ্‌গজে পরিণত করা যাবেই যাবে। আবার আমাদের দেশে তোমরা ভাব যে, লালন-পালন যেমন হোক্, শিক্ষা-দীক্ষা যেমন হোক্, ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলের মধ্যে একদিন না একদিন ব্রহ্মবীর্য্যের প্রকাশ ঘট্‌বেই ঘট্‌বে ; বেণের ছেলে শিক্ষা-দীক্ষা যেমন পাক, অশিক্ষিত-পটুত্বের গুণেই পাকা ধুরন্ধর ব্যবসায়ী হবে। দুরকম ধারণাই একদেশদর্শী। প্রাচীন ভারতবর্ষ এই দুটী ধারণাকেই সামঞ্জস্যযুক্ত ক'রে সমাজ গঠন করেছিল। এই জন্যই ভবিষ্য-সন্তানের জন্মটা যাতে স্বাভাবিক উৎকর্ষের পরিমাণাধিক্য নিয়ে

হয়, তার জন্ম সমবৃত্তির বংশ থেকে স্ত্রী-পুরুষ বেছে বিবাহ দিত। আজ তাই এক কঠিন জাতিভেদের উৎপীড়ক নিগড়ে এসে পরিণত হয়েছে। আবার প্রত্যেক আর্য্য-সন্তানকে আট বছর বয়সেই গুরুগৃহে গিয়ে অধ্যয়ন ক'রে তাৎকালিক সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুযায়ী সৎসংস্কার সমূহের পুষ্টি বা সৃষ্টি বিধান ক'রে নিয়ে আস্‌তে বাধ্য কত্ত। আজ আমরা সেই প্রাচীন আদর্শকে হারিয়ে অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছি। চাই আজ এমন ব্যবস্থা, যাতে একটা ছেলে বা মেয়েও পিতার মদ্যপানাসক্তিতে বা দুশ্চরিত্রতায় এবং মায়ের নীচতায় বা অসতীত্বের ফলে পঙ্গু, দুর্ব্বল, উচ্চ-সম্ভাবনা-হীন হ'য়ে না ভূমিষ্ঠ হ'তে পারে। চাই আজ এমন ব্যবস্থা, যাতে, যে বংশে যে ঘরে যে কোনো অবস্থায় যে কোন শিশু জাত হোক, লালনের ত্রুটীতে বা শিক্ষার দোষে তার কোনও অন্তর্নিহিত বাঞ্ছনীয় সদ্‌গুণ নষ্ট না হ'তে পারে, বরং অন্তর্নিহিত অবাঞ্ছনীয় সম্ভাবনাসমূহ লুপ্ত হ'য়ে নূতন নূতন সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটতে পারে। এই ব্যবস্থা যখন সর্ব্বজনীন ভাবে ভারতবর্ষে হবে, তখনই ভারতবর্ষ নিখিল জগতের গুরুর আসন ফিরে পাবে।

ব্রত-গ্রহণের অর্থ

বেলা দশ ঘটিকার সময়ে জনৈক ভক্ত তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সহ তিন বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন।

উপদেশ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্রত-গ্রহণের মানে হচ্ছে, চারাগাছে বেড়া দেওয়া। বেড়া না দিলে চারাগাছ ছাগলে খেয়ে ফেলে, আর বেড়া দিয়ে উপযুক্ত কাল রাখতে পারলে, সেই গাছে একদিন হাতী বেঁধে রাখা যায়। তোমরা যে ব্রত-গ্রহণ কচ্ছ, তার মানেও এই। ছোট ছোট চারাগাছের জঙ্গল কিন্‌বার লোক খুঁজে মিলা ভার, বড় বড় বনস্পতির বনের মূল্য এত যে, তা কিনবার লোক শত শত থাক্‌লেও টাকা পাওয়াই ভার। হ'তে যদি হয়, বনস্পতি হও, যার ছায়াতে বহু পথিক বিশ্রাম পাবে, যার শাখাতে বহু পাখী বাসা বাঁধবে, যা ম'রে গেলে কাঠ কিনে নেবার জন্য লক্ষপতি পাগল হবে। তারই জন্য এ ব্রত-বন্ধন। লোক দেখাবার জন্যও নয়, প্রথার দাসত্ব কর্ব্বার

জন্যও নয়, দুর্ব্বল জীবনকে সবল ক'রে তোলার জন্য অল্প দামী জীবনকে অমূল্য জীবনে পরিণত করার জন্য তোমাদের ব্রতগ্রহণ। এ কথা কখনো ভুলো না।

দম্পতির ব্রহ্মচর্য্য নিখিল জগতের হিতার্থে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনন্ত ব্রত, পঞ্চমী ব্রত প্রভৃতি কত ব্রতই ত' মা এতকাল করেছ। এমন গ্রাম নেই, যে গ্রামের মেয়েরা এসব ব্রত না করে! এই সব ব্রত উপলক্ষ্যে একদিন সংযম-পালন করা, একদিন শুদ্ধাচারে থাকা, এসব অভ্যাস হচ্ছে। তাতে, পরোক্ষে চিরদিন সংযমী থাকার, চিরদিন শুদ্ধাচারে থাকার, প্রণোদনা যোগানই ব্রত-প্রতিষ্ঠাতার মূল উদ্দেশ্য ছিল, একথা বুঝতে হবে। কিন্তু কত ব্রত করেছ আর কচ্ছ, উদ্দেশ্য কোনোটারই চিন্তা কর নাই। একটী সন্তান-লাভ হোক্, কোনো ব্রত এই উদ্দেশ্যে করেছ। একটী সঙ্কট-ত্রাণ হোক্, কোনো ব্রত এই উদ্দেশ্যে করেছ। কিন্তু ইহপরকাল সার্থক হোক, পুণ্যময় হোক, নিজের জীবনের সাথে নিখিল জগতের সকল জীবের জীবন ধন্য হোক্, এই উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো ব্রত কর নাই। দম্পতীর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত সেই ব্রত, যাতে নিখিল জগতের পরিপূর্ণ কুশল হচ্ছে উদ্দেশ্য।

ব্রতগ্রাহী ও লোকাচার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্রত যে-ক'দিনের জন্য নিয়েছ, সে-ক'দিন লোকাচারের, লোকমতের আর কুলপ্রথার দাসত্ব করা চল্‌বে না। যেখানে এসব তোমার ব্রত পালনের সহায়ক, মাত্র সেখানেই এগুলি মাননীয়। যেখানে এসব তোমার ব্রত-পালনের বিরোধক, সেখানে এগুলি অপালনীয়। Resist evil—অন্যায়কে বাধা দাও। সে অন্যায় তোমার অন্তরেই থাকুক, কি তোমার কুল-প্রথাতেই থাকুক, কি তোমার দেশাচারেই থাকুক। বাইরে তুমি মানুষ, ভিতরে হয়ত একটা কদর্য্য পশু দিনের পর দিন সঙ্গোপনে প্রবর্দ্ধিত হচ্ছে। সে পশুকে দমিত ক'রে ভিতরের দেবতাকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। তবে তোমার ব্রত গ্রহণ সার্থক হবে। কিন্তু এক পশুকে দমন কত্তে গিয়ে আর এক পশুকে না প্রশ্রয় দাও, তার জন্য তোমাদিগকে ভগবৎসাধনেই জোর বেশী দিতে হবে।

একটী রিপুকে দমনার্থে অপর রিপুকে ইন্ধন দান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা খাঁচার একদিকে একটা বাঘ, আর একদিকে একটা ভালুক। খাঁচার এক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। যদি তাকে এখনি মেরামত না কর, তা হ'লে হয়ত ভালুকটা এসে তোমাকে মারবে। তুমি তখন ভালুকের আস্‌বার পথ বন্ধ কর্ব্বার চেষ্টার জন্য যদি বাঘের পাশের বেড়া ভেঙ্গে ভালুকের আসা বন্ধ কত্তে চাও, তবে আবার বাঘ এসে তোমার ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে। এ সব ক্ষেত্রে একটার বেড়া না ভেঙ্গেই অপরের আস্‌বার পথ বন্ধ কত্তে হবে। ভালুকটাকে যদি আফিং খাওয়াতে আরম্ভ কর, তা হ'লে ক্রমে সে নেশার বশ হবে, অনিষ্ট করার ক্ষমতা তার লোপ পাবে। তারপরে আবশ্যক হয় ত' যে দিন ইচ্ছা সে দিন তাকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পার্‌বে। অথবা যে দিন তাকে তোমার কাজে লাগান দরকার, বলোত্তেজক ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা তাকে কর্ম্মক্ষম ক'রে তাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিতে পার্ব্বে। এই আফিং হল ভগবানের নাম। যে কাম সকলকে মোহিত করে, সেই কামকে তুমি ভগবানের নাম সাধন কত্তে কত্তে অনায়াসে দমন ক'রে ফেল্‌তে পারবে। তাই এই বিষয়ে ভগবৎ-সাধনের উপরেই বেশী জোর দেওয়া সঙ্গত। একটা রিপুকে দমন কত্তে গিয়ে অপর রিপুকে ইন্ধন দেওয়া উচিত নয়। ক্রোধকে প্রশ্রয় না দিয়ে যাতে কাম দমন ক'রে চল্‌তে পার, তা'র দিকে তোমাদের দিতে হবে প্রখর লক্ষ্য।

রিপুর দাস হইও না, প্রভু হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কামই বল, ক্রোধই বল, কোনো রিপুই প্রকৃত প্রস্তাবে রিপু নয়। তুমি যখন তার অধীন, তখন সে তোমার রিপু। সে যখন তোমার অধীন, তখন সে তোমার বন্ধু। রিপুর দাস না থেকে, তার প্রভু হও। যতক্ষণ তুমি দাস, ততক্ষণই তার কাছ থেকে তোমার বিপদের সম্ভাবনা; যখন তুমি প্রভু, তখন সে তোমার সর্ব্বকার্য্যে সহায়ক। যে কামের দাস, জগতে সে নারকী লম্পট ব'লে প্রকীর্ত্তিত, কিন্তু

কাম যার দাস, জগতে সে মহাযোগী মহেশ্বর ব'লে প্রপূজিত। কামকে যে দাসের মত রাখ্‌তে পারে, কার্ত্তিকেয়ের মত বীর্য্যবান ও গণেশের মত সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পুত্র তার জন্মে, লক্ষ্মীর মত শ্রীসম্পন্না এবং সরস্বতীর মত জ্ঞানবতী কন্যা তার জন্মে। আর কামের যে অধীন হয়, তার ঘরে জন্মে অসংযত, যথেচ্ছাচারী, কুক্রিয়াসক্ত বহুনিন্দিত অবাঞ্ছিতের দল।

দীক্ষা ও শিক্ষা

অপরাহ্নে যদিও কোনও সভা হইবার কথা ঘোষিত ছিল না, তথাপি বহু লোক সৎকথা শুনিবার জন্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন সাহার বাড়ীর প্রাঙ্গনে জমিয়াছেন। সমগ্র আঙ্গিনা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। একজন প্রশ্ন করিলেন দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সম্পর্কে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঈশ্বর-সাধনকে একটী সুদৃঢ় নিষ্ঠার ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্যই দীক্ষার প্রচলন। কারণ অদীক্ষিত ব্যক্তি একটী মন্ত্রসাধনে দীর্ঘকাল লেগে থাকে না, থাক্‌তে পারে না। দীক্ষিত ব্যক্তি যাতে প্রাপ্ত সাধনে আস্তে আস্তে নিরুৎসাহ ভাব অবলম্বন না করে, তার যাতে নামে রুচি না ক'মে যায়, তার যাতে অধ্যবসায় না প্রদমিত হ'য়ে পড়ে, তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার অর্থাৎ অনুশীলনের। সাধন-পথে অগ্রসর ব্যক্তিরা অনগ্রসর ব্যক্তিদের এই অনুশীলনে সাহায্য করেন, করা সঙ্গত বিবেচনা করেন। এই হ'ল শিক্ষার মূল কথা। পরে আস্তে আস্তে এক একটি সম্প্রদায়ের ভিতরে দীক্ষামন্ত্র দানের বা গ্রহণের পরে আবার একটী ক'রে শিক্ষামন্ত্র দেওয়ার বা নেওয়ার প্রথা সৃষ্ট হ'য়ে গেল। এই প্রথা সৃষ্ট হবার মৌলিক প্রয়োজন তৎকালে যাই থাকুক না কেন, মানুষ যে দিন যুক্তি, বিচার এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপরে নিজ সাধন-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হবে, সেদিন এই প্রথার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়্‌বেই পড়বে।

সাধনে একনিষ্ঠার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু যাঁরা এই প্রথার উপরে বিশ্বাসী এবং নিজ নিজ জীবনে দীক্ষামন্ত্রের পরেও আবার একটী পৃথক শিক্ষামন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁদের নিরস্ত করার জন্য শক্তি-ক্ষয় আমি প্রয়োজন মনে করি না। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বিবেকের বাণী শ্রবণ ক'রে পথ চলুন। মাত্র যাঁরা মনে করেন যে, আমার বাক্যই তাদের চাই, অন্য ব্যবস্থার প্রতি তাঁরা দৃকপাত কর্ব্বেন না, তাঁদের জন্য আমার উপদেশ এই যে, একটী মাত্র মন্ত্রের ভিতরেই বাবা ডুবে যাও, দুয়ারে দুয়ারে মন্ত্র চেখে বেড়ালে কোনো লাভ হবে না; একটী মাত্র সাধনেই নিজেকে আহুতি দিয়ে দাও, শত শত স্থানের শত শত যজ্ঞানলের আঁচ লাগিয়ে জীবন সার্থক হবে না। সাধনে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী একনিষ্ঠার। সাধন-পথ-চারীর পক্ষে দ্বিচারী বা বহুচারী হবার মত বিপদ আর কিছু নেই।

ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার মর্য্যাদা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার আদর্শ হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। মন্দোদরী গুণবতী রমণী ছিলেন, কিন্তু একজনেও আমরা তাঁর পূজা করি না, করি সীতার পূজা। কুন্তী বা দ্রৌপদী যত মহত্ত্বই অর্জ্জন ক'রে থাকুন না কেন, তাঁদের নাম শ্রবণ মাত্রই মাথা কারো শ্রদ্ধায় নত হয় না, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব বুঝিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক অবতারণ কত্তে হয়। কিন্তু সতী, শৈব্যা, দময়ন্তী, চিন্তার নামটী স্মরণ মাত্র বিনা যুক্তিতে বিনা তর্কে আমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিই। দ্রৌপদী অসাধারণ মেয়ে হ'লেও আমরা নিজেদের একটী মেয়েকেও "দ্রৌপদীর মত হও" এই আশীর্ব্বাদ করি না, আশীর্ব্বাদ করি এই ব'লে যে,—"সীতার মত হও, সতীর মত হও।" অহল্যা প্রভৃতি পঞ্চ নারীকে শ্লোকের কাঠামোতে বেঁধে প্রত্যহ বাধ্যকর ভাবে প্রাতঃস্মরণীয় ক'রে রাখা

সত্ত্বেও আমরা সীতার মতই মেয়ে চাই, সতীর মতই মেয়ে চাই। এর কারণ কি, এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার মর্য্যাদা অতীব বৃহৎ। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন যে আমাদের চখে এত মহৎ, তার একটা অতীব প্রধান কারণ এই যে, ইচ্ছা কর্‌লেই যিনি পত্ন্যন্তর গ্রহণ কত্তে পাত্তেন,—যার পিতা দশরথ স্বয়ং একজন বহুপত্নীক সম্রাট, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদন কালে ধাতু-নির্ম্মিত সীতা-মূর্ত্তি দিয়ে কাজ চালালেন, তবু পুনরায় দার-পরিগ্রহের চিন্তা পর্য্যন্ত কল্লেন না। ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার মূল্য এতই অধিক। সমাজ-জীবনেই যদি একনিষ্ঠার এত মর্য্যাদা হ'য়ে থাকে, তবে কি সাধন-জীবনে একনিষ্ঠা অধিকতর মূল্যবান্ ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়?

রহিমপুর
২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৯

আমৃত্যু সঙ্গীত

গত রাত্রে শ্রীশ্রীবাবা নিলখি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অদ্য বেলা দশ ঘটিকায় মুরাদনগর হইতে দুইটী সুকণ্ঠ গায়ক যুবক দীক্ষা নিতে আসিল।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে গান শুনাতে এসেছিস্ নাকি? "এভারত জাগ্‌বে আবার জাগবে রে তাই তপোবলে; এ দেশের অতুল গরব ডুব্‌বে না আর অতল জলে?"

১৩৩৭-এর ৬ বৈশাখ তারিখের উৎসবে সভা-প্রারম্ভে উক্ত দুইটী ভাই শ্রীশ্রীবাবার রচিত এই গানটী সভাস্থলে গাহিয়াছিল।

যুবকদ্বয় বলিল,—না বাবা, গান শুনাতে আসি নাই, এসেছি দীক্ষা নিতে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হাঁ, হাঁ, এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি। মাত্র একদিন গান শুনিয়ে বিদায় নিয়ে যেতে চাও না, তোমরা আমাকে গান শুনাতে চা'ও আজীবন আমরণ। এস তোমাদের দীক্ষা দিচ্ছি।

নামের গান

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ থেকে তোমাদের নামের গান গাওয়া সুরু হল। মঙ্গলময়ের নাম অবিরাম শ্বাসেপ্রশ্বাসে গান কর। এ গান গেয়ে নিজে কৃতার্থ হও, জগৎকে কৃতার্থ কর। এ গান তোমার বাইরের লোকে শুন্‌বে না, অন্তরের জনেরা শুন্‌তে পাবে। এ গান কেউ বাইরের কাণে শুন্‌তে পাবে না, অন্তরের কাণে শুন্‌তে পাবে। নামের গান বড় মজার গান। আমি যদি এখানে বসে গাই, তোমরা শুন্‌তে পাবে শত যোজন দূরে থেকে; তোমরা যদি এখানে বসে গাও, আমি শুন্‌তে পাব কোটি যোজন দূরে থেকে। এগান আয়ুঃপ্রদ,প্রীতিপ্রদ, সুখপ্রদ, শান্তিপ্রদ, অর্থাৎ নামের গান যে গায়, তার আয়ু বর্দ্ধিত হয়, তার অন্তর জগতের সকলের প্রতি প্রীতির রসে আপ্লুত হয়, তার প্রকৃত সুখের আস্বাদন জন্মে, সকল দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, সংশয়-শঙ্কা বিদূরিত হ'য়ে তার পরম প্রশান্তি লাভ হয়।

পূর্ণ মানুষের লক্ষণ

অপরাহ্নে আশ্রম-সমাগত জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করিলেন,—একটা পূর্ণ মানুষের লক্ষণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একথার জবাব মহর্ষি বাল্মিকীর মূল রামায়ণের প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। মহামুনি বাল্মিকী বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"হে মুনে, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি বীর্য্যবান্, ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী?" নারদ-ঋষি উত্তর দিলেন যে, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র এইরূপ গুণযুক্ত ব্যক্তি। বাল্মিকী জিজ্ঞাসা করেন নি যে, কোন্ 'নৃপতি' বর্ত্তমানে এইরূপ গুণান্বিত। তিনি জিজ্ঞাসা কৃচ্ছেন, কোন 'ব্যক্তি' বর্ত্তমানে এরূপ গুণান্বিত। অর্থাৎ তিনি গুণবান রাজার খোঁজ নিচ্ছেন না, অনুসন্ধান কচ্ছেন গুণবান্ ব্যক্তির, সেই ব্যক্তি এখন রাজাই হোন্ কি ভিক্ষুকই হোন্, তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি আদর্শ পুরুষের খোঁজ কচ্ছেন এবং যে কয়টি শব্দের দ্বারা আদর্শ পুরুষের গুণাবলি প্রকাশ পায়,সেই শব্দস্বরূপে ব্যবহার কচ্ছেন 'বীর্য্যবান্'

'ধার্ম্মিক' 'কৃতজ্ঞ' ও 'সত্যবাদী' এই চারিটী শব্দকে। এই চারিটী শব্দের ভিতর দিয়েই একটা পূর্ণ মানুষের লক্ষণ বা মানুষের পূর্ণতার লক্ষণ প্রকটিত হচ্ছে।

বীর্য্যবত্তা মনুষ্যত্বের প্রথম লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পূর্ণ মানুষের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে বীর্য্যবত্তা। বীর্য্য মানে উৎসাহ, বীর্য্য মানে ধৈর্য্য, বীর্য্য মানে শক্তি। যার উৎসাহ নাই, ধৈর্য্য নাই, শক্তি নাই সে পূর্ণ মানুষ নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যে দুর্ব্বল, সে ত অমানুষ! জগতে দুর্ব্বলতাই সব চেয়ে বড় পাপ। জগতে দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্তই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। দুর্ব্বল ব্যক্তি নিজ অক্ষমতার দৈন্যে নিত্য পরাধীন চিরপরমুখাপেক্ষী। দুর্ব্বলতা তার ওষ্ঠকে মিথ্যার বাস-ভবনে পরিণত করে, বাহুকে কর্ত্তব্য পালনে অনিচ্ছুক করে, তার মনকে কল্যাণবিমুখ, কুন্ঠিত ও সঙ্কুচিত করে। দুর্ব্বলতাই জগতের সকল পাপের প্রসবিনী। ।এজন্যই আদর্শ মানুষের অন্বেষণকারী বাল্মিকী প্রথমেই উচ্চারণ কল্লেন,—কে বর্ত্তমানে বীর্য্যবান ?

ধার্ম্মিকতা মনুষ্যত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু জগতে বহু বলবীর্য্যশালী পরাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মেছেন, যাঁদের আদর্শ পুরুষ বলে মানা চলে না। কেন না তাদের যেমন বীরত্ব ছিল, তেমন আবার ধার্ম্মিকতা ছিল না। একাকী বীর্য্যবত্তা খুব বড় গুণ নয়, যদি তার সঙ্গে না থাকে ধার্ম্মিকতা। অধার্ম্মিকের বীর্য্যবত্তা জগৎকে উৎপীড়িত করে, ধরণীকে তাপদগ্ধ করে, মানবের শান্তি নাশ করে। এই জন্যই বীর্য্যবত্তার সাথে চাই ধার্ম্মিকতা। কিন্তু ধার্ম্মিকতা বলতে কি বুঝায় ? চলতি ভাবে বুঝায় শাস্ত্রে বিশ্বাস এবং শাস্ত্রানুশাসিত জীবন যাপনের চেষ্টা। আর বুঝায়, পরকালে বিশ্বাস এবং পরকালের কুশল-লাভের জন্য ইহকালে সৎ-জীবন যাপন করার চেষ্টা। পরকাল কিছু থাকুক আর না থাকুক, পরকালের কুশল-লাভের চেষ্টা উপলক্ষ্যে ইহকালের সর্ব্ববিধ কুশল-লাভ হয়ে থাকে, এটি ধার্ম্মিকতার প্রধান ও প্রকট সুফল। কিন্তু ধার্ম্মিকতার সব চেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা

হচ্ছে সর্ব্বদা এমন একটা মনোভাবের পরিবেষ্টনীর ভিতরে বাস করা, এমন একটা মেজাজের মধ্যে থাকা, যাতে বাক্য ও কার্য্য সর্ব্বদা মহত্তম আদর্শকে উচ্চতম মঙ্গলকে অনুসরণ ক'রে চলতে বাধ্য হয়। আমার বাক্য এবং কার্য্য যদি আমার নিজের হিতের জন্যই মহত্তম আদর্শের অনুসরণ করে, তাতে আমার কুশলের সাথে সকলের কুশল অবশ্যম্ভাবী। যেখানে স্বার্থপরতার অনুসরণ ক'রে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ প্রাপ্তিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের বাক্য এবং কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে একের কুশলের ভিতর দিয়ে বহুর কুশল হ'তে পারে না। তাই ধর্ম্মের প্রয়োজন, তাই ধার্ম্মিকতার প্রয়োজন।

কৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্বের তৃতীয় লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—আমরা ধর্ম্মের নামে কত কলহ করি, কত লড়াই দেই, কত লেখনী-সঞ্চালন করি, কত রসনা-কণ্ডুয়ন মিটাই, কিন্তু জীবনের ভিতরে যদি ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে না পারি তাহ'লে ত ধার্ম্মিকতার বাহ্য সৌষ্ঠবে কোন কাজ দেবে না। প্রমাণ থাকা চাই যে, আমাদের জীবনে ধর্ম্ম মূর্ত্তিমন্ত হয়েছেন। তার সহস্র লক্ষণের মধ্যে স্ফুটতম লক্ষণ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। এই জন্যই মহামুনি বাল্মীকি 'ধার্ম্মিক' কথাটার পরেই বলছেন 'কৃতজ্ঞ' কথাটা। যার জীবনে কৃতজ্ঞতা পরিস্ফুট, সে ধার্ম্মিক না হয়ে পারে না। যে ধার্ম্মিক, তার জীবনে কৃতজ্ঞতা না ফুটে পারে না। ভগবানের দান, মানুষের দান, স্থূল দান, সূক্ষ্ম দান, সকলের সকল দানেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হন। মনে মনে কৃতজ্ঞতার ঋণভার অনুভব ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হন না, অন্তরের ধন্যবাদের অর্ঘ্য সাজিয়ে তিনি উপকারীকে অর্পণ করেন। জগতের যত স্থানে জ্ঞাত অজ্ঞাত যত ঋণ আছে, সব ঋণের জন্য তিনি হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্বেল তরঙ্গাভিঘাত উপলব্ধি করেন। "একটী ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে ক্রম-বিকশিত হ'য়ে কোটি কোটি বৎসর ধ'রে আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে রূপান্তর পেয়ে পেয়ে আজ এই মনুষ্য-দেহ হয়েছে" —এভাবে বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদীদের মতানুসারেই চিন্তা কর, অথবা "একটার পর একটা ক'রে চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ ক'রে, কত জননীকে কত ক্লেশ দিয়ে ক্রমে ক্রমে এই মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি,"—এভাবে

জন্মান্তর-বাদীদের সংস্কারানুযায়ীই চিন্তা কর,—লক্ষ্য করলেই বুঝবে, একটা প্রাণীর কাছেও তোমার ঋণ-স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। সর্ব্বত্র ঋণ-স্বীকার করা ধার্ম্মিকতার জ্বলন্ত লক্ষণ। কারণ, কৃতজ্ঞতা মানবকে ঔদ্ধত্য-বর্জ্জিত করে, বিনয়ী করে, বিনম্র করে। ধার্ম্মিকের পবিত্র হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা যেন একটা স্বয়ংজাত গুণ, একটা স্বতঃসিদ্ধ সম্পত্তি।

সত্যশীলতা মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু জগতের সকলের নিকটই যার ঋণ, জগতের সকলের নিকটই যে কৃতজ্ঞ, জগতের সকলের প্রতি পরস্পর বিরোধী কর্ত্তব্য এসে দাঁড়ালে সে কার নির্দ্দেশ নিয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্ব্বে? একজনের দ্বারা আমি উপকৃত ব'লে তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আছে। ঠিক ঐরূপ আর একজনের দ্বারা আমি ঠিক্ ঐ রকমই উপকৃত আছি, ফলে তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা আছে। এই দুই ব্যক্তি একই সময়ে আমার উপরে একই বিষয়ে সমান সেবার দাবী কর্ল্লে'ন, যা একজনকে দিতে গেলে আর একজনকে দেওয়া যায় না। সে সময়ে আমি কি কর্ব্ব? কার নির্দ্দেশে চলব? এই সমস্যার মীমাংসার জন্যই কবিগুরু বাল্মিকী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লে'ন,—"কোন্ ব্যক্তি সত্যবাদী?" সত্যবাদী শব্দের মানে এখানে শুধু সত্যবাদীই নয়, এর মানে সত্যচারী, সত্যশীল, সত্যানুসরণকারী। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা-বোধ যেখানে দুই বিরুদ্ধ কর্ত্তব্যের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি কর্ব্বে, সেখানে, কর্ত্তব্য-নির্ণায়ক হবে সত্য। পিতা দশরথ আদেশ দিয়েছেন, "বনে যাও," মাতা কৌশল্যা আদেশ কচ্ছেন, "গৃহে থাক"। দুজনই সমান গুরু, একজন জন্মদাতা ও প্রতিপালনকর্ত্তা, অপর জন গর্ভধারিণী ও স্তন্যরসপ্রদায়িনী। কৃতজ্ঞতা কার কাছে কম? কাকে মানি, কাকে উপেক্ষা করি? এই প্রশ্নের মীমাংসা কর্ল্লে'ন রামচন্দ্র সত্যের মানদণ্ডে। পিতা সত্যে আবদ্ধ, মাতা সত্যে আবদ্ধা নন। সুতরাং পিত্রাদেশই পালনীয়।

রহিমপুর

৩০শে ভাদ্র, ১৩৩৯

অদ্য বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা গ্রামের কোনও বিশিষ্ট পরিবারের দুইটী ধার্ম্মিকা বাল-বিধবাকে দীক্ষাদান করিলেন।

উপাসনা-সময়ের নিষ্ঠা

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—সংসারের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করার উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই। কিন্তু সকল কর্ম্মের মাঝে একথা মনে রেখ, সংসার-সেবা আগন্তুক কর্ত্তব্য হিসাবেই কচ্ছ, তোমাদের চিরন্তন কর্ত্তব্য মঙ্গল-নিলয় শ্রীভগবানের সেবা। কোনও দেশ ভ্রমণে গেলে পথের মাঝে একজন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে দেখলে যেমন তাকে কিছু খাবার কিনে দাও এবং অন্য ভাবে যতটা পার, তার কষ্টের লাঘব কর, কিন্তু সব সময় খেয়াল রাখ যে বেলা বারোটায় তোমাকে অযোধ্যার গাড়ী ধর্‌তেই হবে, এতে অন্যথা করার উপায় নেই, ঠিক্ তেমনি সংসারের প্রত্যেকের সাধ্যমত সেবা কর্ব্বে কিন্তু গাড়ী ধরবার সময় এলে আর একচুল দেরী কর্ব্বে না। দৈনিক উপাসনার সময়ে হাজার কর্ত্তব্য এলেও ভগবানের কাজই আগে ক'রে নেবে।

সর্ব্বদা অতন্দ্রিত থাক

অপরাহ্নে আশ্রম-সমাগত কয়েকজন যুবককে শ্রীশ্রীবাবা নানাবিধ হিতকর উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—সর্ব্বদা অতন্দ্রিত থাক। নিমেষের তরেও বিস্মৃত হয়ো না যে, চতুর্দ্দিকের সহস্র মায়াজাল ছিন্ন ক'রে তোমাদিগকে জ্ঞানময়, ঋতময়, প্রেমময়, আনন্দময় জ্যোতি-লোকে সত্য আস্বাদন লাভ কত্তে হবে। সাধকদের মুখে সেই নিত্যানন্দধামের প্রাণারাম বর্ণনা শুনেই ক্ষান্ত থেকো না, নিজের চখে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রস্তুত হও, যত্নবান্ হও। আছ আছ বালক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, প্রকৃত তপস্বীর ন্যায় নিজের স্বভাবটীকে নির্ম্মল ও পূর্ণবিকশিত কর্ব্বার জন্য প্রাণপণে চেষ্টান্বিত হও। রিপুগণের উল্লাস প্রশমিত ক'রে নিজেকে তাদের করাল কবল থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণে যত্নশীল হও।

ভগবানকে জান্‌বার উপায়

উপদিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবানকে জান্‌বার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাহ্য জগৎ থেকে সর্ব্বাগ্রে তোমার সমগ্র ইন্দ্রিয়-গণের সম্বন্ধকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নাও। তারপরে প্রেমভরে ব্যাকুল প্রাণে ভগবানের পরম-পবিত্র নাম ধ'রে তাঁকে ডাক। একদিন নয়, দুই দিন নয়, দিনের পর দিন হৃদয়-ভরা আকুলতা নিয়ে তাঁর প্রেমময় নামের জপ চালাও। ক্রমে দেখবে, আপনি তোমার দিব্যদৃষ্টি খুলে যাচ্ছে, তুমি তাঁর পবিত্র স্বরূপ অবগত হ'য়ে ধন্য হয়েছ ।

নামে রুচি

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু তুমি যে দিনের পর দিন তাঁর নাম ধ'রে তাঁকে ডাক্‌বে, তার জন্য নামে রুচি আসা দরকার। সেই রুচি কারো মহাভাগ্য-গুণে তাঁর অপার কৃপায় আপনা আপনি আসে। আর সকলের নামে রুচি সৃষ্ট হয় অবিরাম নাম কত্তে কত্তে। ভাল লাগুক আর না লাগুক, নাম ক'রে যেতে থাক। নাম নিজের শক্তি নিজেই প্রকাশ কর্ব্বেন। একবারও যদি নাম জপ, তবে জেনো, তারও ফল আছেই আছে।

নামজপের প্রত্যক্ষ ফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নাম কখনও বৃথা হয় না। সকল দিকের পিছন-টান অগ্রাহ্য ক'রে একটা সপ্তাহ নাম জপ ক'রে দে'খো, দেহে মনে তার প্রত্যক্ষ ফল দেখ্‌তে পাবে। দেহে আপনা আপনি একটা অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধতা উপলব্ধ হবে, চক্ষুর দৃষ্টি আপনা আপনি প্রসন্ন হবে, মস্তিষ্ক উত্তেজনা পরিহার কর্ব্বে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিরুদ্বেগ হবে, হৃৎস্পন্দন প্রশান্ত ভাবে হ'তে থাক্‌বে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বেগ ক'মে যাবে। এসব ফল ত যে-কেউ কয়েক দিন নাম জপ করলেই প্রত্যক্ষ কত্তে পারে।

কিন্তু নাম জপের যত ফল, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুফল প্রথমে হচ্ছে নামে রুচি, শেষে হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম।

আমুকী (নোয়াখালী)
১লা আশ্বিন, ১৩৩৯

অদ্য প্রাতে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা জনৈক ব্রহ্মচারী সহ সোনাইমুড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শিবপুর গ্রামনিবাসী শ্রীশ্রীবাবার এক ভক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মজুমদার এবং আমুকী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যশোদা কবিরাজ শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছেন। একখানা নৌকা-যোগে সকলে আমুকী রওনা হইলেন।

তপস্বীর দান

কবিরাজ মহাশয় মহাত্মা ভোলাগিরি মহারাজের শিষ্য এবং সদ্বিষয়ে অত্যন্ত সদালাপী। তিনি নানা সৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

কোনও একজন নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের তিরোধান সম্পর্কে আলোচনা হইতে হইতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তপস্বী মহাপুরুষেরা জন-সমাজের জন্য দেহাবসানে নিজ নিজ তপস্যার উত্তরাধিকার রেখে যান। অর্থ বা সম্পত্তি, গোধন বা বিরাট বিরাট মঠ তাঁদের কাছে আমাদের দাবী নয়। ইচ্ছা হয় বা সম্ভব হয়, সৎকার্য্যের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য বিত্ত-সম্পত্তি, তাঁরা রেখে গেলেন, ভাল কথা। ইচ্ছা হয় বা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে একস্থানে ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে মঠ প্রতিষ্ঠা তারা ক'রে গেলেন, ভাল কথা। কিন্তু এসব তাঁরা রেখে যান আর না যান, তাঁদের কাছে জগতের যা প্রয়োজন এবং দাবী, তা হচ্ছে তাঁদের সুনির্ম্মল তপস্যা। ঋষি বশিষ্ঠ কোনো মঠ প্রতিষ্ঠ ক'রে যান নি, ঋষি বিশ্বামিত্রেরও প্রতিষ্ঠিত কোনো মঠের কথা কেউ জানে না, মহামুনি নারদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান পর্য্যন্ত ছিলনা, কিন্তু

জগৎ তাঁদের তপস্যা থেকে উপকৃত হয়েছে। মহাপুরুষেরা যে তাঁদের অদ্ভুত জীবনের জ্বলন্ত আদর্শ আমাদের জন্য রেখে যান, তাঁরা যে জীবকল্যাণে অনুষ্ঠিত সমস্তটুকু তপস্যা আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে আশীষ রূপে বর্ষণ ক'রে যান, এই টুকরই জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

জগন্মঙ্গল-চিন্তার সুফল

আমুকী গ্রামে পৌছিয়াও শ্রীযুক্ত যশোদা কবিরাজ মহাশয়ের সহিত অবিরাম সৎকথা চলিয়াছে।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোভের জিনিষ চিন্তা কত্তে কত্তে দেহ অজ্ঞাতসারে সেই দিকে যায়। জগন্মঙ্গল অবিরাম চিন্তা কত্তে কত্তেও তেমন দেহ অজ্ঞাতসারে জগন্মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়। কামুক ব্যক্তি অভীপ্সিতা রমণীর চিন্তা কত্তে কত্তে অজ্ঞাতসারে তার গৃহ-সমীপে উপনীত হয়। লোভী ব্যক্তি রসগোল্লার চিন্তা কত্তে কত্তে নিজের অজ্ঞাতসারে বাগবাজারে উপস্থিত হয়। ঠিক্ তেমনি সর্ব্বজীবের হিত-চিন্তা কত্তে কত্তে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে সর্ব্বজীবের হিতজনক কার্য্যে রত হ'য়ে যায়। আমি যতই স্বার্থপর হ'য়ে থাকিনা কেন, সহস্র স্বার্থ-সেবার মাঝেও যদি অবিরাম "জগতের মঙ্গল" "জগতের মঙ্গল" ব'লে চিন্তা ক'রে যেতে থাকি, তাহ'লে হঠাৎ একদিন তাকিয়ে দেখ্‌ব যে, কোন্ দিন আমার অজ্ঞাতে আমি স্বার্থপরতার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে জীবসেবায় রত হয়ে গেছি। তখনও স্বার্থের প্রভাব আমাকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম কর্ব্বে না সত্য, কিন্তু তখনও যদি অবিরাম "জগতের মঙ্গল" "জগতের মঙ্গল" ব'লে চিন্তা চালাতে থাকি, তাহ'লে এমন সময় আস্‌বে, যখন আমাদ্বারা জগতের অমঙ্গল-জনক কোনও কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব হ'য়ে পড়্‌বে। তারপরেও যদি "জগতের মঙ্গল" "জগতের মঙ্গল" এই চিন্তা অবিরাম চালাতে থাকি, তাহ'লে এমন সময় আস্‌বে, যখন আমি যা' কিছু করি, যা' কিছু বলি, যা' কিছু ভাবি, তার সম্পূর্ণ ফল গিয়ে জগৎ-কল্যাণেই রূপান্তরিত হয়।

জগৎ কল্যাণ ও ভগবানের নাম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবদ্ভক্ত সাধকেরা ভগবানের নামকে জয়ান্বিত করার জন্য বারংবার বলেছেন,—জয় জয় জগন্মঙ্গলং হরের্নাম, জগতের মঙ্গলকারক হরি-নামের জয় হউক। কেন তাঁরা এরূপ বলেন? যে হেতু ভগবানের নামের সেবার ভিতর দিয়েই জগতের নিত্যস্থায়ী মঙ্গলের প্রকাশ ঘটে, প্রতিষ্ঠা ঘটে। জগন্মঙ্গলের সাধক যখন তাঁর জগন্মঙ্গল সঙ্কল্পকে মঙ্গলময় ভগবানের পরমপবিত্র নামের সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তখন তাঁর জগন্মঙ্গল চিরস্থায়ী মঙ্গলে পরিণত হয়।

সংযম কাহাকে বলে

বেলা দুই ঘটিকার সময়ে জয়াগ এম-ই-স্কুলের ছাত্রগণ উপদেশ-বাণী শ্রবণের জন্য আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে সংযমের উপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার সুযোগ আছে, তবু তুমি কোনও একটা আসক্তির বস্তুকে গ্রহণ কচ্ছনা, প্রাণপণ যত্নে নিজেকে সেই আসক্তির বস্তু থেকে দূরে রাখ্‌ছ, এর নাম সংযম। তোমার চক্ষু কোনো একটা দৃশ্য দেখ্‌তে একান্ত সমুৎসুক, তুমি জানো যে চক্ষুকে স্বেচ্ছাচারে চল্‌তে দিলে কেউ তোমাকে বাধা দেবার নেই, কিন্তু এতে তোমার দেহের বা মনের অধঃপতন হ'তে পারে, তাই তুমি স্বেচ্ছায় চক্ষুকে শাসন ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এলে,—এর নাম সংযম। তোমার কর্ণ কোনো এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তে চায়, কারণ তাতে তোমার অতীব প্রীতি-বোধ হয়, তুমি যদি এ কণ্ঠধ্বনি শোনার জন্য চেষ্টা কর, তাহ'লে অন্যের অজ্ঞাতেই তা কত্তে পার, তবু তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ যে, এর পরবর্ত্তী ফল ভাল হবে না, অতএব তুমি কর্ণকে শাসন কর্ল্লে, মনকে শাসন ক'রে রাখ্‌লে, চরণকে শাসন ক'রে রাখ্‌লে,—এর নাম সংযম। এই ভাবে তোমার প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়ই কখনো না কখনো

কোনও জিনিষ বা ব্যক্তির জন্য ব্যাকুলতা অনুভব কত্তে পারে। কিন্তু তুমি তাকে শাসন ক'রে রাখ্‌লে, যথেচ্ছাচারী হ'তে দিলে না, এমন কি নানা সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তুমি তা' উপেক্ষা করলে, স্বাদের জিনিষকে লাভ কত্তে জিহ্বাকে প্রশ্রয় দিলে না, স্পর্শের জিনিষকে লাভ কত্তে চর্ম্মকে প্রশ্রয় দিলে না,—এর নাম সংযম।

সংযম সর্ব্বসুখের আকর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংযম সর্ব্বসুখের আকর। ইন্দ্রিয়-সুখ-লোভে প্রমত্ত হ'য়ে হিতাহিত-বিবেচনা-বর্জ্জিত কদর্য্য জীবন যাপনের ভিতরে সুখ নেই; সুখ আছে পঙ্কিল ব্যসন থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে চলায়, সুখ আছে ক্ষণসুখের লোভে নিজের সর্ব্বনাশ না ক'রে নিত্যসুখের আশায় কাম-ক্রোধাদি রিপুচয়কে দমন করায়, সুখ আছে দুর্ব্বলতার জনক রিপুর দাসত্ব না ক'রে রিপুকুলকে নিজের ক্রীতদাস ক'রে রে'খে আত্মসংযমের ভিতর দিয়ে ধৃতবীর্য্য, বলবান ও উন্নত হওয়ায়।

পূজা ও নৈবেদ্য

শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা-সমাপন হইলে দুই একজন ছাত্র এবং কোনও কোনও শিক্ষক দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। একটী ছাত্র জিজ্ঞাসিল যে, পূজা করিতে নৈবেদ্যের প্রয়োজন আছে কি না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"পূজা" মানে সন্তোষ-বিধান। যাঁর পূজা হচ্ছে, তাঁরও সন্তোষ-বিধান, যে পূজা কচ্ছে তাঁরও সন্তোষ-বিধান। সুতরাং নৈবেদ্যাদি সাজিয়ে যদি প্রাণে সন্তোষ লাভ কর, তবে তার প্রয়োজন আছে। যাঁর পূজা কচ্ছ, তাঁর সন্তোষ তোমার প্রাণের অকপট ভক্তিতে হবে, বাহ্য উপচার তার জন্য প্রয়োজন নয়। কিন্তু তোমার প্রাণের ভক্তি উৎপাদনের পক্ষে যখন বাহ্য উপচার প্রয়োজন হয়, তখন জান্‌বে যে, এতে তাঁরও অসন্তুষ্ট হবার কারণ নেই। নিজের আহারের জন্য যখন তুমি পায়েস রান্না কর, তখন দুগ্ধ আহরণে, শর্করা আহরণে

তোমার লোভ বেড়ে চলে। নিজের শয্যা বা দেহ সাজাবার জন্য যখন পুষ্পদল আহরণ কর, তখন তার সুরভি গন্ধে ও মাল্য-গ্রন্থনে তোমার ভিতরে একটা অসাত্ত্বিক উল্লাস জাগরিত হয়। কিন্তু সেই পায়স যখন অভীষ্টের পূজার্থে প্রস্তুত কর, সেই মালা যখন অভীষ্টের প্রীত্যর্থ গ্রন্থন কর, তখন চিত্ত সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এই জন্যই এইরূপ ক্ষেত্রে বাহ্য উপচার নিন্দনীয় নয়।

মাংস-নিবেদন

প্রশ্ন হইল,—ভগবানকে মাংস নিবেদন করা উচিত কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাই যখন খাও, নিবেদন ক'রেই খাওয়া উচিত। সুতরাং যে জিনিষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহার সম্ভব, তাই মাত্র আহার ক'রো। যা' শ্রদ্ধার সঙ্গে আহার করা চল্‌বে না, তা আহারই ক'রো না। মাংসাহার যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে কর, তবে মাংসাহারে আপত্তি করি না। যার যেমন রুচি এবং যার যেমন প্রয়োজন, সে তেমন আহারই কর্ব্বে। এ নিয়ে কলহ করা নষ্প্রয়োজন। কিন্তু তোমার আহারীয় বস্তু অন্যের দৃষ্টিতে মন্দ জিনিষ ব'লেই তুমি তা' নিবেদন কর্ব্বে না, এ কখনো হতে পারে না। আহার যদি কর, তবে নিবেদনও কত্তে হবে।

নিবেদনের তাৎপর্য্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিবেদন করার প্রকৃত তাৎপর্য্যটা কি ? পরমেশ্বর কি তুমি নিবেদন না কর্লে উপবাসী থাকেন ? তুমি নিবেদন করার পরেই কি তিনি দুই মুঠা খেতে পেয়ে ক্ষুধার জ্বালা থেকে একটু অব্যাহতি পান ? তুমি যে নিবেদন ক'রে খাও, এটা কি তাঁর প্রতি তোমার অনুগ্রহ ? কোটি ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সেই সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটী মানবের নিবেদন ছাড়া নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ কত্তে পারেন না ? যাঁকে লাভ কর্লে নিখিল বিশ্বের সকল প্রাণীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হয়, তিনি কি তোমার দেওয়া এক গণ্ডূষ জল আর এক গ্রাস অন্নের প্রতীক্ষায় দিন

কাটাচ্ছেন ? না, তা নয়। নিবেদন করা ব্যাপারটা সম্পূর্ণই তোমার নিজের প্রয়োজন। শরীররক্ষার জন্য আহারীয় গ্রহণ কচ্ছ, কিন্তু এই আহারীয় নিজের উপলক্ষ্যে গ্রহণ কচ্ছ ব'লে অহমিকা আর রিপুকুল তোমাকে ঘিরে ধরছে। তাই সকল অহমিকার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি আহারীয় বস্তু সেই নিরঞ্জন পরমপ্রভুকে নিবেদন কর,—"হে প্রভু, এ জিনিষ-গুলি তোমার, আমার নয়, তুমি এগুলি গ্রহণ কর, আমি তোমার দীনাতিদীন কিঙ্কর, তোমার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ নিরহঙ্কার চিত্তে গ্রহণ ক'রে তোমার সেবার জন্য এই তনুকে প্রস্তুত করি।" তোমার ভোগের বস্তু নিজেকে নিবেদন না ক'রে অগ্রে যে ভগবান্‌কে নিবেদন কর, তার শুভ ফল হচ্ছে এই যে, পরিণামে এই ভোগায়তন দেহও সম্পূর্ণরূপে তাঁরই চরণে উৎসর্গ ক'রে দিতে সমর্থ হবে। আহারীয় নিবেদন হচ্ছে সমর্পণের সুরু। এই থেকে ক্রমশঃ সম্যক্ আত্মসমর্পণ তোমার যাতে এসে যায়, তারই জন্য আহারীয় নিবেদন এক বাধ্যকর ব্যবস্থা।

খাদ্যার্থে প্রাণিহত্যা ও দয়া

একজন শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন,—খাদ্যের জন্য প্রাণি-হত্যা করা যায় কি-না ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— প্রাণী বলতে কি বুঝতে হবে, আগে তার নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। ছাগ, মৎস্য, কূর্ম্ম, শশক,কবুতর, হংস প্রভৃতিই শুধু প্রাণী ? না ডাঁটা গাছেরও প্রাণ আছে, লাউ গাছেরও প্রাণ আছে, শশা গাছেরও প্রাণ আছে ব'লে এরাও প্রাণী ব'লে পরিগণিত হবে ? আর প্রাণী-হত্যা করা যদি অনভিপ্রেত হয়, তবে তারই বা প্রকৃত কারণ কি, একথাও নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। কোনো প্রাণীকে হত্যা করলে সে কষ্ট পায়, এই জন্য দয়া বশতঃই যদি প্রাণি-হত্যা থেকে নিরস্ত থাক, তবে ডাঁটা গাছ, লাউ গাছ, শশা গাছকেও তুমি খাদ্য-প্রয়োজনে ব্যবহার কত্তে পার না ; এদের প্রতিও দয়া-প্রদর্শন প্রয়ো-জন। তুমি যখন এদের লতা কেটে আন, তখন এরা কষ্ট পায়। আর দয়াবশতঃ যদি প্রাণি-হত্যা থেকে নিরস্ত হও, তা' হলে ত' আপনা আপনি যে সব প্রাণী ম'রে যাচ্ছে, তাদের মাংস খেতে আপত্তি করতে পার না। কিন্তু প্রচণ্ড রকমের মাংসাশী ব্যক্তিও মরা ছাগল বা মরা কবুতরের মাংস খাবে না। অবশ্য

অসভ্য-বন্য বা পার্ব্বত্য জাতিদের কথা স্বতন্ত্র। তারা মরা জন্তুর মাংস খায়। কিন্তু তেমন আবার জীবিত প্রাণী হত্যারকালে তাদের মনে দয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

যুগ-প্রয়োজনে শরীর-গঠন ও আহারের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—খাদ্য গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ। আহার না কর্লে শরীর থাকে না, তাই আহার কত্তে হয়। আহার একটা বাধ্যকর প্রয়োজন। তাই কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ কোনও উপদেশ নেই,—"ওহে মানব, শরীর রক্ষার জন্য আহার ক'রো।" সব ধর্ম্মশাস্ত্রকার জান্‌তেন যে তিনি উপদেশ দিন আর না দিন, লোকেরা খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে আহার কর্ব্বেই কর্ব্বে। কিন্তু কেউ কদাহার না করে, কেউ কুখাদ্য খেয়ে রুগ্ন হ'য়ে না পড়ে, তারই জন্য তাঁরা আহার সম্বন্ধে নানা বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করেছেন। কোনও প্রকারেই কোনো প্রাণীরই বিন্দুমাত্র অহিত না ক'রে মানুষের বাঁচবার উপায় নেই। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালাচ্ছ, তাতে কত লক্ষ কোটি প্রাণী তোমার অলক্ষ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। থালা-বাসন পরিষ্কার কচ্ছ, তাতে কত প্রাণীর অন্তিমকাল সমুপস্থিত হচ্ছে। সুতরাং প্রাণি-হত্যা পাপ, এই যুক্তির উপরে আহার্য্য নির্দ্ধারণ কত্তে গেলে না খেয়ে থাকতে হয়। আহারীয় নির্দ্ধারণের প্রথম এবং প্রধান যুক্তি হবে, শরীর-পোষণ। যে যুগে তুমি জন্মগ্রহণ ক'রেছ সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবী পূরণের উপযুক্ত ক'রে শরীর গঠনের জন্য তোমার কি খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক,—বিচার হবে এই যুক্তিতে। কোনো দেশ যদি থাকে পরাধীন, ক্ষাত্র শক্তি ছাড়া অন্য শক্তি দিয়ে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার যদি অসম্ভব ব'লে বিবেচিত হয় এবং দেশের অধিকাংশ নর-নারী যদি স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার কল্পে প্রাণদানের জন্য আত্মগঠন কত্তে থাকে, তাহ'লে তখন তারা শরীরকে রণক্ষম ও আক্রমণ-কুশল করার জন্য সর্ব্বজনীন ভাবে মাংসাহার সুরু কর্‌বে,—এটা ত' যুগের দাবী! কোনো দেশ যদি থাকে স্বল্পায়ুদের নিবাস-ভূমি, আয়ুর্বৃদ্ধি-কল্পে যদি সেই দেশের অধিকাংশ

নরনারী সমুৎসুক হয়, তবে যে খাদ্য গ্রহণে পরবর্ত্তী শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা কম, অথচ যা শরীরের সহিষ্ণুতা বর্দ্ধনে সহায়ক, দেশের অধিকাংশ নরনারী ত' সেই নিরামিষ আহারীয়ই গ্রহণ ক'রে যুগের দাবী পূরণ কর্ব্বে। সৈনিকের দীর্ঘ জীবন প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন হচ্ছে দৃঢ় জীবন; দার্শনিক, অধ্যাপক, সাধক, তপস্বী, অর্থার্জ্জন-পরায়ণ ব্যক্তি ও সাধারণ সংসারীর দীর্ঘ জীবনই প্রয়োজন। তাই একজন দৃঢ় জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে মাংসাশী হবে, অপর জন অনাময় দীর্ঘ জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে হবে নিরামিষাশী। আহারীয় নির্ণয়ের যুক্তি হবে এইটা, – প্রাণি-হিংসা বা অহিংসা নয়।

খাদ্য, স্বাস্থ্য, ও লোভ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার শরীরের প্রয়োজনে বা তোমার জীবনাদর্শের দাবীতে বাধ্য হ'য়ে যদি তুমি মাংসাহার কর, মৎস্যাহার কর, তাহ'লে সুস্থ পশু, সুস্থ পক্ষী বা সুস্থ মৎস্যই তোমার সেবনীয় হওয়া উচিত। অসুস্থ প্রাণীর মাংস খেয়ে নিজের শরীরকে অসুস্থ হবার সুযোগ দিও না। এইটা শাস্ত্রকারদের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই তাঁরা গৃহ-পালিত বৃষের মাংস অখাদ্য তালিকাভুক্ত ক'রে দিয়ে স্বচ্ছন্দ বনচারী মৃগের মাংসকে বৈধ ক'রে নিলেন। অথচ মৃগ আর বৃষ একই গোজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং অনুরূপ প্রাণী। কারণ, স্বচ্ছন্দ-বনচারী মৃগের রোগ-সম্ভাবনা অল্প। এজন্যই তাঁরা গৃহপালিত বরাহ ও গৃহপালিত কুক্কুটের মাংসকে নিষিদ্ধ ক'রে দিয়ে বনচারী বরাহ ও বনচারী কুক্কুটের মাংসকে বৈধতার মর্য্যাদা দিলেন। আবার মাংস-ভক্ষণ যাতে তুমি লোভ-বশে না কর, তার জন্য অযজ্ঞীয় মাংস, অনিবেদিত মাংস নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। অর্থাৎ মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে, যে-খাদ্যই গ্রহণ কর, শরীরের প্রয়োজনে কর এবং লোভ বর্জ্জন ক'রে কর। লোভ-লুব্ধ ব্যক্তি যদি নিরামিষও খায়, তবু ওটাকে নিষিদ্ধ খাদ্য ব'লেই মনে কর্ত্তে হবে। লোভী ব্যক্তি নিরামিষ আহার ক'রেও রুগ্নই হয়, স্বল্পায়ুই হয়।

আহার-শুদ্ধি ও উদ্দেশ্য-শুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শাস্ত্রে এবং সাধু-সজ্জনদের সদাচারের ভিতর দিয়ে আহার-শুদ্ধি সম্পর্কে যত বিধান ও নির্দ্দেশ রয়েছে, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য। কখনো কখনো আমরা লোভবশে সে সব নির্দ্দেশ অমান্য করি এবং নিজেদের তর্কবহুল যুক্তির আবরণে সেই দুরন্ত লোভকে ঢেকে রেখে নিজেদেরও প্রতারিত করি, অপর লোককেও প্রতারিত কত্তে চেষ্টা করি। আবার কখনো কখনো দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক ভাগ্য-বিবর্ত্তনের দিকে তাকিয়ে ঐ সব নির্দ্দেশের অন্যথা-বিধান আবশ্যক মনে করি। আহার-শুদ্ধি সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের শিথিলতা বিধানের জন্য যত জন যত আন্দোলন করে, তার কারণ এই দুইটীর একটী। মনে কর, ভারত আজ নিজের দেশ নিজে রক্ষা করার অধিকার পেয়েছে। কিন্তু হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে রক্ত বা শ্বেতবর্ণ এক আগন্তুক জাতি ভারত-বর্ষকে পদানত কর্ব্বার জন্য দুর্দ্ধর্ষ রণবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হ'ল। অথবা হঠাৎ পূর্ব্বদিক থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পীতকায় জাতি চূড়ান্ত শঠতায় ভর ক'রে বলদৃপ্ত বেয়োনেট হাতে ভারত আক্রমণ কর্ল্ল। সেদিন কি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কাঁচা মাথা রণক্ষেত্রে বলি দিয়ে ভারতের মর্য্যাদা, মান, স্বাতন্ত্র্য, আত্ম-গৌরব, শান্তি ও সম্পদ রক্ষার জন্য চেষ্টা কত্তে হবে না? সেদিন কি কোনো যুক্তি দিয়ে কারো চুপ ক'রে ব'সে থাকা সঙ্গত হবে? সেদিন যদি কেউ "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ব'লে চীৎকার ক'রে আকাশ বাতাস মথিত ক'রে দেয়, তা হ'লে সেই চীৎকারে কর্ণপাত করা কি ধর্ম্মজনক বা ধর্ম্মবর্দ্ধক হবে? তা হবে না। সেদিন ছিন্নমস্তার মত নিজ মুণ্ড নিজ হাতে ধ'রে রণ-তাণ্ডব নৃত্য করাই হবে পরম পুরুষকার, পরম ধর্ম্ম। তেমন বিকট মুহূর্ত্তে আতপান্ন আর কাঁচকলা সিদ্ধ একটা জাতির খাদ্য-তালিকা পূর্ণ কত্তে পারে না। সে দিন সামরিক প্রয়োজনে এবং সাময়িক প্রয়োজনে বহু চিরকালের নিরামিষাশীকে মাংসাহার কত্তে হ'তে পারে। বস্তুর শুদ্ধতা দিয়ে আহার-শুদ্ধির বিচার, সাধারণ বিচার।

সাধারণ ক্ষেত্রে এই বিচারই প্রামাণ্য। কিন্তু অসাধারণ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা দিয়ে আহার-শুদ্ধির বিচার হবে। তুমি যে বস্তুই আহার কর, তোমার আহারীয় গ্রহণের উদ্দেশ্য হওয়া চাই জগন্মঙ্গল। নিখিল জগতের মঙ্গলকে ধারণায় না আন্‌তে পার, অন্ততঃ নিজ দেশের মঙ্গলও তোমার আহারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সমগ্র দেশের মঙ্গল যদি কোনও জটিল সাম্প্রদায়িক অবস্থার দরুণ বা ধীশক্তির স্বল্পতার দরুণ ধারণায় আন্‌তে না পায়, তাহ'লে অন্ততঃ নিজ সমাজের মঙ্গলও তোমার আহারীয় নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কোনও মঙ্গল-উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে যদি আহারীয় গ্রহণ না কর, তাহ'লে তথাকথিত সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ ক'রেও তুমি অশুদ্ধ আহারই কচ্ছ।

নামজপে রুচিহীনের প্রার্থনা

একটী বালক বলিল,—কোনও নাম-জপে আমার রুচি নেই। আমি কি ভাবে প্রার্থনা করব?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যদি দীক্ষিত হ'য়ে থাক এবং দীক্ষাযোগে সৎপন্থা পেয়ে যাক, তাহ'লে মৌখিক নানাবিধ প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ করার চাইতে, মনে প্রাণে অবিরাম নাম জপ ক'রে যাওয়াই ভাল। তোমার যা চাইবার, তা না চাইতেই তুমি পাবে, যদি নিষ্ঠার সঙ্গে নাম জপ ক'রে যাও। আর, তোমার যে কি প্রয়োজন, তা কি তুমি ঠিক্ ঠিক্ জানো? তোমার প্রকৃত অভাব তুমি কতটুকু বোঝ? যিনি তোমার সকল প্রয়োজন জানেন, সকল অভাব বোঝেন, প্রয়োজন পূরণের দায় তাঁর উপরেই রেখে, অভাব-মোচনের দায়িত্ব তাঁর চরণেই অর্পণ ক'রে, তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে নাম জ'পে যাও। সব অপূর্ণতা থেকে রক্ষা পাবার এটী একটী সুপরীক্ষিত ও সাধুজন-সম্মত পন্থা।

বালক বলিল যে, তাহার দীক্ষা হয় নাই এবং দীক্ষা গ্রহণের জন্ম সে নিজেকে কখনো ইচ্ছুকও মনে করে নাই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তা হ'লে তুমি প্রার্থনায় ব'সে ভগবানের কাছে

অবিরাম আত্ম-নিবেদন কত্তে থাক্‌বে। বল্‌বে,—"হে ভগবান, তুমি আমাকে তোমার কাজের যোগ্য কর। তুমি আমাকে এমন ক'রে গ'ড়ে তোল, এমন ভাবে পরিচালন কর, যেন আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তোমার কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখি। আমি যেন তোমার কিঙ্কররূপে দেশ, সমাজ ও জাতির পরমকুশল সম্পাদন কত্তে পারি, আমি যেন বংশের কুলাঙ্গার না হই, জাতির শত্রু না হই, সমাজের ধ্বংসকারী না হই। তুমি আমাকে এমন ক'রে গ'ড়ে তোল, যাতে আমি জগতের সুখবর্দ্ধক, শান্তিবর্দ্ধক, আনন্দবর্দ্ধক হই, নিখিল জগৎ যখন তার বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জয়যাত্রায় বাহির্গত হবে, আমি যেন তখন অনাবশ্যক আবর্জ্জনারূপে পশ্চাতে প'ড়ে না থাকি আমি যেন তখন জগতের সকল মহীয়ান্ সেবকদের সাথে সমান তালে সমান পায়ে চল্‌তে পারি।" প্রার্থনার কালে ভগবানকে উদ্দেশ্য ক'রে বলতে থাকবে,—"হে মঙ্গলময় বিভো, আত্মাভিমান এবং সম্মানের লিপ্সাই মানুষকে বৃথা বিপথে পরিচালিত ক'রে উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট করে। সুতরাং তুমি এমন ভাবে আমাকে তোমার ক'রে নাও, যেন, আমি কখনো নিজেকে আমার জিনিষ ব'লে গর্ব্ব করবার সুযোগ না পাই, আমার মান আমার প্রতিপত্তি যেন তোমার মান ও তোমার প্রতিপত্তি হয়।"

নামজপকালীন মনোভঙ্গী

অপর একটী বালকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামজপের সময়ে দুটী কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখ্‌বে। একটী হচ্ছে এই যে তোমাকে প্রাণপণে বিশ্বাস কত্তে হবে যে, নাম অব্যর্থ-শক্তি-সম্পন্ন বস্তু, উচ্চারণ মাত্রেই নাম ফলপ্রদ, অগ্নি যেমন সর্ব্ববস্তু দহন করে, নামও তেমন সর্ব্বপাপ দহন করে, সলিল যেমন পিপাসা নিবারণ করে, নামও তেমন সকল লালসা নিবৃত্ত করে। বরং কোনো কোনো অবস্থায় অগ্নির দাহিকাশক্তি ক্রিয়া-শক্তিহীন হয়, রুগ্ন রসনায় জল

পিপাসা নিবারণে অসমর্থ হয়, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বক্ষেত্রে ভগবানের নাম তার অমোঘ শক্তি বিস্তার করে। এই বিষয়ে সুতীব্র বিশ্বাস অন্তরে পোষণ ক'রে নাম-জপে বস্‌বে। আর, নাম জপ করার কালে ভাবতে থাক্‌বে, মঙ্গলময় পরমেশ্বর যেন তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত, তুমি যতবার তাঁর পবিত্র নাম ধ'রে তাঁকে ডাক্‌ছ, ততবার তিনি তোমার প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, তোমার প্রত্যেকটী ডাকের সাথে সাথে শুভ্র স্নেহ কোমল আশীষ তোমার মস্তকে বর্ষণ কচ্ছেন। এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে নাম জপ কর্ব্বে। অনুভব কত্তে পার আর না পার, তিনি যে সত্যি অতি নিকটে ব'সে আছেন, এ ধারণা মন থেকে শিথিল হ'তে দিও না। তা হ'লেই অল্প সময়ে বেশী উন্নত হ'তে পার্ব্বে।

আজিকার শিশু—কালিকার নেতা

ইহার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবা নোয়াখালী জেলার কোনও পল্লীতে আর আসেন নাই। এ জেলার সরল-চিত্ত বালক ও শিক্ষকদের সহিত মিশিয়া আজ শ্রীশ্রীবাবা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছেন। আর শ্রীশ্রীবাবার পাদস্পর্শ করিয়া এবং অমৃত-মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলে কি যে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

যে ভাগ্যবান ভক্ত-প্রবরের একান্ত আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবা এ অঞ্চলে আসিলেন, তিনি রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবার চরণপ্রান্তে বসিয়া এই সম্পর্কে গভীর হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাদা অবস্থায় মাটী ছেনে সুন্দর সুন্দর প্রতিমা গড়া যায়। বালক অবস্থাতেই মানুষ-গড়া সুরু করতে হয়। এ সময়ে যাকে যেমন গঠন দেবে সে প্রায় ক্ষেত্রে আমৃত্যু তাই হবে। এজন্যই আমি ছেলেদের অত ভালবাসি তাই লোকে বলে আমি "ছেলেদের ঠাকুর।" আজকের ছেলে কাল্‌কে বাবা হবে, আজকের শিশু কাল্ সমাজের নেতা বা অভিভাবক হবে, তাই ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়্‌তে হ'লে বুড়োদের নিজ নজ ভাগ্যানুসরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে শুধু ছোটদের জন্যই খেটে যাওয়া উচিত।

ধারাবাহিক ও ব্যাপক চেষ্টার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু একা একটি লোকের চেষ্টায় বা

একজনের এক জীবনের চেষ্টায় এ কার্য্য সুষ্ঠুরূপে উদ্‌যাপিত হ'তে পারে না। এজন্যই এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান চাই, যে প্রতিষ্ঠান শত শত কর্ম্মীকে দিয়ে সমগ্র দেশের নিখিল বালক-বালিকা-মণ্ডলীর ভিতরে উচ্চ আদর্শের বাণী, উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা ছড়িয়ে যেতে থাকবে। একজন কর্ম্মী রুগ্ন হয়ে কর্ম্মে অক্ষম হ'লে তার স্থলে দুজন কর্ম্মীকে সেই কাজে লাগাবার মত ব্যবস্থা রাখতে হবে। একজন কর্ম্মীর দেহাবসান হ'লে তার পরিত্যক্ত পতাকা ধারণ ক'রে আবার এই কার্য্যেই দেহাবসানের সঙ্কল্প নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুজন কর্ম্মীকে লাগিয়ে দিতে হবে। এরূপ ধারাবাহিক ও পুরুষ পরম্পরাগত কর্ম্মায়োজন ব্যাপকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা চাই। একটী দেশ বা জাতির মঙ্গল কারো একার আয়ত্ত নয় বা কারো এক জীবনের কাজ নয়।

একার চেষ্টায় দেশোদ্ধার হইতে পারে না

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমাদের দেশে যতগুলি ভাল বা মন্দ জিনিষ এসেছে, তার ভিতরে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ এক মস্ত জিনিষ। গুণ-বর্ণনা কত্তে সুরু কর্‌লে এর ভালর দিকেও অন্ত নেই, মন্দের দিকেও অন্ত নেই। ভালর দিকে মোটামুটি হিসাব এই যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বাদ অনাদৃত অবজ্ঞাত ব্যক্তিদের ভিতরে কর্ম্মস্পৃহা, উন্নতিলিপ্সা, আত্মশক্তির বিকাশে প্রণোদনা প্রদান করেছে, নারীর অবরোধ ও অধীনতা হ্রাস করেছে, ইত্যাদি। মন্দর দিকে মোটামুটী হিসাবে এই যে, এর ফলে ব্যক্তিগত হিসাবে বহু বহু সৎকর্ম্মী সমাজ-সেবক ও দেশহিতৈষীর আবির্ভাব হচ্ছে,কিন্তু কেউ কারো সাথে মিলিত হ'য়ে দুইটা কি দশটা প্রতিভার সম্মিলনে কোনও একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টা কচ্ছে না, বা চেষ্টা কর্‌লেও তাতে সফল হচ্ছে না, আত্মাভিমান, ব্যক্তিগত মর্য্যাদার প্রশ্ন,ক্ষমতা-প্রিয়তা সব আয়োজনই পণ্ড করে দিচ্ছে। কারো যে একার চেষ্টায় এত বড় একটা দেশের উদ্ধার হবে না, হ'তে পারে না, কারো যে একার জীবনে সমাজের সকল অমঙ্গল দূরীভূত হতে পারে না, এই ধারণা একজনেরও যেন নেই। কিন্তু সেই ধারণাটাই আগে কর্ম্মি-সমাজের মনের

ভিতরে আনতে হবে, তবে পদ্ধতিবদ্ধ প্রয়াস এবং ধারাবাহিক কার্য্য পরিচালনা সম্ভব হবে। সমগ্র দেশের কুশলকে সম্মুখে রেখে আমার বা তোমার ব্যক্তিগত প্রতিভার জন্য বিশেষ সম্মাননা পাবার দাবীকে দাবিয়ে পিছনে বা পদতলে চেপে রাখবার শিক্ষা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত কোন বড় এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া অসম্ভব।

আমুকী

২রা আশ্বিন, ১৩৩৯

শ্রীশ্রীবাবা প্রাতঃকালীন সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এই সময়ে পাঁচগাঁ হাই স্কুলের কতিপয় ছাত্র সদুপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিল।

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ কর

নানা বিষয়ে সদুপদেশ দিয়া পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সদুপদেশ আর কত দিব, একটি উপদেশ পালন করলেই জীবনটাকে কাজের মত ক'রে গড়তে পারবে। সেই উপদেশটী হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ কর। পতঙ্গ যখন আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেয় তখন সে তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে না, তাই সে দগ্ধ হয়ে মরে। অবশ্য, ভবিষ্যৎ চিন্তার ক্ষমতাও তার নেই। তুমি মানুষ, ভবিষ্যৎ চিন্তার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তোমার পক্ষে ভবিষ্যৎ চিন্তা না ক'রে, কাজ করার মত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ আর কিছু নেই। যে কাজে যখন হাত দেবে একাজের পরিণাম কি, তা আগে চিন্তা ক'রে নেবে। ইংরাজীতে বলে, Look before you leap. লাফ দেবার আগে দেখে নিও যে, কোথায় গিয়ে পড়বে। পশু বর্ত্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত, ভবিষ্যৎ ভাববার তার শক্তি নেই। মানুষ ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ কর্ত্তে পারে। সেই শক্তি ভগবান তোমাদের দিয়েছেন। সেই শক্তির সদ্ব্যবহার কর।

জীবনের ভবিষ্যতের চিত্র আঁক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোন্ কাজের কি পরিণাম তা জেনে নির্দ্ধারণ কর্ব্বে যে কোন্ কাজ করণীয়, কোন্ কাজ অকরণীয়। কিন্তু তোমার

জীবনের সম্পর্কে একটা বিশাল ধারণা ও উদ্দীপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তোমার থাকা প্রয়োজন। আজ যে ভাবে আছ, চিরকাল সেভাবে তুমি থাকতে পার না, তোমার জীবনকে স্বার্থকতায় বিমণ্ডিত কত্তে হবে, মানুষের মত মানুষ হ'তে হবে, দেবতার স্বভাব অর্জ্জন কত্তে হবে, দেবজীবন লাভ কত্তে হবে। বর্ত্তমানে হয়ত তুমি সুখে আছ, টাকা-কড়ির অভাব নেই, দাস-দাসীর অভাব নেই, মান-সম্মানের অভাব নেই। কিন্তু এ'ত নিতান্ত অনিত্য সুখ। আজ যা আছে, কাল তা নাও থাকতে পারে। বর্ত্তমানকে নিয়েই সন্তোষ অবলম্বন ক'রো না, অনন্ত-কালের জন্য অনন্ত-সুখাধিকারী তোমাকে হ'তে হবে। তোমার চাই ভবিষ্যতের জন্য অনন্ত দেবজীবন। বর্ত্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে মূর্খেরা, অন্ধেরা বা জড়-পদার্থগুলি। শুধু বর্ত্তমানের সুখ-দুঃখ নিয়ে নিজেকে বিব্রত রাখতে পার না, তোমার বর্ত্তমানে যত শ্রম আর যত সাধনা সব তোমার ভবিষ্যতেরই জন্য। ভবিষ্যৎকে গড়বার জন্যই বর্ত্তমানকে ব্যবহার কর, ভবিষ্যৎকে মহৎ, উজ্জ্বল ও সাফল্যবান করবার জন্যই বর্ত্তমানকে কাজে আন।

দেব-জীবন কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি দেব-জীবনের কথা বল্‌লাম ত ? তাতে কি বুঝ্‌ছ ? ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি অনেক দেবতা অনেক কুকার্য্য করেছেন ব'লে পুরাণাদিতে দেখতে পাই, যে সব কুকার্য্য মানুষে করলে তার জেল হ'ত, দ্বীপান্তর হ'ত। তাদের স্বভাবকে দেব-স্বভাব বল্‌ছি ? দেবতারা দলবদ্ধ হয়ে দৈত্যদিগকে প্রাপ্য অমৃতের অংশ থেকে বঞ্চিত ক'রে কুকীর্ত্তি রেখেছেন। আমি তাদের জীবনকে দেব-জীবন বলিনি। কোনো মহর্ষি তপস্যা ক'রে ভগবানকে লাভ কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন দেখলে অনেক দেবতার ভয় হ'ত, কি জানি তাঁর পদটুকু কেড়ে নেবার জন্যই এই তপস্যা হচ্ছে কিনা। তখন ইন্দ্র পাঠাতেন প্রলোভনময়ী নারীদিগকে সেই তপস্বীর তপস্যা-ভঙ্গ কত্তে। এঁদের চরিত্রকে দেব-চরিত্র বলিনি। সাহসী, বীর্য্যবান, পুরুষকারপরায়ণ দৈত্যদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যাঁরা কখনো ছলনা, কখনো কপটতা, কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কচ্ছেন, তাঁদের কাণ্ডকারখানাকে আমি দেবাচার বল্‌তে চাইনি। দিব্ ধাতু থেকে দেব শব্দের

উৎপত্তি হয়েছে। দিব্ ধাতুর মানে দীপ্তি পাওয়া, নিজের তেজে নিজে বিকশিত হওয়া, স্বভাব-সঞ্জাত জ্যোতির আবেষ্টনে নিজেকে বেষ্টিত ক'রে নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করা। যাঁর চরিত্রের জ্যোতি অপরের প্রচার প্রসার ব্যতীত আপনা-আপনি নানা দিগদেশে ছড়িয়ে পড়ে, কোনো যুক্তি-বিচার-বিতর্কের প্রতীক্ষা না ক'রে যাঁর জীবনের আচরণ লক্ষ কোটি মানবের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাঁর চরিত্র -দেব-চরিত্র, তাঁর জীবন দেব-জীবন। তোমাদের লক্ষ্য তেমন জীবনের প্রতি হোক, এই আমার বক্তব্য।

আদর্শের পুজা

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রশ্ন যদি কর যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, শনি প্রভৃতি ছোট-বড় দেবতা সমূহের কি তাহলে পুজা করা উচিত নয়? এর জবাব আমি কিছু দিতে পারি না। কোন দেবতার চরিত্রে যদি তুমি তোমার জীবনের পরিপুর্ণ আদর্শটুকুকে পেয়ে থাক, তবেই তাঁর পুজা কর। যাঁর চরিতাখ্যানে তোমার জীবনের পুর্ণ আদর্শ পরিস্ফুট হয়নি, তাঁকে পুজা ক'রেত তোমার কোনো লাভ নেই। দেবতার পুজা করা না করা খুব বড় কথা নয়। আদর্শের পুজা করাই বড় কথা। স্থির কর তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ কি? খুঁজে দেখ সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ কোথায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে? তারপরে সেই আদর্শকে নিজের জীবনের ভিতরে রূপবন্ত করার জন্য যত্নশীল হও, ব্রতী হও। অনেকের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সেই ক্ষমাশীল, অকুতোভয়, নির্লোভ মহাপুরুষের চরিত্রের এই সব বিশিষ্টতা গুলিকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না ক'রে তারা তাঁর কল্পিত প্রতিমুর্ত্তির চরণে তুলসী চন্দন দেয়। এতেই কি আদর্শের পুজা হয়? অনেকের আদর্শ রামচন্দ্র। কিন্তু সেই সত্যশীল, বীর্য্যবান ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের চরিত্রের এই সব বিশিষ্টতা গুলিকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার চেষ্টা না ক'রে তারা তাঁর কল্পিত প্রতিমুর্ত্তির চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। এতেই কি আদর্শের পুজা হয়? অনেকের আদর্শ সদাশিব মহাদেব। অথচ সেই স্বল্পতুষ্ট সদানন্দ নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন নির্লিপ্ত মহাযোগী মহাপুরুষের এই সব বিশিষ্টতাগুলিকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না ক'রে তাঁর কল্পিত প্রতিমুর্ত্তির চরণে বিল্বদল ঢালে।

এতেই কি আদর্শের পূজা হয় ? "আদর্শের পূজা" মানে "আদর্শকে নিজ জীবনে রূপবন্ত করার চেষ্টা" সেই কথা মনে রেখে যা প্রয়োজন করো।

দলবদ্ধভাবে দেব-পূজাদি সম্পর্কে

ছাত্রদের মধ্যে একজন একটি প্রশ্ন করিল। শ্রীশ্রীবাবা তাহার জবাবে বলিলেন, —বিদ্যালয়ে দলবদ্ধভাবে সরস্বতী পূজা কিম্বা বারোয়ারীতলায় দলবদ্ধ-ভাবে সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের একটা ভাল দিকও আছে, একটা মন্দ দিকও আছে। এসব অনুষ্ঠানে সামাজিক দিক থেকে লাভ এই যে, দশজনে মিলে-মিশে কাজ করার একটা কুশলতা, একটা অভ্যাস, একটা রুচি জন্মে। ব্যক্তিগতভাবে লাভ এই যে, যে সব লোকের ধর্ম্মকর্ম্মে কোনো মতি নেই, দশজনের সঙ্গে হুজুগে মেতে দুদিনের জন্য হ'লেও তার ভিতরে একটা ধর্ম্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অনেকক্ষেত্রে যে জাতিভেদের গোঁড়ামীর মূল এসব উপলক্ষ্য ক'রে ক্রমশঃ শিথিল হচ্ছে, সেটা সামাজিক হিসাবেও ভাল, ব্যক্তিগতভাবেও অনেক স্থলে লাভই বল্‌তে হবে। কারণ রেষ্টুরেণ্টে খাওয়া উপলক্ষ ক'রে, কুস্থানে গমন উপলক্ষ ক'রে, মদ্যপানের মজলিস উপলক্ষ ক'রে, নাচের আসরে যোগ দেওয়া উপলক্ষ ক'রে জাতিভেদ দূর না হয়ে যদি কোনো ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষ ক'রে জাতিভেদের কঠিন নিগড় শিথিল হয়, তবে সেটাকে লাভই বল্‌তে হবে। কিন্তু ক্ষতির দিক হচ্ছে এই যে, আজ মিলিত হচ্ছ সবাই মা-সরস্বতীকে উপলক্ষ ক'রে, কাল মিলিত হচ্ছ মা-দশভুজাকে উপলক্ষ ক'রে, পরশু মিলিত হচ্ছ তোমরা গজাননকে উপলক্ষ ক'রে, তরশু মিলিত হচ্ছ তোমরা পবনাত্মজকে উপলক্ষ ক'রে। এক একদিন এক এক জনকে উপলক্ষ ক'রে মিলিত হচ্ছ। এতে লক্ষ্যের প্রতি স্থিরতা, লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠা, লক্ষ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সৃষ্টির বাধা হবেই হবে। যুক্তির দিক্ দিয়ে তোমরা একেশ্বরবাদী, কিন্তু অনুষ্ঠানের দিক্ দিয়ে বহু-ঈশ্বর-বাদের সমর্থন কচ্ছ। এতে তোমাদের আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা মলিন হচ্ছে। এটা সামাজিক দিক্ দিয়েও ক্ষতি, আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়েও ক্ষতি।

দলবদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান কিরূপ হওয়া উচিত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দলবদ্ধ ভাবে যে সব ধর্ম্মানুষ্ঠান হবে, তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। যাকে উপলক্ষ করে অথবা যে ঘটনা প্রসঙ্গেই এ অনুষ্ঠান হোক্, অনুষ্ঠানের পরিণাম ফল হওয়া দরকার প্রত্যেক যোগদানকারীর আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠার বর্দ্ধন। আর, আমোদ-প্রমোদের হট্টগোলে যোগদানকারীরা না লঘুচিত্ত হ'য়ে পড়ে, তার জন্য চাই সুতীব্র দৃষ্টি। দলবদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রায় সকল মতের সকল পথের লোক নিজের ইষ্টনিষ্ঠাবৰ্দ্ধক হিতকর উপাদান আহরণ ক'রে নিতে পারেন। 'প্রায়' শব্দটা বল্লাম এই জন্য যে, একদল লোক জগতে সকল সময়েই থাক্‌বে, যাঁরা নিজেদের অন্ধত্বকেই জ্ঞানবত্তা ব'লে জ্ঞান করার দরুণ, অথবা নিজেদের সঙ্কীর্ণচিত্ত পরমতসহিষ্ণুতাকেই ধর্ম্ম-বোধের চূড়ান্ত ব'লে ধারণা করার দরুণ, সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিবর্জ্জিত অনুষ্ঠানের ভিতরেও ভ্রম, ত্রুটী, গলদ আবিষ্কারের জন্য অধ্যবসায়ী হবে।

দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি

নোয়াখালী সহরের জনৈক মোক্তার কি কারণে পল্লী অঞ্চলে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীবের এত দুঃখের সার্থকতা কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জানেন না বুঝি, দুঃখ যে জীবনের স্পর্শমণি! কষ্টের ভিতর দিয়ে যা আসে, তা কত মধুর হয়। পুপুন্‌কী আশ্রমের ছেলেরা অনেকটা দুর থেকে ঘাড়ে ক'রে জল বহন ক'রে চারা গাছের গোড়ায় দেয়, তরকারীগুলি মিষ্টি হয়। দুঃখ হচ্ছে জীবনের কষ্টি-পাষাণ। দুঃখের গায়ে ঘষা খেয়ে মানুষের মত মানুষ প্রমাণের চিহ্ন এঁকে রেখে যায় যে, জীবন তার খাঁটি সোনার মত দুর্ল্লভ। ভাগ্যবান্ লোকের জীবনকে পরীক্ষা করে সম্পদ ও সমৃদ্ধি, মহামানবের জীবনকে পরীক্ষা করে দুঃখ, কষ্ট ও নির্য্যাতন। ভগবানের কত প্রিয় সন্তান

জগতে জন্মেছেন, যাঁরা নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, অনবদ্য-সুন্দর-চরিত্র, কিন্তু এমন একটী সন্তানও তাঁর জন্মগ্রহণ করেন নি, দুঃখের ভিতর দিয়ে যিনি জীবনকে মহৎ করেন নি। ভাস্কর যেমন তার সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রপাতি নিয়ে কদাকার প্রস্তর খণ্ডকে বারংবার আঘাত ক'রে ক'রে ক্রমশঃ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দান করে, ভগবান্ তেম্‌নি দুঃখ, কষ্ট, দৈন্য ও নির্য্যাতন রূপ হাতুড়ি, বাটাল, কোরানি ও বাছিলা দিয়ে অগঠিত সামান্য মানবকে সুগঠিত মহামানবে পরিণত করেন। মণি-কার যেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র আর নির্ম্মম উকা দিয়ে আঘাত ক'রে আর ঘর্ষণ ক'রে ক'রে মণিকে তার সুশোভন আকৃতি দেয়, ভগবান্ তেমন এই পৃথিবীতে তাঁর সন্তানকে গ'ড়ে নেবার জন্য দুঃখ দেন।

দুঃখ-সহিষ্ণুতার দার্শনিকতা সৃষ্টি আবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই সময়ে আমাদের প্রয়োজন দুঃখ-সহিষ্ণুতার দার্শনিকতা সৃষ্টির। ভগবান্ যখন আঘাত দিচ্ছেন, হাসি মুখে এই আঘাত সহ্য ক'রে নিয়ে তাঁর মনের মত যেন গ'ড়ে উঠ্‌তে পারি। মনকে দুর্ব্বল ক'রে নয়, সবল দৃঢ়তায় সকল বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতরে মেরুদণ্ড শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে থেকেই আমাদের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরাভিপ্রায় পরিপূর্ণ সৌষ্ঠবে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠ্‌বে। দুঃখ দেখে ভয় পাবার মনোবৃত্তি বর্জ্জন ক'রে দুঃখ দেখে সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়ে তাকে জয় করার মনোবৃত্তির আজ অনুশীলন প্রয়োজন।

বৎসরের প্রত্যেকটী দিন শুভদিন

মোক্তার বাবু নিজের জন্ম-দিন সম্পর্কে এক প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বৎসরের বারটা মাসই মহাপুরুষেরা, সিদ্ধ সাধকেরা দেবকল্প ব্যক্তিরা, ত্রিলোকপূজিত ঈশ্বর-কোটিগণ জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈশাখ মাস খুব ভাল আর চৈত্র মাস মন্দ, এধারণা গ্রাম্যলোকের পক্ষে সাজে। কিন্তু বৈশাখে যেমন শ্রীবুদ্ধ জন্মেছেন, চৈত্রে তেমন শ্রীরামচন্দ্র জন্মেছেন।

মহাপুরুষ হিসাবে এদুজনের মধ্যে কে কার চেয়ে ছোট? দুজনকেই বিষ্ণুর অবতার ব'লে পূজা করা হয়। ভাদ্র মাস শুভকর্ম্মের পক্ষে নাকি প্রশস্ত নয়, অথচ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসটীতেই নরবপু নিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন। এঁকে লোকে শুধু অবতার ব'লেই সন্তুষ্ট হয় না, সব অবতারের মূল বিগ্রহ ব'লে পূজা করে। পৌষ মাস নাকি শুভ-কর্ম্মের পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয়, অথচ যীশুখ্রীষ্ট ঠিক এই মাস্‌টীতেই জন্মগ্রহণ কর্লেন। এঁকে লোকে ভগবানের সাক্ষাৎ ঔরসজাত পুত্র ব'লে ভজনা করে। একটু খুঁজলে দেখা যাবে, এমন মাস নেই, যে মাসে মহাপুরুষেরা না জন্মেছেন, এমন বার নেই, যে বারে মহাপুরুষেরা না জন্মেছেন, এমন তিথি নেই, নক্ষত্র নেই, রাশি নেই, যে তিথিতে, যে নক্ষত্রে, যে রাশিতে একজন না একজন লোকপাবন মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। সুতরাং বৎসরের প্রত্যেকটা মাসকে, মাসের প্রত্যেকটা বারকে, পক্ষের প্রত্যেকটা তিথিকে কোনও না কোনও মহা-পুরুষের জন্ম-দিনের স্মৃতিবাহক জেনে দিবসটীকে পবিত্র জ্ঞান করা উচিত। যে দিনে যে শিশু জন্মগ্রহণ করুক, সে যে শুভদিনেই জন্মেছে, এরূপ বিশ্বাস করা উচিত। যে তারিখেই যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হোক্, সে যে শুভদিনেই দেহত্যাগ করেছে, এরূপ বিশ্বাস করা উচিত। যে দিবসই যে ব্যক্তি বিবাহ করুক, দীক্ষা নিক্, পিতৃগণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যানুষ্ঠান করুক, তীর্থগমন, বীজ-রোপণ, নৌকারোহণ, দত্তকগ্রহণ, ধ্যানানুশীলন বা পুরশ্চরণ করুক, পাঁজি-পুথি সে দেখুক আর না দেখুক, বিশ্বাস করা উচিত যে সেই দিনটীই শুভদিন।

পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও কন্যা

মোক্তার বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে, হিন্দুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনে মেয়েকে কেন পিতার সম্পত্তিতে অংশ প্রদান করা হয় নাই এবং মেয়েকে এভাবে বঞ্চিত করা ন্যায্য কাজ কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে মেয়েকে বঞ্চিত করা ন্যায্য কাজ কিনা, তার কোনও শাশ্বত নির্দ্ধারণ সম্ভব নয়। এতকাল ধ'রে

যা ন্যায্য ব'লে মনে করা হয়েছে, বিশ বছর পরেই হয়ত তা' অন্যায্য ব'লে বিবেচিত হবে। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখ্‌তে হবে যে, এতকাল ধ'রে কন্যাকে যে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার পশ্চাতের ভূমিকাটুকু কি। Heredityর (পৈত্রিকতার) দুই রকম Philosophy (মতবাদ) হ'তে পারে। প্রথম হচ্ছে এই যে, পিতা তার পুত্রের জন্মের জন্যও যতটা দায়ী, তার কন্যার জন্মের জন্যও ততটা দায়ী। সুতরাং জন্মের পরে পুত্রও পিতার সম্পত্তিতে যতখানি অধিকার পেতে পারে, কন্যাও ততটা পেতে পারে। দ্বিতীয় মতবাদ হচ্ছে এই যে, Family tradition (বংশের বিশিষ্টতা) পুত্রেরাই রক্ষা করে, মেয়েরা বিবাহমাত্র ভিন্ন গোত্র ধারণ করে, ভিন্ন কুলের পরিচয় গ্রহণ করে, পৈত্রিক বংশের মৃত্যু প্রভৃতি অশৌচ পর্য্যন্ত স্বীকার করেনা, ভিন্ন বংশজাত বরের ঔরসোৎপন্ন সন্তানদের ভিতরে সেই ভিন্ন বংশেরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্রামিত ক'রে দেবার জন্য ভিন্ন বংশের কুলপ্রথা, কুলক্রিয়া, কুলচার নিজের ব'লে অঙ্গীকার ক'রে নেয়, সুতরাং সুপাত্রে সদ্‌ভাবে বিবাহানুষ্ঠানের অতিরিক্ত দাবী তার আর কিছু থাক্‌তে পারে না। বাস্তবিকও কথাটা তাই। বংশগত উৎকর্ষ যে কন্যার প্রবাহে বর্দ্ধিত হয় না, পুত্রের প্রবাহেই বর্দ্ধিত হয়, নাতিরা যে মাতামহের বংশ-সংস্কার নেয় না, পিতামহের বংশ-সংস্কারই নেয়, সন্তানেরা নিজ নিজ প্রধান জন্মজাতসংস্কারগুলি যে মাতৃরজ অপেক্ষা পিতৃবীর্য্য থেকেই অধিক পায়, একথাটা সৌজাত্য-তত্ত্ব-বিদ্বানেরা এক প্রকার স্বীকারই ক'রে নিচ্ছেন। প্রথমোক্ত মতবাদ যে সমাজকে পরিচালিত কর্ব্বে, সে সমাজে কন্যাকেও পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী করা ন্যায্য হবে। দ্বিতীয়োক্ত মতবাদ যে সমাজকে পরিচালিত কর্ব্বে, সে সমাজে পুত্রকেই পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী রাখা কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচিত হবে। এতকাল যে হিন্দু সমাজে পুত্রকেই সম্পত্তির অধিকারী করা হয়েছে, বংশগত উৎকর্ষকে প্রধান করাই তার উদ্দেশ্য। বংশোৎকর্ষ নাশের ভয়েই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও দুশ্চরিত্র পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছে

পুত্র-কন্যার আসল সম্পত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভবিষ্যতে মেয়েরা শ্বশুরগৃহেও সম্পত্তির অধিকারিণী হবে, পিতৃকুলের সম্পত্তিরও তারা-অংশ পাবে। সে দিন হয়ত দূরে নয়। এসব সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় হওয়া দরকার, তার সবই সমগ্র দেশব্যাপী অর্থ-নৈতিক অবস্থার চাপে আপনা আপনি হ'য়ে যাবে। অতীতে কি ব্যবস্থা ছিল, আর কোন্ ব্যবস্থা ছিল না, সেই বিচারের বিশেষ অবসর থাকবে না, কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া না পাওয়া অপেক্ষাও একটা বড় কথা আছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার কাছ থেকে যে সহজাত সম্পত্তি নিজ শরীরের নিজ মস্তিষ্কের নিজ মনের ভিতরে সংস্কার রূপে পুত্র বা কন্যারা নিয়ে আসে, তাকে যাতে যৌবনোন্মেষের সাথে সাথেই আত্মহিতকর ও সমাজ-হিতকর রূপে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ প্রদান করা যায়, এমন শিক্ষা, এমন প্রতিবেশ, এমন অনুশীলনের প্রত্যক্ষ সুযোগ লাভ করাই হচ্ছে পুত্রকন্যার আসল সম্পত্তি। এই সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে শুধু ধানজমি আর বাড়ীঘরের ভাগাভাগি কত্তে পার্ল্লেই যে খুব একটা মস্ত কাজ হয়ে গেল, একথা মনে করা উচিত নয়। সমাজ এবং রাষ্ট্র-শাসনের ভিতরে এমন ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন, যাতে যতগুলি ছেলে বা মেয়ে যত বংশে যত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করুক, তাদের প্রত্যেকের সহজাত প্রতিভার সুষ্ঠুতম প্রস্ফুটন যেন সহজেই হ'তে পারে। এর ফলে যদি এরা ধানজমি আর ঘরদুয়ারের ভাগ কিছু কম পায়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। পিতা ও মাতার কাছ থেকে গোপনে যে সঞ্চিত সম্পত্তি এদের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের ভিতরে এসেছে, তাই হচ্ছে এদের আসল উত্তরাধিকার। কি পুত্র, কি কন্যা, আগে তাদের এই উত্তরাধিকার সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত হওয়া আবশ্যক।

রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা শিবপুর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন।

শিবপুর (নোয়াখালী)
৩রা আশ্বিন, ১৩৩৯

ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে আজ কি আনন্দ কোলাহল! তাঁহার বৃদ্ধ পিতা আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। এই পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই ভারত-বিখ্যাত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীস্বামী পরমহংস ভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রিত। বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ মহাত্মগণের মধ্যে বাবা সন্তদাসজী মহারাজ, মহাত্মা রাম ঠাকুর মহাশয়, পরমহংস নিগমানন্দ সরস্বতী এবং ভোলাগিরি মহারাজের শিষ্যগণের আমরা শ্রীশ্রীবাবার প্রতি সর্ব্বদাই গভীর ভক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি। অথচ উক্ত মহাত্মাগণের সহিত শ্রীশ্রীবাবার কখনও চাক্ষুষ দেখা হয় নাই। গতকল্য শ্রীশ্রীবাবা শিবপুর আসিয়া পৌছিবামাত্র শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজের ভক্তগণ তাঁহাকে আরতি করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা কত নিষেধ করিয়াছেন, কত প্রকারে যে এই পূজা-গ্রহণ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু ইহারা শোনেন নাই। ইহাদের সকলের আগ্রহাতিশয্যে ভোলাগিরি মহারাজের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে শ্রীশ্রীবাবাকে আসন পরিগ্রহণ এবং আরতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

উর্ম্মিলা দেবী

শিবপুর-বাসীদের আজ আর আনন্দের অবধি নাই। প্রত্যেকেই যেন অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র দাদার স্ত্রী শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী শ্রীশ্রীবাবার নিকট দীক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষায় আজ পূর্ণ দুই বৎসর ধরিয়া স্বামিসহ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিতেছেন। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—"বিকার হেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ,—বিকারের হেতু সত্ত্বেও যাহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না তাহারাই প্রকৃত ধীর।" ঘরে ঘরে কবে যে ভগ্নী উর্ম্মিলা দেবীর ন্যায় ধর্ম্মার্থে যৌবন-সুখত্যাগিনী ধর্ম্মশীলাদের দর্শন করিব, সেই আশায় বসিয়া

আছি। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থ মুদ্রণের কালে এই মহীয়সী মহিলা পার্থিব দেহে বিরাজিতা নাই।

সাধক ও পরচর্চ্চা

শিবপুরে শ্রীশ্রীবাবা বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন।

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে পথিক পথ চল্‌তে ইচ্ছুক, সে অপরের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না। অপরের দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে তার নিজের পথের গতি ক'মে যায় বা থেমে যায়। এজন্যই প্রকৃত সাধকেরা পরচর্চ্চা পরনিন্দা একেবারে বর্জ্জন করেন। অমুকের পথ ভুল কি শুদ্ধ, সে কথা অমুকেই কালক্রমে বুঝবে বা ভগবৎকৃপায় কোনও মহাপুরুষ তাকে ব'লে দেবেন। তার পথ যে ভুল, একথা তাকে বল্‌বার জন্য আমার যদি আবার তার কাছে যেতে হয়, তা'হ'লে ততক্ষণ ত' আমার নিজের পথের গতি বন্ধ থাকে। সাধক কি তার লক্ষ্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন ছেড়ে অন্য কাজে মন দিতে পারেন? মন দিতে গেলে ত' সর্ব্বনাশ। এই জন্যই এই সময়ে অন্ততঃ পরের মঙ্গল-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিজের মঙ্গলই চিন্তা করা উচিত। কারণ, পরনিন্দা ক'রে আর পরচর্চ্চা ক'রে আমরা পরের মঙ্গল কিছুই কত্তে পারি না, শুধু নিজের অমঙ্গলই করি।

নিন্দাতে বিশ্বাস ও আত্মসংশোধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমরা অনেক সময়ে অন্যকে মন্দ ব'লে ভাবি, শুধু অপরের মুখে তার নিন্দা শুনে। অন্য কেউ মন্দও হ'তে পারে, ভালও হ'তে পারে। কিন্তু আমি নিজে যদি মন্দ না হই, তাহ'লে অপরকে মন্দ ব'লে বিশ্বাস কত্তে আমার প্রবৃত্তি হবে না। যাঁরা নিজেরা ভাল, তাঁরা জগতের সকলকে ভাল ব'লেই জ্ঞান করেন। অপরকে যখন মন্দ ব'লে ভাব্‌তে আমার রুচি হয়, তখনই বুঝতে হবে, আমার নিজের ভিতরে মন্দ এসে বাসা বেঁধেছে। সুতরাং আগে আমার আত্ম-সংশোধনেই দৃষ্টি

দেওয়া দরকার। আর যারা আমার নিকটে পরনিন্দা কত্তে আসে, তাদের বন্ধু ব'লে জ্ঞান না ক'রে নিকৃষ্টতম শত্রু ব'লে জ্ঞান করা উচিত।

মহাপুরুষের স্বভাব

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহাপুরুষদের চরিত্র সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও অতলস্পর্শ, আকাশের ন্যায় উদার ও সর্ব্বালিঙ্গনকারী। জগতের সকলের প্রতি তাঁদের সমভাব, সকলের প্রতি তাঁদের সমস্নেহ। "আমার সম্প্রদায়, তোমার সম্প্রদায়," এ সব কথা সাধারণ পুরুষদের মুখেই শোভা পায়। মহাপুরুষেরা সকল মতের সকল পথের লোককে নিজ-জন ব'লে জ্ঞান করেন, একজনকেও দূর বা পর মনে করেন না। হিন্দু কিম্বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিম্বা খ্রীষ্টিয়ান্, শাক্ত কিম্বা শৈব, বৈষ্ণব কিম্বা ব্রাহ্ম, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী, শ্বেতকায় বা কৃষ্ণাঙ্গ, আর্য্য কিম্বা অনার্য্য, ইংরেজ কিম্বা নিগ্রো ব'লে কাউকে সমাদর বা কাউকে অনাদর করেন না। কারণ, সব সম্প্রদায়ের যিনি মূল, তাঁকে তিনি লাভ করেছেন। সকল গলির বাতাস গিয়ে একই আকাশে মিশে। যতক্ষণ গলিতে গলিতে আটক থাকে, ততক্ষণ এক এক গলির বাতাসে এক রকম গন্ধ থাকে। গলির লোকেরা ভাবে, এই গন্ধ যে বাতাসে নেই, সেই বাতাসটা অশুদ্ধ। মালিটোলার গলির বাতাসে ফুলের গন্ধ থাকে, মাছুয়াটোলার গলির বাতাসে মাছের গন্ধ থাকে, ধোপাটুলীর গলির বাতাসে সাবানের গন্ধ থাকে, শুঁড়িটোলার গলির বাতাসে মদের গন্ধ থাকে, বিশ্বনাথের গলির বাতাসে বিল্বপত্রের গন্ধ থাকে, জগন্নাথের গলির বাতাসে তুলসী-চন্দনের গন্ধ থাকে। প্রত্যেক গলির লোকেরাই ভাবে,—"আমার গলির বাতাসই খাঁটি বাতাস, আর সব গলির বায়ু অশুদ্ধ, অপবিত্র, অহিতকর।" কিন্তু সব গলির বাতাস গিয়ে অনন্ত আকাশে মিশেছে। আকাশচারী মহাজন আকাশে ব'সে সব গলির বাতাসের আস্বাদন পান এবং সব গলির বাতাসের সঙ্গেই চিরপ্রবহমান অনন্ত বায়ু-প্রবাহের যোগ আছে দেখে সকলের প্রতিই সমান সন্তুষ্ট হন। মহাপুরুষদের অবস্থা সেইরূপ। এক এক নদীর জলের রং এক এক প্রকার।

পদ্মা নদীর জল ধূসর, মেঘনা নদীর জল কালো, ধলেশ্বরীর জল শাদা, শীতললক্ষার জল কাকচক্ষুবৎ স্বচ্ছ। যে যে-নদীর পারে আছে, সে ভাবে, সেই নদীর জলই জগতে একমাত্র তৃষ্ণাহারক পানীয়, আর সব নদীর জল অপেয়, অগ্রাহ্য, বাজে। কিন্তু সমুদ্রে গিয়ে সকল নদীই মিলিত হয়েছে। যে মহাজন জ্ঞানের যানে সমুদ্রে বিচরণ কচ্ছেন, আর প্রেম-তরঙ্গে দোলা খাচ্ছেন, তিনি এক সমুদ্রে অবস্থান ক'রে সকল নদীর রঙ্গ দেখেন, আর, সব নদীই যে সমুদ্রের সাথে এসে কোনো না কোনো প্রকারে নিজের যোগ স্থাপন করেছে, তা' দেখে আনন্দে আত্মহারা হন এবং সকল নদীর প্রতি সমান তারিফ দেন। মহাপুরুষদের মনের অবস্থা এই রকম। কারো প্রতি তাঁরা বিরূপ নন, সকলের প্রতি তাঁদের সমান ভাব।

জগতের সকল পূজা এক ভগবানেরই পূজা

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— যে যে-ভাবেই ভজনা করুক, সকলে যে এক ভগবানেরই অর্চ্চনা কচ্ছে, একথা ভাবতে গেলে আর ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ থাকে না, থাকতে পারে না। আমি যখন ভগবানকে ভজনা করি, তখন মনে মনে স্থির ক'রে রাখি যে, তুমি যখন আমার ঢংএ পূজা কর না, তখন নিশ্চয়ই তুমি শয়তানের অর্চ্চনা কচ্ছ। এই ভাব থেকেই যত দ্বেষের, যত কলহের সৃষ্টি হয়। একই ভগবান এক এক রকমে এক এক জায়গায় পূজিত হচ্ছেন, একজন ছাড়া নিখিল ভুবনে দুইজনের পূজা নেই। একই ব্যক্তি সকাল বেলা পাড়ার গরীব রোগীদের দুঃখে কাতর হ'য়ে বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিচ্ছেন। রোগীরা তার নাম দেয় 'ডাক্তারবাবু', তাঁর ধ্যান মন্ত্র রচনা করে,—"শিশি-কর্ক-হস্তং পরদুঃখ-বিগলিত চিত্তং" ইত্যাদি। সেই একই ব্যক্তি যখন উকিলবাবু সেজে কোর্টে যান মামলা চালাতে, তখন মক্কেলরা তাঁর নাম দেয় 'উকিলবাবু' এবং তাঁর ধ্যান-মন্ত্র রচনা করে,—"চোগা চাপকান-পরিহিতং শিরসা শ্যামলা ধৃতং কোর্টে বিপন্ন-রক্ষকং" ইত্যাদি। সেই একই ভদ্রলোক যখন অপরাহ্নে গৃহে ফিরে আসেন এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করেন, তখন তারা তাঁর নাম দেয় "বাবা" এবং তাঁর ধ্যান-মন্ত্র রচনা করে,—"সন্তান-স্নেহ-পূর্ণং লজঞ্জুস-করং সুকোমল-ক্রোড়ং"

ইত্যাদি। ভদ্রলোক যখন সন্ধ্যার পরে বস্তির ছেলেদের ডেকে এনে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াতে থাকেন, ছাত্রেরা তখন তাঁর নাম দেয় 'মাষ্টারমশাই' ব'লে এবং তখন তাঁর ধ্যান-মন্ত্র রচিত হয়,—"রক্তনেত্রং বজ্রবক্ত্রং করধৃতবেত্রং" ইত্যাদি। আবার তিনিই যখন গভীর রজনীতে একাকী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অবস্থান করেন, তখন তাঁর নাম হয়"স্বামী" এবং ধ্যান-মন্ত্র রচিত হয়,—"চিরপ্রিয়তমং সন্নিকটতমং হৃদয়-হৃদয়ং প্রাণবল্লভং" ইত্যাদি। এই একই ব্যক্তিকে যেমন দশজন ব্যক্তি দশ রকমের সংস্রবে এসে দশ রকমের নাম দেয়, দশ রকমের বর্ণনা করে, ভগবান সম্পর্কেও সেই কথাই সত্য। যে যেমন অবস্থায় আছে, সে সেই অবস্থার অনুযায়ী ভগবানের নামকরণ এবং স্বরূপাবধারণ করে এবং একনিষ্ঠ প্রযত্নে তাঁর সঙ্গ কত্তে কত্তে ক্রমশঃ উপলব্ধি কত্তে পারে যে, সব রূপ তাঁরই রূপ, সব নাম তাঁরই নাম, সব পূজা তাঁরই পূজা। রোগী ক্ষণকালের জন্য চিকিৎসকের সঙ্গ পায়, তার জন্য বুঝতে পারে না যে, যিনি একস্থানে চিকিৎসক, তিনি আর একস্থানে উকিল। মক্কেল ক্ষণকালের জন্য উকিলের সঙ্গ করে, তারই জন্য বুঝতে পারে না যে, যিনি এক স্থানে উকিল, তিনি আর একস্থানে বাবা। পুত্র-কন্যা ক্ষণকালের জন্য পিতার সঙ্গ করে, তারই জন্য বুঝতে পারে না যে, যিনি একস্থানে পিতা তিনিই আর একস্থানে মাষ্টার। ছাত্রেরা ক্ষণকালের জন্য মাষ্টার মশায়ের সঙ্গ করে, এজন্য বুঝতে পারে না যে, যিনি একস্থানে মাষ্টার, তিনি অন্য স্থানে স্বামী। পত্নী ক্ষণকালের জন্য স্বামীর সঙ্গ করে, এজন্য বুঝতে পারে না যে, যিনি এক স্থানে স্বামী, তিনি আবার আর একস্থানে ডাক্তার।

চাই নিত্যসঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চাই নিত্যসঙ্গ। যে যেরূপে তাঁকে চেন, যে যে নামে তাঁকে জান, সেই রূপে, সেই নামে, নিত্যাভিনিবেশ দাও,অবিরাম তাঁর সঙ্গ কর। অবিরাম অনুক্ষণ সঙ্গ কত্তে কত্তে চক্ষুর ঠুসি খসে যাবে, অজ্ঞানতা দূর হবে,—দেখতে পাবে, একজনই সবজন, সবজনই একজন, ভেদ-বিচ্ছেদ মায়ার খেলা মাত্র। চাই তাঁর নিত্যসঙ্গ। ক্ষণকালের সঙ্গে তাঁর আংশিক পরিচয় তুমি পাবে, নিত্য-সঙ্গে তাঁর নিত্য-পরিচয় লাভ কর্ব্বে।

দ্বিপ্রহরের পরে খিলপাড়া হাইস্কুলে যাইবার কথা। সেখানকার ছাত্রদিগকে আত্মগঠন সম্বন্ধে উপদেশ শুনাইতে হইবে। কিন্তু শিবপুরের পুরুষ ও মহিলা-বৃন্দ আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় অধীর হইয়া উঠিলেন। আসিবার সময়ের অশ্রুসজল দৃশ্য বর্ণনার নহে। সকলকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীশ্রীবাবা নৌকারোহণ করিলেন।

উচ্চ কার্য্য ও নীচ চিন্তা

খিলপাড়া পৌঁছিতে প্রায় দুইঘণ্টা লাগিল। স্কুলের হলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা লইয়াছিল। ছাত্র, গ্রামের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণে স্কুলগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবা প্রায় দুই ঘণ্টব্যাপী এক অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করিলেন।

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা ছাত্রদিগকে বলিলেন,—উচ্চচিন্তার অনুশীলন কখনো পরিত্যাগ ক'রো না। কিন্তু তোমার উচ্চ চিন্তাগুলি দিয়েই বিচার করো না যে তুমি কতখানি উচ্চে উঠেছ, সঙ্গে সঙ্গে হিসাব নিও, তুমি উচ্চ কার্য্য কি পরিমাণ ক'রেছ। তোমার নীচ কার্য্যগুলি দিয়েই বিচার করো না যে, তুমি কতখানি নীচে নেমেছ, সঙ্গে সঙ্গে হিসাব নিও যে, তুমি নীচ চিন্তা কতখানি ক'রেছ। ঊর্দ্ধগমনের বিচার কর্ব্বে কার্য্য দিয়ে, অধঃপাতের বিচার কর্ব্বে চিন্তা দিয়ে। যতক্ষণ তুমি সত্য সত্য উচ্চ কার্য্যের অনুষ্ঠান না কচ্ছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চচিন্তা বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মতই নিষ্ফল যাচ্ছে। সুতরাং উচ্চচিন্তাও কর্ব্বে, উচ্চ কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্যও সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা কত্তে থাকবে। আবার, তুমি হয়ত ক্ষুদ্র রকমের একটা নীচ কার্য্য করেছ, কিন্তু জঘন্য রকমের একটা নীচ চিন্তা কচ্ছ। এমত ক্ষেত্রে তুমি মনে ক'র না যে, তুমি নীচতার দিকে খুব কম অগ্রসর হয়েছ। মনে যখন জঘন্য চিন্তার উদয় হ'তে পেরেছে, তখন একদিন হয়ত অবিবেক বশতঃ জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হঠাৎ ক'রেও বস্‌তে পার। অতএব, নিজের এই ত্রুটীকে সামান্য ত্রুটী মনে না ক'রে প্রাণপণে মনকে ঊর্দ্ধগামী কর্‌বার চেষ্টা ক'রো। উন্নত চিন্তা ক'রে তাকে কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা ক'রো, নিকৃষ্ট চিন্তা এলে তাকে সমূলে উৎপাটন কত্তে যত্ন নিও।

৪ঠা আশ্বিন,
১৩৩৯

গতকল্যকার বর্ত্তৃতায় খিলপাড়াতে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্ট হইয়াছে। অদ্য প্রাতে বহু ধর্ম্মার্থী নিজ নিজ জ্ঞাতব্য জানিতে লাগিলেন।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম

একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্ম থেকে কর্ম্মকে নির্বাসন দেওয়াও যেমন বিপজ্জনক, কর্ম্ম থেকে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়াও তেমন মারাত্মক। একটা আর একটাকে ছেড়ে চল্‌তে গেলেই ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জীবনে বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়্‌বে। যাঁরা ধার্ম্মিক, তাঁদের কর্ত্তব্য ধর্ম্মের সাথে কর্ম্মের সামঞ্জস্য ক'রে নেওয়া; যাঁরা কর্ম্মী, তাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাথে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। কর্ম্মহীন ধর্ম্মাচারীরা হয়ত ব্যক্তিগত জীবনে কেউ কেউ আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণ ক'রে কৃতার্থ হ'লেন, কিন্তু সমগ্র সমাজ ব্যাপকভাবে তাঁদের দ্বারা এজন্য উপকৃত হ'তে পার্ল না যে, হাজার করা নয়শ নিরানব্বই জনকেই ত' কোনো না কোনো একটা কর্ম্ম ক'রে জীবন নির্ব্বাহ কত্তে হবে। ধর্ম্মহীন কর্ম্মানুষ্ঠানকারীরা হয়ত নিজ নিজ কর্ম্মে সুপ্রচুর সাফল্যই জগৎকে দেখালেন, কিন্তু যে পরিমাণে মিথ্যা, ছলনা, শঠতা, পর-প্রবঞ্চনা ও নিন্দনীয় কৌশল তাঁরা প্রয়োগ কর্লেন, তার অনুসরণের দ্বারা জগতে শুধু অনর্থের পর অনর্থই সৃষ্টি হতে লাগ্‌ল। এজন্যই কর্ম্মজীবন চাই ধর্ম্মোপেত, ধর্ম্ম-জীবন চাই কর্ম্মযোগাশ্রিত। সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও জীবন্ত ব্রহ্মচৈতন্যে অবস্থিতিই হচ্ছে এযুগের দাবী।

আত্মজয়ের বিদ্যা

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা পাঁচগাঁও রওনা হইলেন। স্বর্গীয় দেবেন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে এক সভার আয়োজন হইয়াছে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যত বিদ্যাই শেখ, একটী বিদ্যা না শিখ্‌তে পার্‌লে সব বিদ্যাই বৃথা। সেটী হচ্ছে আত্মজয়ের বিদ্যা। গণিত শিখেছ, ইতিহাস পড়েছ, দর্শন-শাস্ত্র আয়ত্ত করেছ, এসব ভাল কথা। কিন্তু নিজের অদমিত তামসিক আকাঙ্ক্ষা-নিচয়কে জয় কর্বার বিদ্যা যদি আয়ত্ত ক'রে না থাক, তাহ'লে গণিতে তুমি গৌরীশঙ্কর (হ'য়েও কিছুই হ'লে না, ইতিহাসে যদুনাথ সরকার হ'য়েও কিছুই হ'লে না, দর্শনে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হ'য়েও কিছুই হ'লে না। আঠারো ভাষার পণ্ডিত যখন মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামী করে, তখন বর্ণজ্ঞানহীন একটা বালকও তাকে ঢিল ছুড়্‌তে সাহস পায়। কারণ, জগতের শ্রেষ্ঠ অষ্টাদশটী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত হ'য়েও আত্মদমন, আত্মসংযম, আত্ম-সংশোধন করার বিদ্যা আয়ত্ত করা হয়নি ব'লে এই মহাপণ্ডিত ব্যক্তিও প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্খই র'য়ে গেলেন। সুতরাং অন্য বিদ্যা শেখ ভাল কথা, না শেখ তত আফশোষের কিছু নেই, নিজেকে জয় করার বিদ্যা আগে শিখ্‌তে চেষ্টা কর। নিজের চেয়ে নিজের শত্রু নেই, নিজের চেয়ে নিজের বন্ধুও নেই। যে লালসার বশ, সে নিজেই নিজের শত্রু। যে লালসাকে বশে রাখ্‌তে পারে, সে নিজেই নিজের বন্ধু।

গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক

রাত্রি আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা জয়াগ রওনা হইলেন এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমকান্তি দাস গুপ্তের গৃহে চারি ঘণ্টাকাল অবস্থান করিলেন। কত বিষয়ে কত সৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

হেমকান্তি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক কত দিনের ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিত্যকালের।

হেমকান্তি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে গুরু ছিলেন, আজও কি তিনিই গুরু হ'য়ে এসেছেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরু বলতে যদি দেহটা বোঝ, তবে নিশ্চয়ই না।

হেমকান্তি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন;—গুরু কি পথপ্রদর্শক মাত্র ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পথ প্রদর্শক ত' নিশ্চয়ই, কিন্তু এইখানেই দাঁড়ি টেনে দিও না। পথপ্রদর্শক কথাটা লিখে তার পরে একটা কমা দাও, যেন ভবিষ্যতে উপলব্ধির কষ্টি-পাথরে যদি এর অতিরিক্ত আর কোনও কথার চিহ্ন পড়ে, তাহ'লে সেই কথাটী যুক্ত ক'রে দেওয়া যায়।

রাত্রি বারো ঘটিকায় নৌকা সোনাইমুড়ি রওনা হইল।

নোয়াখালী
৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯

প্রাতে সাত ঘটিকায় রেল-যোগে সোনাইমুড়ি হইতে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীবাবা নয় ঘটিকায় নোয়াখালী আসিয়া পৌছিয়াছেন। লামচর নিবাসী জনৈক ভদ্র-লোকের গৃহে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যুবকদের মধ্যে উৎসাহী অনেকেই আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার চরণ দর্শন করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে এখানে শ্রীশ্রীবাবা আর কখনও না আসিলেও স্থানীয় যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবার পুস্তকাবলি পাঠে তাঁহাকে জানেন বলিয়া বুঝা গেল।

ডন-কুস্তি

যুবকদের জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভারতের যত স্থানে যতগুলি সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়া বা আশ্রম আছে, সর্ব্বত্র একটা ক'রে ব্যায়ামাগাব প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ডন-কুস্তির আখড়া প্রত্যেক ছোট গ্রামে একটী ক'রে, প্রত্যেক বড় গ্রামে দু-তিনটী ক'রে, প্রত্যেক সহরের পাড়ায় পাড়ায় একটী ক'রে হওয়া দরকার। জিম্‌নাষ্টিক, মুষ্টিযুদ্ধ ও জুজুৎসুর আখড়া প্রত্যেক স্কুলে, কলেজে, ছাত্রাবাসে একটা ক'রে হওয়া দরকার। এসব স্থানেই হওয়া দরকার আগে। সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমে আসন-মুদ্রা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাটাই সর্ব্বজনীন ভাবে ভাল. এর বেশী কিম্বা অপর বিশেষ কিছু শিক্ষণীয় থাক্‌লে কোনো কোনো আশ্রমে তা সঙ্গত হবে, কোনো কোনো আশ্রমে তা অসঙ্গত হবে।

বিদ্যালয়ে ধ্যান-জপ-কীর্ত্তন

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজেই এক ঘণ্টা ক'রে সময় ধ্যান-জপ ও কীর্ত্তনের জন্য পৃথক ক'রে রাখা সম্পর্কে আপনার মত কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধ্যান-জপের জন্য একটা ঘণ্টা রাখা ভাল। তবে তার কালটা সকাল বা সন্ধ্যা হলেই উত্তম। দুপুরেও ধ্যান-জপ চলে, কিন্তু মন তেমন ভাবে বসে না। ধ্যান-জপের উৎকৃষ্ট সময় হলো স্নানের বা মস্তক-গাত্রাদি ধাবনের পর, আহারের পূর্ব্বে এবং নিরুদ্বেগ অবস্থায়। কীর্ত্তনের জন্য একটা ঘণ্টা স্কুলের মধ্যে রাখা চলে না, যদি স্কুলের একটা মাত্র সম্প্রদায়েরই ছেলেরা না থাকে। সুতরাং একটা ঘণ্টা যদি প্রত্যেকের ধ্যান, জপ, কীর্ত্তনাদির রুচি-সৃষ্টির জন্য রাখা হয় এবং সেই সময়টুকু ব্যেপে প্রত্যহ একজন সুযোগ্য আচার্য্য এমন বিষয়ে পঠন,পাঠন, ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মদেশন পরিচালন করেন, যাতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যেক বালক প্রাতে স্নানের পরে ও স্কুলে আসার আগে, সন্ধ্যায় এবং শয়নকালে প্রাণান্ত যত্নে ধ্যান-জপে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে, তাহ'লে তার ফল অধিকতর স্থায়ী হবে।

মহাপুরুষের উপদেশ মানিব কেন ?

একটি যুবক প্রশ্ন করিল,—মহাপুরুষদের উপদেশ মানিব কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তুমি একজন সাধারণ পুরুষ, তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ। তিনি তাঁর জ্ঞানের বলে, ত্যাগের বলে, তপস্যার বলে, পরহিতৈষণার বলে, নিষ্কামতার বলে তোমার মত একজন সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং তুমি বিশ্বাস করতে পার যে, তাঁর উপদেশে তোমার কুশল লাভ হবে। তাই তাঁর কথা মান্‌বে।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—তিনি হয়ত কোনো কোনো বিষয়ে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে নিকৃষ্টও ত' হতে পারেন! কয়েকদিন হয় এখানে একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন, তিনি অনেক বিষয়ে অনেক ভাল কথা বলেন, কিন্তু স্বদেশ-সেবা সম্পর্কে নীরব। আমি ত' নিজের বুকের ভিতরে স্বদেশ-

সেবার জ্বলন্ত বহ্নির জ্বালা অনুভব কচ্ছি। এ বিষয়ে আমি ত তাঁকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি না।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিলেন। অনেকক্ষণ হাসিলেন। এত হাসি হাসিলেন যে, সকলে অবাক হইয়া গেল। এক একটা হাসির হিল্লোল আসিতেছে, আর যেন সমুদ্র-বেলায় উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

হাসি থামিলে, শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তা বেশ কথা। কোনো বিষয়ে তাঁকে যদি তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট ব'লে মনে কর, তবে সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বরং তাঁর উপদেশের পরোয়া রেখ না। কিন্তু যে সকল বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ, সে সকল বিষয়ে তাঁর কথা মানতে দোষ কি বাবা?

ধ্যান-জপের আবশ্যকতা কি

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—ধ্যান-জপের আবশ্যকতা কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগতের জ্ঞান সংগ্রহে তোমার সহায়ক। বাইরের চক্ষু তোমাকে জানাতে পারে ঢাকা সহর কেমন, কল্‌কাতা সহর কেমন, দিল্লী সহর কেমন, হাতী কেমন, ঘোড়া কেমন, গণ্ডার কেমন। বাইরের কর্ণ তোমাকে জানাতে পারে লায়লা-মজনুর কাহিনী কেমন, আরব্যোপন্যাসের গল্প কেমন, শ্রীকান্তের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কেমন, অথবা খাম্বাজ রাগিণী কেমন, বেহাগ রাগই বা কেমন, মালকোষ-হিণ্ডোলই বা কেমন। বাইরের নাসিকা তোমাকে জানাতে পারে, পদ্ম-ফুলের গন্ধ কেমন, মল্লিকা-গুচ্ছের ঘ্রাণ কেমন, শেফালীপুঞ্জের সৌরভ কেমন, অথবা পায়েসের গন্ধ কেমন, সন্দেশের গন্ধ কেমন, পান্তুয়ার গন্ধ কেমন। বাইরের রসনা তোমাকে জানাতে পারে যে, মালপোয়ার আস্বাদ কেমন, হালুয়ার আস্বাদ কেমন, পোলাউর আস্বাদই বা কেমন, অথবা চিরতা কেমন তিক্ত, লঙ্কা কেমন ঝাল, বহেড়া কেমন কষায়। বাইরের চর্ম্ম তোমাকে জানাতে পারে যে, পুষ্পমালা কেমন কোমল, পশমের জামা কেমন গরম, বরফের খণ্ড কেমন ঠাণ্ডা, অথবা কণ্টক-বেধে কেমন ব্যথা, অগ্নিদাহে কেমন জ্বালা, চন্দন-প্রলেপে কেমন শান্তি। এভাবে বাইরের ইন্দ্রিয়নিচয় তোমাকে বাইরের বিষয়ে কত জ্ঞানই না

আহরণে সাহায্য কচ্ছে। কিন্তু এতে তোমার অন্তর্জগতের কি কোন জ্ঞান লাভের সহায়তা হলো ? বরং বাহ্য বস্তুতে লালসা সৃষ্টি ক'রে মনকে ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের জন্য চঞ্চল অধীর ক'রে বাইরের ইন্দ্রিয়-নিচয় অন্তর্জ্জগতের জ্ঞান লাভের সম্পর্কে বারংবার বাধাই জন্মাচ্ছে। এজন্যই ধ্যান-জপের প্রয়োজন। ধ্যান জপের প্রভাবে বহির্ম্মুখ মন অন্তর্ম্মুখ হ'লে অন্তর্জ্জগতের সেই সব আশ্চর্য্য সত্য উপলব্ধি কত্তে পারে, যার তুলনায় জগতের বাইরের জ্ঞানকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব'লে মনে হয়।

অন্তর্জ্জগৎ জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন;—বাইরের জগতেই দেখ কত জান্‌বার জিনিষ আছে। এই পৃথিবীর মত কত কোটি কোটি পৃথিবী নিজ নিজ কক্ষে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট বিধানে ভ্রমণ কচ্ছে, এই সূর্য্য-দেবের মত কত কোটি কোটি ভাস্কর এক একটা সৌর জগতের কেন্দ্ররূপে অবস্থান কচ্ছে। মানুষ এই জ্ঞানকে অর্জ্জন কত্তে গিয়ে বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সাহায্য পায় এবং জ্ঞেয় বিষয়ের বিশালতা দর্শন ক'রে বিস্ময়ান্বিত হয়। কিন্তু শত জ্ঞান লাভ ক'রেও সে প্রশান্ত হয় না, উদ্বেগরহিত হয় না, সদানন্দ-ভাব লাভ করে না। কিন্তু অন্তর্জ্জগতের রহস্যাবলি এই জড়বিশ্বের রহস্যাবলির চেয়ে কোটি কোটি গুণ অধিক কিন্তু তার স্বল্পমাত্র জ্ঞান লাভ ক'রেও সাধক চিরকালের জন্য প্রশান্ত হ'য়ে যায়, নিরুদ্বেগ, নির্ভয়, নিশ্চিন্ত হ'য়ে যায়, পরমানন্দ-রস-বিগ্রহকে দর্শন ক'রে নিজে পরমানন্দ-স্বরূপ হ'য়ে যায়। অন্তশ্চক্ষে যতই সে সেই অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী দর্শন করে, তার দৃশ্য বস্তু লক্ষ যুগেও ফুরায় না,—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল"—এই অবস্থা হয়। অন্তঃকর্ণে যতই সে অপূর্ব্ব সুর-মাধুরী আস্বাদন কত্তে থাকে, তার শ্রাব্য বস্তু লক্ষ যুগেও ফুরায় না,—"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ,"—এ অবস্থা চলে। আভ্যন্তর ঘ্রাণিন্দ্রিয় সেই পরম রসাল প্রিয় বস্তুর অপূর্ব্ব অঙ্গগন্ধ লক্ষ লক্ষ যুগ আস্বাদন কর্লেও সেই প্রেয় বস্তুর নিঃশেষ হয় না। আভ্যন্তর স্বাদেন্দ্রিয় সেই রসেশ্বর রসবিগ্রহের সুস্বাদ গ্রহণ কত্তে আরম্ভ ক'রে

কোটি কল্পকাল অতিক্রম ক'রেও তাকে শেষ করতে পারে না, সেই অশেষ-অনন্ত অশেষ-অনন্তই থেকে যায়। আভ্যন্তর স্পর্শেন্দ্রিয় অন্তর্জগতের নিত্য-সুকোমল স্পর্শসুখের স্বাদ গ্রহণ ক'রে সহস্র সৃষ্টি সহস্র প্রলয় অতিক্রম ক'রেও সেই সুপেলব-স্পর্শসুখের অসীমত্বের সীমা কত্তে পারে না। বহির্জ্জগৎ যেমন বিশাল, অন্তর্জ্জগৎ তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বিশাল। একটা সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝতে গেলে, অন্তর্জগতের অসীমত্ব সম্বন্ধে তোমার কতকটা আন্দাজ হ'তে পারে। একটী অতিদ্রুত-ধাবনক্ষম এরোপ্লেন যদি এক সেকেণ্ডের একলক্ষ ভাগের একভাগে বহু সহস্র কোটি মাইল উড়তে সমর্থ হয় এবং যদি বাইরের কোটী কোটি বিশ্বকে অর্দ্ধ সেকেণ্ডে একবার ঘুরে আস্তে সমর্থ হয়, আর সেই এরোপ্লেনটি যদি অন্তর্জগতে প্রবেশ ক'রে প্রাণপণে বেগে ভ্রমণ কত্তে থাকে এবং বহু সহস্র কোটি বৎসর বহু সহস্র কোটি শতাব্দী অবিরাম অবিচ্ছেদ ভ্রমণ কত্তে থাকে, আর তারপরে যদি থামে, তবে তখন দেখা যাবে যে, এত ভ্রমণের পরেও সে অন্তর্জগতের অসীমত্বের কিছু মাত্র হ্রাস ঘটাতে পারে নাই। এমন যে বিশাল জগৎ, যার আনন্দ, উল্লাস, প্রেম, ভালবাসা, সুস্বাদ, সুখস্পর্শ, প্রিয়দর্শন, সুখশ্রুতি, সর্ব্বপ্রকার-প্রতিক্রিয়া-বর্জ্জিত, নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল, তার ভিতরে প্রবেশের জন্যই ধ্যান-জপের আবশ্যকতা।

অন্তর-রাজ্যের পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব নহে

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা ক'ত্তে পার যে, যে-অন্তর্জ্জগতের সীমা নেই, যে-জগতে প্রবেশ ক'রে কোটি বর্ষ ভ্রমণ কল্লেও তার এক রতি অসীমতা কমান যায় না, তার সম্পূর্ণ রহস্য জানা অসম্ভব, সুতরাং চেষ্টা করা বাতুলতা। কিন্তু বাবা, তা নয়। যদিও সে অনুভূতির রাজ্য অনন্ত, কিন্তু সে রাজ্য ত' তোমারই জন্য, সে রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তে তোমার অবারিত অধিকার,—অবশ্য যদি দৃঢ় অধ্যবসায়ে সাধন ক'রে যাও। তুমি যে-অত্যাশ্চর্য্য আস্বাদন সমূহ লাভ কর্ব্বে, বাইরের রসনাযোগে বাইরের জগতের ভাষায় তুমি তা কাউকে বর্ণনা ক'রে বল্‌তে পার্‌বে না বটে, কিন্তু অন্তর-রাজ্যে প্রবেশের ফলে তুমি স্পষ্ট অনুভব কর্ব্বে যে, তুমিও তখন অনন্ত, তুমি শান্ত ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবটী

আর নও, নিজে অনন্ত হয়ে তখন অনন্ত মহাসাগরের প্রত্যেকটি চলোর্ম্মি-মালায় তুমি জ্ঞান-রঙ্গে সন্তরণ কত্তে সমর্থ হচ্ছ।

শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম-জপ

শ্বাস-প্রশ্বাস যোগে নাম জপ সম্পর্কে উপদেশ দিতে দিতে একটী বালককে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, প্রত্যেকটী শ্বাসে আর প্রত্যেকটী প্রশ্বাসে দেহের অবধারিত ক্ষয় হচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে বন্ধ করার ও উপায় নেই, এই অবধারিত ক্ষয়ও রোধ করার পন্থা নেই। কিন্তু ক্ষয় যখন হচ্ছেই, তখন এই ক্ষয়কে স্বীকার ক'রে নিয়ে এর ভিতর দিয়েই অন্ততর লাভ ও বৃহত্তর আয় সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে। তারই জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা। মনে কর, তোমার জমিদারীর উপর দিয়ে একটা প্রবল জলস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, সে তোমার জমির মাটি ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে, হাজার চেষ্টা ক'রেও তুমি তার স্রোত রুদ্ধ কত্তে পাচ্ছ না বা মাটি ধ্বসান বন্ধ করা যাচ্ছে না। কোনও এক কৌশল অবলম্বন ক'রে তুমি কি এই ক্ষতিটার পূরণ ক'রে নেবে না? ঐ প্রবল জল-স্রোতের মাঝে fan (পাখা) বসিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি সৃষ্টির চেষ্টা কর্ব্বে না? এই জল-স্রোত তোমার জমির কত মাটি ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই জলস্রোতের মাঝে fan বসিয়ে যদি একটা বিদ্যুতের প্রবাহ সৃষ্টি কত্তে পার, তাহ'লে সেই বিদ্যুৎ দিয়ে তুমি এমন দশটা কারখানা চালাতে পারবে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মণ সিমেণ্ট তৈরী হ'তে পারবে, যে সিমেণ্টের সাহায্যে ভবনদীর মুখ পর্য্যন্ত বেঁধে দেওয়া যায়। অবিরত শ্বাস-প্রশ্বাস চল্‌ছে। তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, তাহ'লে কি তজ্জনিত ক্ষয়টাকে একটা আয়ে পরিণত কত্তে চেষ্টা পাবেনা? তারই জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপের ব্যবস্থা।

জনতার মতামতের দিকে তাকাইও না

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা স্থানীয় দেবালয়ের নাটমন্দিরে এক বহু-জন-সমাকুল সভাতে "ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে প্রাণমনোহারী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

এই সহরে বক্তৃতা শ্রীশ্রীবাবার বোধ হয় এই প্রথম। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী সমস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, এমন অপূর্ব্ব বাগ্-বিভূতি এই সহরে ইহার পূর্ব্বে আর কেহ দর্শন করেন নাই।

তিন-ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতার উপসংহারীয় অংশে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—হে নবভারতের ভবিষ্যৎ স্রষ্টৃগণ, জনতার মতামতের দিকে তাকিয়ে তোমরা তোমাদের জীবন লক্ষ্য নির্ণয় ক'রো না, জীবন-লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হোক্ তোমাদের অন্তর-দেবতার প্রেমময় আহ্বান শু'নে। জনতার প্রশংসা-ধ্বনি দিয়ে তোমরা তোমাদের জীবনোদ্দেশ্যের মহত্ত্ব বিচার ক'রো না, -সেই বিচার নির্ভর করুক তোমার আপ্রাণ অধ্যবসায়-নিষ্ঠ পরিশ্রমের স্বাভাবিক ফল-স্বরূপ আত্ম-প্রসাদের উপরে। কয়জনে তোমাকে সমর্থন করেছে, সেই সংখ্যাটীকে তোমার কর্ম্মোৎসাহ-বর্দ্ধক 'টনিক' ব'লে স্বীকার না ক'রে, কেমন দরের লোকে তোমাকে সমর্থন করেছে, তার হিসাব নিও।

বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবার সহিত একটু ব্যক্তিগত আলাপ করিবার জন্য ছাত্রদের একটা ভিড় হইল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী যুবককে নানা হিতকর উপদেশ দিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা বিশ্রাম-নিরত হইলেন।

নোয়াখালী

৬ আশ্বিন, ১৩৩৯

অদ্য বেলা সাত ঘটিকা হইতে সাড়ে-দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা "দেবালয়ে" সমাগত যুবক-বৃদ্ধদিগকে যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষা-দান করিলেন। "দেবালয়" হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসিয়াই তিনি লেখনী ধরিলেন। শ্রীশ্রীবাবাকে যে-কোনও ব্যক্তি একটী দিনের জন্য দেখিয়াছে, সে-ই কয়েকটী বিষয়ে বিস্ময় অনুভব করিয়াছে যে, এই মহাপুরুষ আলস্য বলিয়া কিছু জানেন না, একটী মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট হইতে দেন না, সহস্র পরিশ্রমেও ক্লান্ত হন না, আর প্রত্যেকটী কার্য্য ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় করেন।

যে যত পবিত্র, সে তত সুন্দর

দ্বারভাঙ্গা নিবাসিনী একটী কুমারী মেয়েকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,—

"যে যত পবিত্র, সে তত সুন্দর। যে যত সুন্দর, সে তত আদরণীয়। প্রিয়জনের প্রেম যে পাইতে চাহে, তাহাকে পবিত্র হইতে হইবে, নির্ম্মল হইতে হইবে.—তুমি মা সে কথাটী ভুলিও না।"

তুমি ভগবানের জিনিষ

দ্বারভাঙ্গা নিবাসিনী অপর একটী কুমারী মেয়েকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জীবনের শ্রেষ্ঠ শান্তি ভগবৎ-প্রেমে। ভগবানকে ভালবাসিও, প্রতিক্ষণে নিজেকে তাঁরই জিনিষ বলিয়া ভাবিও।"

আত্ম-সমর্পণেই জীবনের সার্থকতা

অপরাহ্ন ছয়টায় সময় দেবালয়-প্রাঙ্গণে পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। অদ্য সভাস্থলে তিলধারণের স্থান নাই। যে স্থানে বসিবার আসন দেওয়া যায় নাই, সেখানেও সজ্জনেরা কাতারে কাতারে বসিয়া গিয়াছেন। দেবালয় প্রাঙ্গণের বাহিরে দুইদিকে জনসাধারণের গমনাগমন-পথে শত শত লোক উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তৃতার বিষয় "ভগবৎ-সাধন।" সকল মতের সকল পথের লোকদের হৃদয়-তন্ত্রীতে ভগবদ্ভক্তির প্রেম-টঙ্কার সৃষ্টি করিয়া অবিরাম অমৃত-লহরী ছুটিতে লাগিল।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সকল অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়ে, সকল আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজেকে নিঃশেষে পরমাভীষ্টের শ্রীচরণে একান্ত শরণাগত জেনে, তাঁরই ইচ্ছায় পরিচালিত হ'য়ে, তাঁরই করধৃত-যন্ত্রবৎ নিষ্কাম নির্লালস চিত্তে তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা। অর্থার্জ্জনেও নয়, যশোবৃদ্ধিতেও নয়, নেতৃত্ব-বিস্তারেও নয়, বংশ-বর্দ্ধনেও নয়, প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠায়ও নয়, বিদ্যাবত্তাতেও নয়,—ভগবৎ-পাদপদ্মে নিঃশেষে আত্মসমর্পণেই মানবের পরম পুরুষকার।

বক্তৃতা-স্থল হইতে আসিয়াই "চলো মুসাফের বাঁধো গাঠেরিয়া" অবস্থা হইল। ট্রেণের সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনই গাড়ী ধরিতে হইবে।

রাত্রি এগারটায় শ্রীশ্রীবাবা চৌমুহণি এবং রাত্রি একটায় ভোলাবাদশা পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত মজুমদার * ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার নামক দুই ভক্ত তাঁহাকে চৌমুহনি ষ্টেশনে নিতে আসিয়াছিলেন।

ভোলাবাদশা (নোয়াখালী)

৭ই আশ্বিন, ১৩৩৯

সৎকথা শুনিবার জন্য প্রাতে বহু জনসমাগম হইয়াছে। প্রাতঃকালীন আত্মকার্য্য সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসু সজ্জনদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

গায়ত্রী ও অব্রাহ্মণ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় বর্ম্মণ শ্রীশ্রীবাবার রচিত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" পাঠ করিয়াছেন। তিনি আসিয়াই সেই গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটী বলিতে লাগিলেন,—"গায়ত্রী ব্রাহ্মণের মন্ত্র;—জাতি-ব্রাহ্মণ নহে, কর্ম্ম-ব্রাহ্মণের মন্ত্র।"

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—সত্যই তাই। ভট্চায্ মশায় ঘটা ক'রে ছেলের পৈতে দিলেন, ভাব্‌লেন কুলতিলক ছেলে গায়ত্রীকে ব্রহ্মশাপ, বশিষ্ঠ-শাপ, আর বিশ্বামিত্র-শাপ থেকে উদ্ধার ক'রে সাধন-বলে ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান হবে। কিন্তু ছেলে হয় পৈতে ছিঁড়ে সেই সুতো দিয়ে বড়শীর টোপ পরাল, নয় ত' নাটাইতে জু'ড়ে ঘুড়ী উড়াতে লাগ্‌ল। এরা সব জাতি-ব্রাহ্মণ। গায়ত্রী এদের জন্য নয়।

সতীশ বাবু বলিলেন,—আপনি গায়ত্রীতে সকল জাতির অধিকার স্বীকার

* শ্রীযুক্ত বরদা এক সময়ে পুপুন্‌কী আশ্রমে কর্ম্মিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেবা, নিষ্ঠা, শ্রমপ্রিয়তা ও ঐকান্তিক গুরুভক্তির জন্য সকলের শ্রদ্ধেয় ও শ্রীশ্রীবাবার প্রিয় হইয়াছিলেন। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগের সহিত তাঁহার সহযোগ ছিল এবং দুঃখের বিষয়, প্রথম খণ্ড প্রকাশের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি অকালে দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। "অখণ্ড-সংহিতা" তৃতীয় খণ্ডের অনেক স্থানে এই মহনীয় কর্ম্মীর উল্লেখ পাওয়া যাইবে।

করেন, এতে কোনো কোনো ব্রাহ্মণকে আপনার প্রতি বিরক্ত ব'লে অনুভব হয়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ যাঁরা বিরক্তি অনুভব কচ্ছেন, কাল তাঁরাই দেখ্‌বেন সম্বর্দ্ধনা-সভার ব্যবস্থা কর্ব্বেন। ওঙ্কার এবং গায়ত্রী নিখিল সমাজ একসূত্রে বাঁধবার প্রধান অবলম্বন। একথা বুঝে ক্রমে ক্রমে সকল বিরক্ত ব্যক্তিরা অনুরক্ত হবেন। আমি এঁদের সন্তোষ প্রার্থনা বা অসন্তোষ অপ্রার্থনা করি না। আমি দিবারাত শুধু এই প্রার্থনাই করি যে, পতিত-পাবনী গায়ত্রী ভারতের সকল পতিতকে দ্রুত উদ্ধার করুন। জগৎপূজ্য ভারতবর্ষ যে জগতের ক্রীতদাসে পরিণত হ'য়ে আছে, এই দৃশ্য আমি সহ্য কত্তে পাচ্ছি না।

অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় নৌকাযোগে শ্রীশ্রীবাবা খিলপাড়া রওনা হইলেন এবং রাত্রি সাত ঘটিকায় খিলপাড়া পৌছিলেন।

৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯

প্রাতে খিলপাড়ার কয়েক জন যুবক নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। প্রত্যেকেরই প্রশ্নের উত্তর শ্রীশ্রীবাবা গভীর স্নেহভরে দিতে লাগিলেন।

নিষ্ঠাই সাধনার সিদ্ধির মূল

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— তুমি যদি উপদেশ চাও, তাহ'লে যে বিষয়ে যতটুকু আমার জানা আছে, তোমাকে অবশ্য অকপটেই বল্‌ব। কিন্তু তুমি যদি সে উপদেশ পালন না কর, তাহ'লে তোমার উপকার কি ক'রে হবে? রোগী বৈদ্যের কাছে গেল। বৈদ্য বল্‌লে "বৃহৎ বাতচিন্তামণি খাও।" রোগী কথাটুকু খাতায় টুকে নিল, দশজন বন্ধুকে প'ড়ে শুনাল, বড় বড় হরফে লিখে শিয়রের কাছে টানিয়ে রাখ্‌ল, কিন্তু ঔষধটী খলে মে'রে কথিত সহপান সহ মিশ্রিত ক'রে খেল না। এতে কি তার বায়ু প্রশমিত হবে? ঔষধটী ব্যবহার না ক'রেই বহু বন্ধুর নিকট ব'লে বেড়ান হ'ল,—"এ বৈদ্য খুব ভাল বৈদ্য, এ ঔষধ খুব ভাল ঔষধ।"

তারপরে কিছু দিন যেতে যখন খেয়াল হ'ল যে, বায়ুর প্রকোপ ত' কমে নি, তখন রোগী গেল এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তার অবস্থা শুনে বল্লেন,—"ব্রমাইড মিকশ্চার খাও।" এ বারও রোগী কথাটুকু খাতায় টুকে নিল, দশজন বন্ধু-বান্ধবকে ঔষধের গুণের কথা আর ডাক্তারের হাত-যশের কথা ব'লে বেড়াল, কিন্তু ঔষধ খেল না। জগতে এই রকম চরিত্রের কতক-গুলি লোক আছে। তাদের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, কর্ম্ম-শক্তি আছে, নাই শুধু নিষ্ঠা। এদের কখনও ব্যাধি সারে না, সারতে পারে না। কোনো বৈদ্যেরই ঔষধ এরা সেবন কর্ব্বে না, সব বৈদ্যের কাছ থেকে একটা ব্যবস্থা নেওয়া চাই এবং শেষে এদের এমন দুরবস্থাও হ'তে দেখা যায় যে, রোগের যন্ত্রণায় ভিতরে ভুগে মর্‌ছে, তবু নিজের নিষ্ঠাহীনতার মূর্খতাটাকে লোকচক্ষু থেকে অন্তরালে ঢেকে রাখবার জন্য অভিনয় করে যেন সে নীরোগ হ'য়ে গেছে। ধর্ম্ম-জগতেও এরূপ বহু লোককে দেখা যায়। হাজার পথের খোঁজ নেবে, একটা পথেও চল্‌বে না। হাজার লোকের উপদেশ নেবে, একজনের উপদেশও পাল্‌বে না। সে রকম তোমরা হ'য়ো না। যে কোনো পথেই হোক্‌, নিষ্ঠার সাথে চল। নিষ্ঠাই সাধনায় সিদ্ধির মূল, পাণ্ডিত্যও নয়, দার্শনিক যুক্তি-তর্কও নয়।

বিলাস-বর্জ্জিত সরল জীবন

বেলা দেড় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা চাটখিল পৌছিলেন এবং স্থানীয় হাইস্কুলের ছাত্রদিগকে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী একটি বক্তৃতা দ্বারা আত্মগঠন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করিলেন। বক্তৃতান্তে ছেলেদিগকে যৌগিক আসন-মুদ্রাদি প্রদর্শন করা হইল।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— বিলাস-বর্জ্জিত সরল জীবন তোমাদের কাম্য হোক। জগতে অনেক রকমের বিলাসী ব্যক্তি আছে। কেউ বস্ত্র-বিলাসী, কেউ ভোজন-বিলাসী, কেউ বাক্য-বিলাসী। সর্ব্বপ্রকার বিলাস বর্জ্জন ক'রে তোমরা সরল মেরুদণ্ডে সাধু জীবন ধারণ ক'রে জগতের বুকে নির্ভয়ে বিচরণ কর। সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য পরিহার ক'রে এমন মহিমোন্নত

কর্ম্ম-বিশাল জীবন তোমরা যাপন কর, যেন জগতের সকল কুশলার্থীরা পরবর্ত্তী কালে তোমাদিগকেই তাদের আদর্শ ব'লে জ্ঞান কত্তে বাধ্য হয়। তোমাদের গৌরব হোক্ সারল্যের গৌরব, বাহুল্যের নয়, কৌটিল্যের নয়, তারল্যের নয়।

শ্রীশ্রীবাবার প্রত্যেকটা কথা যেন ছাত্রবর্গের কর্ণে মন্ত্রের মত প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বহুবর্ষ পর্য্যন্ত এই উপদেশবাণী যে ছাত্র সমাজের প্রাণে স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছিল, পরে আমরা তাহা অবগত হইতে পারিয়াছি।

চাটখিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত এম,এ মহাশয় নিজ গৃহে শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীবাবার আরব্ধ সমাজ-সেবা-ব্রতের তিনি ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যে যত্ন তিনি তাঁহার গৃহে শ্রীশ্রীবাবাকে করিলেন, তাহা বলিবার নয়।

রাত্রি এগারটায় শ্রীশ্রীবাবা নৌকাযোগে সোনাইমুড়ি রওনা হইলেন, কারণ কাল প্রাতে মাইজদি পৌছিতে হইবে।

মাইজদি (নোয়াখালী)
৯ই আশ্বিন, ১৩৩৯

প্রাতে সাত ঘটিকায় সোনাইমুড়ি হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া বেলা আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা মাইজদি পেঁ†ছিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন, কাতারে কাতারে স্কুলের ছেলেরা এবং বহু অভিভাবক ধ্বজপতাকা হস্তে দণ্ডায়মান। শ্রীশ্রীবাবা ভাবিলেন, বোধ হয় কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ট্রেনে আসিবেন, হয়ত স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টারও হইতে পারেন,—তারই জন্ম ছাত্ররা দল বাঁধিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ট্রেন যখন থামিল এবং "স্বামীজী কী জয়" ধ্বনি উঠিতে লাগিল, আর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার রায় মহাশয় আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠদেশে সুরভি মাল্য প্রদান করিলেন, তখন শ্রীশ্রীবাবা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমার জন্ম আবার এত কাণ্ড করা ?

বলা বাহুল্য, নোয়াখালী জেলায় আসিয়া দলবদ্ধভাবে প্রদত্ত সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যর্থনা-লাভ এই মাইজদিতেই প্রথম।

শোভাযাত্রা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া চলিল। গৃহ-স্বামী হৃদয়ভরা আন্তরিকতায় যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষকে অভ্যর্থনা করিলেন। গদ-গদভাষণে তিনি বলিতে লাগিলেন,—শ্রীবাসের আঙ্গিনায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আগমনের মত আপনার আগমন, গুহকের কুটীরে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের মত আজ আপনার আগমন, বিদুরের জীর্ণ গৃহে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের মত আজ আপনার আগমন। আপনার আগমনে আজ আমি ধন্য হইলাম আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধন্য হইলেন, আমার বংশধরেরা ধন্য হইল।" বিনয় এবং ব্যাকুলতার প্রতিমূর্ত্তি এই সাধক ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

মন্ত্র-বিক্রয়

নানা সৎপ্রসঙ্গ চলিল। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্ত্র বিক্রয়কারী নাকি নরকে যায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যায় বৈ কি! মন্ত্র যে দেবে, তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন।

ভদ্রলোক।—কোনও মন্ত্রগ্রহিতা যদি জোর ক'রে মন্ত্রদাতাকে কিছু অর্থ দেয় অথবা এক ছটাক ডাবের জল খাওয়ায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেই অর্থ জগতের মঙ্গলজনক কার্য্যে নিয়োগ করাই এস্থলে উৎকৃষ্ট পন্থা। আর মন্ত্রগ্রহিতার প্রদত্ত অন্ন-পানীয় যে মন্ত্রদাতার দেহে আছে, তার কর্ত্তব্য নিজ দেহ জগতের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করা।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্ত্রদাতা যদি নিজে চেয়ে অর্থ নেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাতে দোষ কি, যদি তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের হিতের জন্য সে অর্থ প্রয়োগ করেন?

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—যদি তিনি সেই অর্থ নিয়ে নিজের সংসারের পাঁচ রকম প্রয়োজনে ব্যয় করেন?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—একথার আর কি জবাব দিব বলুন! অর্থ নিতে হলে জগৎ-কল্যাণের জন্যই নিতে হবে, আত্মপোষণের জন্য নয়। জগতের কোন ব্যক্তির প্রতি যদি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, তবে তার জন্যও নয়, সে এখন যত নিঃসম্পর্কিতই হউক। অনেক সময়ে জগৎ-কল্যাণের নাম ক'রেও আত্ম-তোষণই করা হয় যে!

সত্য জ্ঞানলাভের পন্থা ও প্রকার

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সত্য জ্ঞানলাভের পন্থা বহু। কেউ কেউ জ্ঞানিগণের সঙ্গ করেন, সেই সঙ্গের গুণে জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং তার পরে অবিরাম তপস্যার দ্বারা জ্ঞানামৃত-ফল আস্বাদন করেন। কেউ কেউ সদ্‌গ্রন্থ পাঠে সত্য জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হন এবং পরে তপস্যার ফলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করেন। কেউ কেউ অনন্ত-চিত্ত হ'য়ে সর্ব্ববিধ ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, নিন্দা-বুদ্ধি দোষ-দর্শন, ছিদ্রান্বেষণ পরিহার ক'রে অকুণ্ঠিত চিত্তে সিদ্ধগুরুর সেবা ক'রে যান এবং গুরু-কৃপায় তত্ত্বরসাস্বাদন করেন। কেউ কেউ জ্ঞানিসঙ্গ, স্বাধ্যায়, গুরুসেবা প্রভৃতি সব কিছু সম্পর্কে সম্যক্ উদাসীন থেকে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরাভিমুখ হয়ে অবস্থান করেন, নিজের দাবী ছেড়ে, নিজত্ব ভুলে শবরীর মত কাল-প্রতীক্ষা করেন এবং ভগবান্ সহসা একদিন তাঁর ভাণ্ডার জ্ঞানের রসে কাণায় কাণায় পূর্ণ ক'রে দেন। পন্থা ও প্রকার বহু, কিন্তু যে যেমন আধার, তার পক্ষে তাই গ্রহণীয় হয়। কামারের দ্বারা কুমারের কাজ হয় না, কুমারের দ্বারাও কামারের কাজ হয় না। বিগতের সংস্কার যার যেমন, তার সেই সংস্কারের ও যোগ্যতার অনুকূল পন্থাই গ্রহণীয় হয়।

পরনিন্দার পরিণাম

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরানিষ্টবুদ্ধি যে সাধক-জীবনের কি প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করে, তা

বলবার নয়। যেই ঢিল আমি প্রতিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ কচ্ছি, সেই ঢিল ঘুরে ফিরে এসে আমারই মস্তকে পতিত হবে। যে অন্যায় আমি অপরের উপরে আরোপ কচ্ছি, সে অন্যায় এসে আমাকেই দলিত, মথিত, বিমর্দ্দিত ও পরাভূত কর্ব্বে। যে কৌশলে আমি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিষ্ঠা নাশে যত্নবান্ হচ্ছি, ঠিক্ সেই কৌশল এসে আমারই প্রতিষ্ঠা নাশ কর্ব্বে। পরনিন্দা ক'রে ক'রে আমি অপর ব্যক্তির সম্পর্কে নিন্দনীয় বিষয়ের ধ্যান কচ্ছি। এতে আমার দু'রকমের ক্ষতি হচ্ছে। এক রকমের ক্ষতি এই যে,—জীবন চিরস্থায়ী নয়, পদ্মপত্রে জলের মত টল-টল কচ্ছে, কবে যে গড়িয়ে প'ড়ে যাবে, ঠিক্ নেই; এ অবস্থায় এই সময়টুকু পরনিন্দার চর্চ্চা না ক'রে নিজের সুমহৎ কোনও কল্যাণ সাধনে নিয়োগ কল্লে সে সার্থক হতে পাত্ত। দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে,— প্রাণপণে মহদ্ব্যক্তিদের মহৎ গুণাবলির ধ্যান ক'রে কোথায় নিজের মনের মলিনতা দূর কর্ব্ব, না এই সময়টুকু তার বিপরীত অনুশীলনে রত হ'য়ে গৃহের জঞ্জালই বাড়িয়ে চল্লাম। পরনিন্দাকারী ব্যক্তির অবস্থা হচ্ছে কি রকম জানো? এক ব্যক্তির ঘর ঝাড়ু দেবার জন্য একটী ঝাড়ু ছিল, সে সেই ঝাড়ূটাকে প্রতিদিন শক্ত ক'রে বাঁধ্‌ত, ভাঙ্গা শলা ফেলে দিয়ে তার বদলে নূতন নূতন পাকা পাকা আস্তা শলা বসাত, আর পাড়ার লোকে যখন নিজ নিজ ঘরের আবর্জ্জনাগুলি লোক-লজ্জা ভয়ে গোপনে এসে রাস্তার কিনারে ফেলে দিত, তখন সে ঐ ঝাড়ু দিয়ে ঝেটিয়ে সেই গুলি এনে নিজের আঙ্গিনার এক কোণায় জমাত, আর ভাল ক'রে লেবেল মেরে রেখে দিত যে, এটী হচ্ছে "বাড়ুয্যে বাড়ীর আবর্জ্জনা," এটি হচ্ছে "মুখুয্যে বাড়ীর আবর্জ্জনা", এটী হচ্ছে "বসুদের বাড়ীর আবর্জ্জনা,' এটী হচ্ছে "ঘোষেদের বাড়ীর আবর্জ্জনা"। যে আবর্জ্জনার ভিতরে উৎকট গন্ধ যত বেশী হ'ত, সে আবর্জ্জনা সে তত যত্ন ক'রে কাঁচের আলমারীতে তুলে রাখত, আর সোনার জলে লেবেল লিখে টানিয়ে দিত যে, এটী হচ্ছে "লালাদের

বাড়ীর আবর্জ্জনা," এটি হচ্ছে "আয়ারদের বাড়ীর আবর্জ্জনা," এটি হচ্ছে "মাথুরদের বাড়ীর আবর্জ্জনা," এটী হচ্ছে "পাঠকদের বাড়ীর আবর্জ্জনা।" সমস্ত জীবন ভ'রে আবর্জ্জনা কুড়িয়ে কুড়িয়ে যখন আর তার অঙ্গনে বা প্রাঙ্গণে, গৃহে বা অলিন্দে, রাস্তায় বা পায়খানায় কোনও খানে আর কণামাত্র খালি জায়গা রইল না, আর এদিকে ঝাঁটারও নূতন শলা মিলে না, ঝাঁটাকে মেরামত করার ক্ষমতা আর শরীরে নেই, এমন সময় সে দেখলে তার যত বান্ধব ছিল, সব এই আবর্জ্জনার দুর্গন্ধে আগেই তাকে ছেড়ে পালিয়েছে। দয়া, মমতা, স্নেহ, করুণা, সৎকার্য্যে রুচি, ভগবানে বিশ্বাস প্রভৃতি যত তার ভাই-ভগ্নী ছিল, সেই সব একান্ত আত্মীয়েরাও চোখের অদেখা হয়েছে। এতদিন পরের বাড়ীর আবর্জ্জনা কুড়াবার উৎসাহে কোনো দুর্গন্ধকেই দুর্গন্ধ ব'লে মনে হয় নি, আজ চতুর্দ্দিকের দুর্গন্ধে প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠেছে। নিজের ঘর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যই ঝাঁটা কেনা হয়েছিল, শরীরে যখন বল ছিল, তখন নিজের ঘর পরিষ্কার করার দিকে দৃষ্টি পড়ে নি, আজ জগতের যত পরের আবর্জ্জনা সব নিজের আবর্জ্জনায় পরিণত হ'য়ে নরক-যন্ত্রণা প্রদান কচ্ছে। পরনিন্দক ব্যক্তির পরিণাম ঠিক্ এই রকম।

নিন্দকের প্রতি প্রসন্ন থাক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি যে পরনিন্দা কর্ব্ব না, এটা আমার পক্ষে নির্দ্ধারিত কল্যাণ। পরনিন্দা কর্লে কোনো মঙ্গল নেই, না কর্লেই সকল দিকে কুশল। কিন্তু কেউ যদি আমাকে নিন্দা করেন, তা'হলে আমি কি কর্ব্ব? আমি কি তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হ'ব? ক্রুদ্ধ হ'য়ে লাভ নেই। বরং আমার প্রসন্ন হওয়াই সঙ্গত। আমি আমার যে দোষ নিজের চক্ষে দেখ্‌তে পাই না, পরনিন্দক বেচারী নিজের হিতের চিন্তা ছেড়ে আমার হিতের জন্য আমার দোষ খুঁজে খুঁজে বে'র ক'রে দিচ্ছেন। যে দোষ হয়ত আমার এখন আদৌ নেই, কিন্তু আমি যদি অসতর্ক ভাবে পথ চলি তাহ'লে হয়ত সে দোষে

কখনো লিপ্ত হ'যে পড়লেও পড়্তে পারি, নিন্দক-বন্ধু নিজের কল্পনা-শক্তির বলে তার দিকেও আমার সতর্ক দৃষ্টি আহ্বান কচ্ছেন। জেলা-বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে রেল-রাস্তার যেখানে ক্রসিং হয়, সেখানে যদি "Caution" (সাবধান!) বা "Danger" (বিপদ) এই সাইন-বোর্ড না থাকে, তাহ'লে ভেবে দেখ কত দুর্ঘটনা ঘট্তে পারে। নিন্দকেরা সেই রকম সাইনবোর্ড। তাঁরা নিজেরা রৌদ্রে পুরে বৃষ্টিতে ভিজে তোমাকে আমাকে অবিরাম বলে যাচ্ছেন,—"সাবধান! সাবধান!"

পরনিন্দা ও মহাপুরুষ

যে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সমূহের উপরে নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইতেছে, তাহার ঠিক্ এইস্থানে একখানা পত্রের নকল পাওয়া গেল। পত্রের তারিখ লিখিত নাই কিন্তু পত্রখানা পরবর্ত্তী কোনও সময়ে লিখিত বলিয়া আমাদের অনুমান হইতেছে। কারণ এই পত্রের নকল যাঁহার হস্তাক্ষরে লেখা, তিনি এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ-সঙ্গে ছিলেন না। তথাপি উপায়ান্তর না থাকায় আমরা উক্ত পত্রের অংশবিশেষ এই স্থানেই সন্নিবেশিত করিয়া দিতেছি।

এই পত্রে শ্রীশ্রীবাবা লিখিতেছেন,—

"দুনিয়ার সকল লোককে নিজ শিষ্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর মহাপুরুষদের অসাধারণ উৎসাহ দেখা যায়। উৎসাহের তীব্রতায় তাঁরা ভুলিয়া যান যে, আকাশে সহস্র সহস্র তারকা জ্বলে, বাগানে সহস্র সহস্র ফুল ফোটে, একটা তারকা সমগ্র আকাশ বা একটা ফুল সমগ্র বাগান জুড়িয়া থাকিতে অধিকারী নয়; অতএব জগতে একই সময়ে, শত শত গুরুর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ইহারই ফলে মহাত্মাদের মুখেও অন্য মহাত্মার নিন্দা শোনা যায়। পরমেশ্বরকে ভুলিয়া থাকিয়া সম্প্রদায়কে পূজা আমি বড় ভয় করি বাবা। তোমরা আমাকে সর্ব্বদা এই আপদ হইতে রক্ষা করিও। তোমাদের সংসর্গ আমার

ঈশ্বর-প্রীতিরই বৰ্দ্ধন করুক, সম্প্রদায়-বুদ্ধিকে শিথিল করুক, তাহা হইলেই তোমাদিগকে এত নিকটরূপে পাওয়া সার্থক হইবে। প্রকৃত মহাপুরুষ অপর মহাপুরুষকে নিন্দা করিতে পারেন না, রামকৃষ্ণ কাহারো নিন্দা করিতেন না, বিজয়কৃষ্ণ কাহারো নিন্দা সহিতে পারিতেন না, জগদ্বন্ধু কারো নিন্দার বিষয় কল্পনায় পর্য্যন্ত আনিতে পারিতেন না। এমন সব মহাত্মার জীবন্ত আদর্শ চোখের সাম্নে থাকিতেও যে কেন আধুনিক মহাপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ নিরতিশয় পরনিন্দক, তার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহাদের অন্তরের প্রসুপ্ত সম্প্রদায়-বিস্তার-লিপ্সার দিকে তাকাইতে হইবে। সম্প্রদায় বস্তুটাকে পরমেশ্বরের চেয়ে বড় মনে করিলে বাবা অন্য মহাত্মার নিন্দা-প্রবৃত্তি যে অনিচ্ছাতেও জিহ্বাগ্রে আসিয়া সুর্‌সুরি সৃষ্টি করিবে।”

বর্ত্তমান যুবক ও ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ

মধ্যাহ্নের পরে মাইজদি মাইনার স্কুল গৃহে এক জনতাপূর্ণ ধৰ্ম্মসভা হইল। শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণ তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ছাত্র এবং যুবকের সংখ্যাই বেশী ছিল। তাই তিনি যত সহজ ভাবে সম্ভব সকল বিষয় ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন।

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভবিষ্যৎ ভারতের পুত্র-কন্যাগণ যখন জিজ্ঞাসা কর্ব্বে যে তাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা তাদের জন্য কিসের উত্তরাধিকার রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, তখন যেন তোমাদের জীবন-কাহিনী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা কত্তে পারে যে, সাধুতার, সচ্চরিত্রতার, সদাচারের, সৎসাহসের, সুগঠিত দেহের এবং সুবলিষ্ঠ মনের উত্তরাধিকার তোমরা রেখে যেতে পেরেছ। তখন যেন তোমাদের জীবনব্যাপী আত্ম-গঠন-প্রয়াস এবং সর্ব্ব-মানবের প্রতি হিতবুদ্ধি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সতেজ কত্তে সমর্থ হয়, তাদের উৎসাহকে উদ্দীপিত কত্তে পারে। ঋষির সন্তান, পুনরায় নিজেদের জীবনে ঋষি-প্রতিভার প্রস্ফুটন কর এবং

ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য ঋষি-মনোবৃত্তির পুঞ্জীকৃত সঞ্চয় রেখে যাও। তাহ'লেই ঋষির ভারতে নরবপু ধারণ করার প্রকৃত সার্থকতা হবে।

শুদ্ধমনে শুদ্ধ প্রাণে ভগবানকে ডাক

সন্ধ্যার পরে বহু যুবক নিজ নিজ বহু জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিতে আসিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—নিজের মূত্র নিজে সেবন ক'রে এক প্রকারের সাধন আছে, তার নাম গরল-সাধন। সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ সব পন্থা অতি বিপজ্জনক। বর্ত্তমান যুগে এ সব সাধন না ক'রে শুদ্ধ মনে শুদ্ধ প্রাণে অকপট চিত্তে ভগবানের নাম জপ ক'রে তার ভিতর দিয়েই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সর্ব্ববিধ কুশল আহরণ করা কর্ত্তব্য।

লালসাময়ী পত্নীকে পোষ মানান

অপর একজন বলিলেন,—আমার নব-পরিণীতা পত্নী অত্যন্ত লালসা-পরায়ণা। তাঁকে পোষ মানাব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মেয়েদের পোষ মানান একটা কঠিন কথা কিছু নয়। তুমি যে তাঁকে ভালবাস, এই বিশ্বাস আগে তাঁর মনে দৃঢ়-নিবদ্ধ কর। তারপরে সৎপ্রসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে তার ভিতরে ভগবৎ-সাধনের একটা রুচি সৃষ্টি কর। প্রথমেই ব'লে ব'সো না যে, ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার প্রধান লক্ষ্য। শিকারী যে পাখীটাকে ধর্‌তে চায়, তাকে জান্‌তে দেয় না যে সে-ই শিকারীর লক্ষ্য। তুমি যাঁর ইন্দ্রিয়-লালসা কমাতে চাও, তাঁকে জান্‌তে দিও না যে তাঁর উদ্দাম রিপুর তাড়না প্রশমিত করাই তোমার উদ্দেশ্য। তাঁর মনকে উচ্চাকাঙ্ক্ষ কর, তাঁর চিত্তকে ভগবন্মুখী কর, এর জন্য স্বাধ্যায়কে একটা নিত্যকার বিধিতে পরিণত কর। সদ্‌গ্রন্থ অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল পাঠ না ক'রে একদিনও শয্যা গ্রহণ ক'রো না। এভাবে কিছুকাল চল্‌লে দেখ্‌তে পাবে যে, তাঁর স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ও স্বাভাবিক হিতাহিত জ্ঞান ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হচ্ছে। তখন তাঁর কাছে সংযমের বাণী পৌছাবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁর

দিক্ থেকেই উৎপাতটা বেশী থাক্‌তে পারে, কিন্তু পরে দেখ্‌তে পাবে, তিনিই সহজে নিজেকে সাম্‌লে নিচ্ছেন, তুমিই বরং সংযম-শক্তিতে তাঁর পিছনে প'ড়ে আছ। শাসনের মনোবৃত্তি নিয়ে নয়, রক্তচক্ষু নিয়ে নয়, স্নেহ-কোমল মনোভাব নিয়ে, প্রেমময় স্বভাব নিয়ে স্ত্রীর নিকটে উচ্চভাব পরিবেশন আরম্ভ কর।

মাইজদি

১০ই আশ্বিন, ১৩৩৯

আমি কাহাকেও ভুলিব না

এখানে নানাস্থানের কয়েকটী উৎসাহী যুবক শ্রীশ্রীবাবার খুব ঘনিষ্ঠ হইলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদিগকে নানাবিধ হিতজনক উপদেশ দিয়া তৎপরে বলিলেন,—এই যে দেখা হ'ল দশ বিশ বছরেও হয়ত কেউ আর কারো সাথে দেখা করার সুযোগ পাব না। তোমরা হয় ত' ততদিনে আমাকে ভুলে যাবে। কিন্তু তাতে কি আমি দুঃখিত হব? দুঃখিত হব না নিশ্চিতই। তোমরা আমাকে ভুলে গেলেও আমি তোমাদের স্মরণ রাখ্‌ব। দূর থেকে অবিরাম প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রেরণ কত্তে থাক্‌ব, যেন জগতের কোনও না কোনও স্থানে কোনও না কোনও প্রকারে অল্প হোক্, অধিক হোক্, তোমাদের দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে। অবিরাম আমি আশীষ প্রেরণ কত্তে থাক্‌ব, তোমাদের বংশধরেরা যেন জগৎ-কল্যাণের উপযুক্ত দেহ নিয়ে, উপযুক্ত মন নিয়ে, উপযুক্ত সুযোগ নিয়ে এবং সুপ্রচুর রুচি নিয়ে অবির্ভূত হয়। তোমরা আমাকে ভুলে যেও, কিন্তু আমি তোমাদের ভুল্‌ব না।

মহাজন কাহাকে বলে?

মাইজদির জিজ্ঞাসুদের সকলেরই ভিতরে জ্ঞানান্বেষণ-প্রবৃত্তির প্রাবল্য দেখা গেল। বুঝিবার জন্যই সকল প্রশ্ন, তর্ক চালাইবার জন্য নহে। শ্রীশ্রীবাবাকে আমরা দেখিয়াছি, জ্ঞানান্বেষীর নিকটে সমুদ্রবৎ বিরাট এবং তার্কিকের নিকট বাক্‌শক্তি-বিরহিত অজ্ঞানের মত নিঃশব্দ।

একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা— মহাজন যে পথে গমন করেছেন, সেই পথই পথ।" এই মহাজন কে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহাজন তিনি, যাঁর উপরে আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর। যাঁকে নির্ব্বিচারে বিশ্বাস কত্তে পারেন। যাঁর জীবনের মহত্ত্ব আপনার নিকটে স্বতঃসিদ্ধরূপে সত্য। যাঁকে যুক্তিতর্কের গণ্ডীতে টেনে এনে তবে তাঁর পক্ষসমর্থন কত্তে মনকে প্ররোচিত কত্তে হয় না। যাঁর প্রতি আপনার শ্রদ্ধা সহজাত সংস্কারের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত। যাঁর জীবনী না জেনেই তাঁকে ভক্তি কত্তে পারেন এবং যাঁর জীবনী জেনে আপনার সেই ভক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত না হ'য়ে ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হয়। তিনিই মহাজন। তাঁরই পন্থা অনুসরণীয়।

দ্বিপ্রহরের পরে শ্রীশ্রীবাবা মাইজদি পরিত্যাগ করিলেন, রাত্রি নয় ঘটিকায় খিলপাড়া পৌছিলেন। খিলপাড়াতে একটী প্রিয়জন বিশেষ অসুস্থ থাকায় শ্রীশ্রীবাবাকে পুনরায় খিলপাড়া যাইতে হইতেছে।

খিলপাড়া

১১ই আশ্বিন, ১৩৩৯

গুণগ্রাহী হও

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর গ্রামের একটী যুবককে পত্র দিলেন। এই যুবক রহিমপুর আশ্রমের প্রত্যেকটী কাজে উৎসাহী, কিন্তু সম্প্রতি গ্রাম্য কলহে রুচি-সম্পন্ন। শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জগতের কোনও মহৎ কার্য্যই একদিনে সম্পন্ন হয় না এবং কোনও মহদনুষ্ঠানই চরিত্রের বল, সংযমের বল, নিষ্ঠার বল ব্যতীত সফলতা অর্জ্জন করে না। হৃদয়ের সকল সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতে হইবে, মনের দুর্ব্বলতা ও নীচতা দূর করিতে হইবে, সকলের সাথে সমান হইয়া সকলের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন হইয়া, সকলের দোষের প্রতি উপেক্ষাশীল হইয়া, সকলের সম্পর্কে গুণগ্রাহী হইয়া একনিষ্ঠ উদ্যমে আশ্রম গড়।

বিরাট হও, পবিত্র হও

রহিমপুর নিবাসী অপর একটি যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য অতীতকে যে মনের ভিতরে পুষিয়া রাখে, জগতের কোনও বিশাল কর্ম্ম বা মহতী প্রতিষ্ঠা তার কাছ ঘেঁষিতে পারে না। দেহে মনে প্রাণে বিরাটের সেবাই সার্থকতা অর্জ্জনের পন্থা,— আশীর্ব্বাদ করি, বিরাট হও, মহৎ হও, মঙ্গলময় হও। অপবিত্রতাই চিত্তের সঙ্কীর্ণতাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করে। অতএব পবিত্র হও, নির্ম্মল হও, সুন্দর হও।

"হীনবুদ্ধি নীচচিন্তা করি' পরিহার
সমবুদ্ধি প্রেমভাব কর অঙ্গীকার।"

জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় হও

রহিমপুর নিবাসী অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"আমার জীবনে যদি কখনও ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভগবৎপ্রেম বিকশিত করিতে পারি, তাহা হইলে বিনা উপদেশেই যে তোমাদের জীবনে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং ভগবৎ-প্রেম বিকাশের স্বাভাবিক আনুকূল্যগুলি সৃষ্ট হইয়া যাইবে, আমি একথা এত গভীর ভাবে বিশ্বাস করি যে, তোমাদিগকে তপস্বী হইতে বলিবার পূর্ব্বে আমার নিজের তপস্বী হইবার প্রয়োজনই আমি সর্ব্বক্ষণ অনুভব করি। আমার জীবনের সার্থকতা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তোমাদের সার্থকতার প্রত্যক্ষ ও গৌণ হেতুস্বরূপ হইতে বাধ্য। তথাপি যে তোমাদিগকে সাধন-পরায়ণ, সত্যশীল ও লোকহিতব্রত হইতে উপদেশ দেই, তাহা প্রধানতঃ তোমাদের পূর্ব্বসংস্কার খণ্ডিত করিবার আগ্রহে। তোমরা জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় হও, ইহা ছাড়া তোমাদের সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় চিন্তা নাই।"

সুখী কে ?

স্থানীয় স্কুলের ছেলেরা কেহ কেহ সৎকথা শুনিতে আসিয়াছে। একজন প্রশ্ন করিল,—জগতে সুখী কে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে যে ব্যক্তি নিরহঙ্কার চিত্তে সর্ব্বজীবের সেবা কত্তে পারে, সেই সুখী।

ছেলেটী বলিল,—না, আমি বল্‌ছি, আমাদের মত সাধারণ লোকের ভিতরে সুখী কে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পরমুখাপেক্ষী না হ'য়ে, অপরের অনুগ্রহের প্রত্যাশা না রেখে, স্বীয় ভুজবলে অর্জ্জিত শাকান্ন যে নিজ গৃহে ব'সে ভোজন কত্তে পারে, সেই সুখী।

তোমরা সাধারণ নও

ছেলেটীকে শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—কিন্তু বাবা, নিজেদিগকে সাধারণ ব'লে জ্ঞান কর কেন? চারদিকে শত শত সাধারণ লোককে দেখ্‌তে পাচ্ছ ব'লেই কি মনে কচ্ছ যে, তোমরাও সবাই সাধারণ লোক? কিন্তু বাছা, চেষ্টা কল্লে এরা প্রত্যেকে অসাধারণ লোক হ'তে পাত্ত। কিন্তু চেষ্টা কেউ করেনি। তাই তোমরা এদের সাধারণ লোক ব'লে জ্ঞান কচ্ছ। কেউ এসে এদের বাল্যে এদের কাছে ব'লে যায়নি যে, ভিতরে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, তার বিকাশ হ'লে এরা জ্ঞানে বৃহস্পতি, ব্রাহ্মণ্যে বশিষ্ঠ, সত্যোপলব্ধিতে কপিল, ত্যাগে দধীচি, তপস্যায় বিশ্বামিত্র, সত্যে রামচন্দ্র, নির্লোভতায় শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিতে বিদুর, নিষ্ঠায় একলব্য, দানে কর্ণ, প্রতিজ্ঞা-পালনে ভীষ্ম, সৌভ্রাত্রে লক্ষ্মণ বা ভরত, আনুগত্যে হনুমান হ'তে পাত্ত। তোমরাও প্রত্যেকে এসব ত্রিকালপূজ্য মহাপুরুষদের একজন না একজনের মত হ'তে পার। তোমরা কেউ সাধারণ নও। বিশ্বাস কর যে, অসাধারণ হবার উপাদান তোমাদের মধ্যে রয়েছে এবং যার যেটুকু রয়েছে তার পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তোমরা অসাধারণত্ব লাভ কর্ব্বে।

অন্যায়ার্জ্জিত অর্থ-দান

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অন্যায়ের

দ্বারা যে অর্থ বা বস্তু তুমি অর্জ্জন করেছ, তা দান কর্লে তেমন কোনো পুণ্য হয় না। তবে অন্যায়ার্জ্জিত অর্থ নিজের ভোগে লাগাবার চাইতে পরের সেবায় লাগানটা মন্দের ভাল হ'ল, এই মাত্র বলা যেতে পারে। অসদুপায়ে অর্জ্জিত লক্ষ টাকা যদি দান কর, তাতে যা ফল, সদুপায়ে অর্জ্জিত একটী পয়সা দান কর্লে তার সহস্র গুণ ফল।

ছেলেটী প্রশ্ন করিল,—আমি যদি অন্যায়ার্জ্জিত লক্ষ টাকা দরিদ্রদের আহারের জন্য দেই, তাতে চার লাখ লোকের পেট ভরবে। আপনি কি বল্‌তে চান যে, সদুপায়ে অর্জ্জিত একটী পয়সাতে তার সহস্র-গুণ অর্থাৎ চল্লিশ কোটি লোকের পেট ভর্‌বে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না, তা বল্‌তে চাই না। কিন্তু দান কচ্ছ কেন? তার ভিতরের উদ্দেশ্য কি চিত্তশুদ্ধি নয়? সহস্র স্বার্থপরতায় তোমার মন অবিরত মলিন হচ্ছে। সেই মলিন মনকে ত্যাগ দিয়ে ধৌত করলে মনের ময়লা কাট্‌বে। এই কি দানের উদ্দেশ্য নয়? পরহিতের জন্য দান কত্তে চাও? কতখানি পরহিত তোমার দ্বারা সম্ভব? দু'শ' জনের, দু'হাজার জনের, দু'লক্ষ জনের তুমি হয়ত উপকার কত্তে পার কিন্তু জগতের সকল লোকের উপকার কি তুমি ধন দিয়ে কত্তে সমর্থ? দুদিনের জন্য, দু'মাসের জন্য, দু'বৎসরের জন্য তুমি কারো দুঃখ দূর কত্তে পার, কিন্তু চির-কালের দুঃখ কি তুমি ধন দিয়ে কারো দূর ক'রে দিতে পার? আজ যাকে আহারীয় দিলে, কালই ত' সে পুনরায় ক্ষুধা অনুভব কর্ব্বে। আজ যাকে বস্ত্র দান ক'রে লজ্জা নিবারণের সাহায্য কর্লে, দুদিন পরেই তার কাপড় ছিঁড়্‌বে, অথবা কালই সে কার্পাস-বস্ত্রের স্থলে রেশমী বস্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষার তাড়না অনুভব কর্ব্বে। বস্তু বা অর্থ দান ক'রে তুমি কতকাল তার অভাব-বোধকে দমন কত্তে পারবে? মানুষের অভাবও অফুরন্ত, ক্ষুধাও অফুরন্ত। সুতরাং অপরের অভাব-বিমোচনই দানের উদ্দেশ্য নয়, তোমার মলিন চিত্তের শুদ্ধি বিধানই দানের উদ্দেশ্য। যে কার্য্যে চিত্ত পবিত্র হয়, তাকেই বলে পুণ্য। দানে চিত্ত পবিত্র হয়,

তাই দান পুণ্য কার্য্য ব'লে পরিগণিত। অসদুপায়ে অর্জ্জিত লক্ষ টাকা দান কর্লে চিত্তে যতটুকু পবিত্রতা হতে পারে, সদুপায়ে একটী পয়সা দান কল্লে তার সহস্র-গুণ পবিত্রতা হবে। কারণ অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ যে বাস্তবিক তোমার অর্থ নয়, এটা তুমি নিশ্চিত জানো। কিন্তু অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ যত অল্পই হোক, তোমারই অর্থ, দান ক'রে তুমিই ত্যাগটা স্বীকার কচ্ছ, এজন্য এতে তোমার মনের ময়লা-কাটার প্রকৃত সাহায্য হচ্ছে।

গুরুজনদের প্রণাম করিও, বৃদ্ধদের সম্মান করিও

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে সকল গুরুজনদের প্রণাম কর্ব্বে। এতে আত্মাভিমান কমে, বিনয় বর্দ্ধিত হয়, অকপট হিতৈষীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এবং গুরুজনদের আশীষে গভীরতা সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এতকাল করনি ব'লে লজ্জা করার কিছু নেই, এখন থেকে প্রাতঃকালে গুরুজনদের প্রণাম করা সুরু কর। আর, তোমার গুরুজন হউন আর নাই হৌন, বৃদ্ধদের সব সময়ে সম্মান কর্ব্বে। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বিচার না ক'রে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রতি সসম্মান ব্যবহার কর্ব্বে, সসম্ভ্রম ভাবে বাক্য বিনিময় কর্ব্বে। অপরকে সম্মান দিলে নিজের ভিতরে সম্মান লাভের যোগ্যতা সঞ্চারিত হয়। যে দাম্ভিক ব্যক্তি গুরুজনদের প্রণাম করে না, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করে না, জগতে কেউ তাকে সম্মান কত্তে সম্মত হয় না। জগতের যত সম্মান, সবই জান্‌বে বিনয়ী, বিনম্র, নিরহঙ্কার ব্যক্তিদেরই প্রাপ্য।

বিদ্যাভিমান ও ধর্ম্মলাভ

অপর একটি যুবকের প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মপথে অগ্রসর হ'তে হ'লে নিরভিমানত্ব এক প্রধান অবলম্বন। তুমি বিদ্বান এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভিমানী, তুমি কত শাস্ত্রের কত জ্ঞান যে লাভ ক'রেছ, তা কখনো ভুল্‌তে পার না, নিজ বিদ্যাবত্তার জন্য তুমি নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে জ্ঞান ক'রে থাক,—এমন অবস্থায় তুমি কখনো আশা কত্তে পার না

যে সাধন-পথে তোমার অগ্রগতি সহজে হবে। আবার, আর একজন ব্যক্তিও খুব বিদ্বান, কিন্তু তার বিদ্যাভিমান নেই, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে তার দিনের পর দিন এই ধারণাই বর্দ্ধিত হচ্ছে যে জ্ঞানের অফুরন্ত খনির একটা প্রান্তও সে আজ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পায়নি, চাষাভূষার মুখে কত কথা শুনে তার মনে হয় এদের কাছেও শিক্ষণীয় আছে, শিশু বা স্ত্রীলোকের মুখে কত কথা শুনে তার ধারণা হয় যে এরাও কত কত বিষয়ে তার চেয়ে বেশী জানে, এমন বিদ্বান ব্যক্তির সাধন-পথে গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়। অবিদ্বানেরাও বিনয়-নম্র মন নিয়ে সাধন কত্তে কত্তে ধর্ম্ম-পথে আশ্চর্য্য ভাবে অগ্রসর হন। বিদ্বানেরাও অবিনীত মন নিয়ে পিছে প'ড়ে থাকেন। অতএব বিদ্যা যত পার অর্জ্জন কর, কিন্তু বিদ্যাভিমানী হ'য়ো না।

বিদ্বানদিগের নিন্দা করিও না

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—কিন্তু যাঁরা নানা শাস্ত্র প'ড়ে বিদ্বান হয়েছেন, তাদের নিন্দাও ক'রো না। অবিদ্বান্ লোকের চাইতে বিদ্বান লোক শ্রেষ্ঠ। সংসারিক শাস্ত্রে বিদ্বান ব্যক্তি অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। অবিনীত বিদ্বান্ ব্যক্তি অপেক্ষা সুবিনীত বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। যাঁরা স্কুল-কলেজে, টোলে-মাদ্রাসায় পাঠ না নিয়েও একমাত্র ভগবৎ-সাধনের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধির চরম উৎকর্ষ-হেতু ভগবানের কাছ থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন, তাঁরা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যিনিই যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হোন্, তোমরা কোন বিদ্বান লোককেই অসম্মান ক'রো না

পীড়াগ্রস্ত মনের চিকিৎসা

অপর একটী জিজ্ঞাসুকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সৎকথা শুন্‌তে তোমার যখন ভাল লাগ্‌বে না, তখন বুঝবে যে তোমার মন পীড়াগ্রস্ত হয়েছে। এই পীড়াগ্রস্ত মনকে রোগ-মুক্ত করার ঔষধই জান্‌বে সৎকথা। ভূতেরা রাম-নাম শুন্‌তে পারে না। কিন্তু কাউকে যদি ভূতে ধরে, তবে রাম-নামই উচ্চারণ কত্তে হয়। ঔষধ যেমন নিত্য খেতে হয়, একদিন খেয়ে আর একদিন না খেয়ে

যেমন ঔষধের সুফল আশা করা যায় না, সৎকথা আজ শুনে আবার দুদিন না শুনে তেমন ফলোদয় হয় না। মন যখনি কুকথা কুচিন্তা প্রভৃতির পক্ষে আসক্তি অনুভব কর্ব্বে, তখনি সঙ্কল্প কর্ব্বে এবং ব্যবস্থা কর্ব্বে যাতে প্রত্যহ নিয়মিত সৎকথা শোনা বা সদ্গ্রন্থ পাঠ সম্ভব হয়। রোগ, অগ্নি আর ঋণ এই তিনের শেষ রাখ্‌তে নেই।

অপরাহ্ন ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা সোনাইমুড়ি রওনা হইলেন এবং রাত্রি এগারটার ট্রেণ ধরিয়া রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটে লাকসাম পৌছিলেন।

১২ আশ্বিন, ১৩৩৯

প্রাতে সাড়ে আটটার ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম হইতে রওয়া হইবেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী ও স্থানীয় সকল ভক্ত যুবকেরা যথা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র, শচী, হরেকৃষ্ণ, ফণী, মহেন্দ্র, নিকুঞ্জ প্রভৃতি ট্রেণে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদিগকে নানা হিতোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আত্মবিশ্বাস হারাইও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ তোমরা নিতান্ত বালক। কিন্তু দশ বৎসর পরে দেখা যাবে, তোমরা নিতান্ত বালক নও, তোমাদের ভিতর থেকে এমন উচ্চ চিন্তার স্ফূরণ হচ্ছে, যা তোমাদের অভিভাবকদের কাছেও তোমাদের সম্মান বর্দ্ধিত কচ্ছে। বিশ বছর পরে দেখা যাবে, তোমাদের মধ্যে অনেকে দিগ্দেশ-বিস্ময়-সৃজনকারী এক একটা কর্ম্মের সূচনা ও পরিচালন কচ্ছ। তোমরা একজনেও আত্ম-বিশ্বাস হারিও না। তোমাদের মত ছেলের ভক্তি ও একাগ্রতাকে উপলক্ষ ক'রে দৌলতগঞ্জ, শ্রীরামদী প্রভৃতি গ্রাম এক একটা তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।

নিষ্ঠা নিয়া চল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বাবা, নিষ্ঠা নিয়ে চল্‌তে হবে। যে পথ ধরেছ, মৃত্যুতেও তা ছাড়বে না। চারদিক থেকে কত মত কত পথ হাতছানি

দিয়ে তোমাদের ডাক্‌ছে। কারো দিকে চখ দিও না, কারো প্রতি কর্ণপাত ক'রো না। যে ডাক শুনে মহজ্জীবন যাপনের ব্রত গ্রহণ করেছ, মাত্র সেই একটি ডাকের উপরে নির্ভর কর। "দশ জনারে যাও ভুলে যাও, এক জনারে সব সঁপে দাও, তারি তরে হওরে পাগল যে জন তোমার চিত্ত-চোর। এক-জনারে জান্‌লে আপন বিশ্ব-ভুবন আপন তোর।"

অগঠিত মানুষে ও ইতর জন্তুতে পার্থক্য

বেলা সাড়ে দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা চাঁদপুর পৌঁছিলেন। অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকায় শ্রীরামদী গ্রামে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষ যে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এতে সন্দেহের কোনো অবসর নেই। কিন্তু এজন্য আমাদের গর্ব্বিত হবারও কোনো কারণ নেই। যতই শ্রেষ্ঠ ক'রে মানুষকে ভগবান্ সৃজন করুন, ভগবদ্দত্ত শক্তিগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে মানুষ যতক্ষণ প্রকৃত মানুষ না হতে পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করার তার অধিকার নেই। শূকরকে মানুষ ঘৃণা করে, কুক্কুরকে মানুষ ঘৃণা করে, কিন্তু শূকর যেমন কদর্য্য বস্তুতে রুচিসম্পন্ন, কুক্কুর যেমন আত্মকলহপরায়ণ, অগঠিত মানুষ তার চেয়ে এক চুলও উৎকৃষ্ট নয়। শূকর-কুক্কুর মল-সেবা করে, কিন্তু অগঠিত মানুষ কদর্য্য লালসার, কুৎসিত রুচির, জঘন্য নীচতার সেবা ক'রে থাকে। সুতরাং এ দুয়ের পার্থক্য কি? কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার জন্য অগঠিত মানুষ নিজেকে ইতর জন্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট ব'লে দাবী কত্তে পারে? পশুরা অজ্ঞান, কিন্তু মানুষেরই বা জ্ঞানের সীমা কতটুকু? ইতর জন্তুরা স্বল্প-সামর্থ্যযুক্ত, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র মৌমাছি দশটা বলবান পুরুষকে পালায়নপর ক'রে দিতে পারে, একটা ক্ষুদ্র সর্প বহু বলবান্ মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে পারে, একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলেরা বা যক্ষ্মার বীজানু একটা জনপদকে জনপদ মড়ক সৃষ্টি ক'রে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে। শীত-গ্রীষ্মে অসহিষ্ণু হও, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হও, শোক-দুঃখে অভি-ভূত হও,—এই ত তুমি সাধারণ মানুষ! তোমাকে পশু, পক্ষী, কীট বা পতঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিসে বলা চলে?

প্রকৃত মানুষ হইতে হইবে

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—সুতরাং আমাদের সঙ্কল্প হওয়া প্রয়োজন, আমাদের প্রকৃত মানুষ হ'তে হবে। যে সর্ব্বকর্ম্মকুশল শরীর ভগবান্ আমাদের দিয়েছেন, তাকে সর্ব্বতোভাবে বলীয়ান্ ও বীর্য্যবান্ ক'রে নিয়ে তাকে আমাদের আত্মার পবিত্র বাহনরূপে ব্যবহার ক'রে আমরা চির-উন্নতির মঙ্গলময় পথে অবিরাম অগ্রসর হব। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিরূপে যে সকল অস্ত্র আমাদের প্রদান করা হয়েছে, তাদের অধীন না হ'য়ে দৃঢ় হস্তে তাদের ধারণ ক'রে নিজেদের ইচ্ছাধীনে তাদের প্রয়োগ ক'রে আমরা আমাদের পথ-বাধা-নিচয়কে নষ্ট ক'রে ক'রে অগ্রসর হব। হতাশও হব না, অলসও হব না, অতন্দ্রিত বিক্রমে দেহ-অশ্বের উপরে ব'সে কেবলি তাকে সাম্‌নের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাব। এই হবে আমাদের একমাত্র ব্রত।

রাত্রি এগারটায় শ্রীশ্রীবাবা চাঁদপুর ঘাট ষ্টেশনে গিয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশ, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ এবং অপর একটি ভক্ত যুবক সমগ্র রজনী শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গসুখে ও হিতকথায় কাটাইলেন। ভোরে ষ্টীমার ছাড়িল।

১৩ আশ্বিন, ১৩৩৯

ষ্টীমারেই স্নান করিয়া শ্রীশ্রীবাবা ধ্যান-জপ শেষ করিয়াছেন। কয়েকটি যুবক সৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণে আগ্রহান্বিত হইল।

রাম-রাজত্ব

একজন প্রশ্ন করিল,—রামরাজত্ব ব'লে একটা কথা প্রায়ই শুনি। তার মানে কি ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—কথাটা রাজনীতির গণ্ডীর ভিতরে এসে গেল। আচ্ছা বেশ, তাই বরং আলোচনা করা যাক্। মূল রামায়ণ গ্রন্থের প্রথম সর্গের শেষ অংশে ৯০।৯১।৯২।৯৩ শ্লোকে মহর্ষি নারদ মহামুনি বাল্মীকির নিকট শ্রীরামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বর্ণনা ক'রে পরিশেষে বল্‌ছেন যে রামচন্দ্রের রাজত্ব কেমন হবে। লোকসকল রামচন্দ্রের রাজ্যে হৃষ্ট, সন্তুষ্ট ও

ধার্ম্মিক হবে, রোগভয় ও দুর্ভিক্ষভয় থেকে মুক্ত হবে, পিতার জীবৎকালে পুত্রের মৃত্যু হবে না, স্ত্রীদের আগে স্বামীরা মারা যাবে না, সতীরা পতির অনুগত থাক্‌বে, অগ্নিভয় এবং জলনিমজ্জনের আশঙ্কা থাক্‌বে না, দস্যুতস্করের ভয় দূরে যাবে, সমগ্র দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে।

প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন কুশলই রাম-রাজত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেমন, লোভনীয় রাজত্ব এটা নয়? হিন্দুই রাজা হোক্‌, মুসলমানই রাজা হোক্‌, খৃষ্টানই রাজা হোক্‌, আর বৌদ্ধই রাজা হোক্‌, তার রাজত্বের যদি কখনো এরূপ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাকেই বল্‌ব "রাম-রাজত্ব।" কোনও ব্যক্তি-বিশেষই রাজা হোক্‌ বা কতিপয় শক্তিশালী, প্রভাবশালী, বুদ্ধিকৌশলশালী ব্যক্তির হাতে গিয়েই রাজ-ক্ষমতা পতিত হোক্‌, অথবা সর্ব্বসাধারণের নিয়োগ (Vote) অনুযায়ী তাদের প্রতিনিধিদের হস্তেই রাজশক্তি ন্যস্ত হোক্‌, সে রাজত্বের সত্য বর্ণনা করার সময়ে যদি নারদ-ঋষির এই বর্ণনার সাথে মিল থাকে, তবে বল্‌ব, "রাম-রাজ" স্থাপিত হয়েছে। রাজত্ব যেই করুক, প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন সুখ থাক্‌লেই সেটা রামরাজ্য, প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হ'লেই সেটা রাম-রাজ্য, প্রজা হৃষ্ট, নীরোগ, অভাবমুক্ত, নিরাপদ, দীর্ঘায়ু এবং ধার্ম্মিক হ'লেই সেটা রাম-রাজ্য।

কোন্ রাজত্ব রাম-রাজত্ব নয়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু নারদ-ঋষির রাম-রাজত্বের বর্ণনাটা একটু তলিয়ে ভেবে দেখ। প্রজা থাক্‌বে হৃষ্ট, সন্তুষ্ট এবং ধার্ম্মিক। অসহনীয় করভারে প্রপীড়িত প্রজা কখনো হৃষ্ট থাকে না। অবিচারে দণ্ডিত প্রজা কখনো সন্তুষ্ট থাকে না। যেখানে রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালনে পদে পদে মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ প্রভৃতি দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়, সেখানে প্রজারা ধার্ম্মিক থাকে না। সূর্য্যদেব সমুদ্র-বারিকে সকলের অলক্ষিতে বাষ্পরূপে আকর্ষণ ক'রে নেন, কিন্তু মেঘরূপে তাকে পুনরায় প্রবল বৃষ্টিধারায় পরিণত

ক'রে শত শত নদ-নদীর স্রোতোবৃদ্ধি ক'রে দেশ-জনপদ ধনধান্যে পূর্ণ ক'রে সমুদ্রেই পাঠান। যেখানে রাজার করগ্রহণের উদ্দেশ্য এই, সেখানেই প্রজারা হৃষ্ট থাকে, এমনকি দেশরক্ষার প্রয়োজনে কখনো কখনো নিজেদের সর্ব্বস্ব রাজার হাতে অবাধে তুলে দিতে পর্য্যন্ত দ্বিধা বোধ করে না। এমন রাজত্বের নাম রাম-রাজত্ব। এক জনের অপরাধ এক রকমে বিচারিত হবে, আর এক জনের অপরাধ অন্য আইনে বিচারিত হবে, এক শ্রেণীর প্রজার জন্য পুরস্কারের বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ও পরিমাণ একরূপ এবং সমযোগ্যতার ক্ষেত্রেই অপর শ্রেণীর প্রজার জন্য পুরস্কারের বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ও পরিমাণ অন্যরূপ,—যে রাজত্বে প্রজাপালনের ব্যবস্থা এইরূপ, সে রাজত্বে কোনো প্রজা সন্তুষ্ট থাকে না। সুতরাং সে রাজত্বের নাম রাম-রাজত্ব নয়। নারদ বলছেন,—রাম-রাজত্বে রোগ-ভয় থাক্‌বে না, দুর্ভিক্ষ-ভয় থাক্‌বে না। প্রজার যাতে ব্যাধি না জন্মাতে পারে, তার জন্য যত রকম preventive measures (প্রতীকার-পন্থা) নেওয়া সম্ভব হ'তে পারে, রাজা তার ব্যবস্থা কর্ব্বেন, প্রজাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার প্রজাদের স্কন্ধে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না, প্রজাদের স্বাস্থ্যানুকূল্যের জন্য প্রয়োজন হ'লে সমুদ্র ভরাট ক'রে সমতল সৃষ্টি কর্ব্বেন, বিল বুজিয়ে সহর গড়্‌বেন, সহর ভেঙ্গে মাঠ কর্ব্বেন, পাহাড় কেটে হ্রদ সৃষ্টি কর্ব্বেন, দেশে শস্যহানি ঘটলে নিজেকে তার জন্য দায়ী ব'লে মনে কর্ব্বেন, "কচুর শাক সিদ্ধ ক'রে খাও, আর ঘাসের দানা কুড়িয়ে এনে পেটে ঢুকিয়ে প্রাণে বাঁচ,"—এ উপদেশ দিয়েই কর্ত্তব্য শেষ কর্ব্বেন না,—এই ব্যবস্থা যে রাজত্বে তার নাম রাম-রাজত্ব। নারদ-ঋষি বল্‌ছেন,—রাম-রাজত্বে পিতা কখনো পুত্রের মৃত্যু-দর্শন কর্ব্বে না, অর্থাৎ অকালমৃত্যু থাক্‌বে না। কথাটার স্পষ্ট মানে হচ্ছে এই যে, দেশে যদি অকালমৃত্যু হয়, তবে নারদ-ঋষির মতে সেটা সম্পূর্ণরূপে রাজারই দোষ। মহাভারতের বনপর্ব্বে একস্থানে আছে যে, রাজাদের দোষেই রাজ্যমধ্যে ভীষণাকৃতি, বামন, কুব্জ, স্থূলমস্তক, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধলোচন মানবগণ উৎপন্ন হয়। এই ভারতবর্ষই রাজভক্তির জন্মভূমি, রাজাকে

"নরদেব" আখ্যা পৃথিবীর আর কোনও দেশেই বোধ হয় কেউ দেয় নি। কিন্তু এই ভারতবর্ষই তার শাস্ত্রমুখে ঘোষণা কচ্ছে যে, প্রজা যদি অকালে মরে, তবে তার জন্ম দায়ী রাজা। অকালে মৃত্যু যদি ঘটে, তবে তার কারণ অনুসন্ধান কত্তে হবে রাজাকে, প্রজা তার মৃত পুত্রকে শ্মশানে নিয়ে দাহ ক'রেই খালাস, কিন্তু একটী লোকেরও যাতে অকালে প্রাণাত্যয় না ঘটতে পারে, তার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বনের দায়িত্ব রাজার। যে রাজার রাজত্বে এই ব্যবস্থা আছে, সেই রাজার রাজত্বই রাম-রাজত্ব। নারদ-ঋষির উচ্চারিত প্রত্যেকটা শব্দকে এভাবে ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে তার অর্থ বিস্তারশঃ বুঝতে চেষ্টা ক'রো। তাহ'লেই দেখতে পাবে যে, প্রাচীন ভারত রাজধর্ম্মকে প্রজাহিতৈষণার কত বড় উচ্চ আদর্শের বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত কত্তে চেয়েছিল।

বেলা দশ ঘটিকায় ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জ পৌছিল। বেলা তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা ট্রেণযোগে ময়মনসিংহ পৌছিলেন।

১৪ আশ্বিন, ১৩৩৯

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার ট্রেণে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা রওনা হইয়াছেন। স্থানীয় একজন ডাক্তারি ছাত্র তাঁহাকে আগাইয়া দিবার জন্য জামালপুর (সিংজানী) পর্য্যন্ত যাইতেছিলেন।

চিকিৎসা-বিদ্যা শ্রদ্ধেয়

উক্ত ভক্তের সহিত আলাপ হইতে হইতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ বাবা, ডাক্তারি বিদ্যাটা আমার বড় শ্রদ্ধার বিদ্যা। এ বিদ্যা যে অধ্যয়ন করে, সে কৃপণ হোক্, দাতা হোক্, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লোকহিত সাধন কত্তে বাধ্য হয়। লোকের বিপদের সময়ে যে তার বিপৎত্রাণে সাহায্য করে, সে বিনা টাকায় করুক, আর টাকা নিয়ে করুক, সে অল্প টাকায় করুক, কি বেশী টাকায় করুক, সর্ব্বাবস্থাতেই সে কৃতজ্ঞতার ভাজন। এজন্য আমি চিকিৎসা-বিদ্যাটাকে খুব ভাল চোখে দেখি। অনলস যত্নে বিদ্যা আয়ত্ত কর, নিজেরও কাজ হবে পরেরও কাজ হবে।

শারীর-স্থান-বিদ্যা ধর্ম্মবোধের উদ্দীপক

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—চিকিৎসা-বিদ্যার একটা বড় অংশ তার শারীর-স্থান, অর্থাৎ Anatomy. খোলা চোখে যে শারীর-স্থান অধ্যয়ন করে, তার ঐহিক লাভের সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক লাভও আয়ত্ত হয়। এক বিন্দু শুক্র থেকে কি রকম এক বৈচিত্র্যসম্পন্ন অপূর্ব্ব মানব-দেহ ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন, তা' দে'খে অন্তরে বিস্ময় জন্মে। এই বিস্ময় থেকেই ধর্ম্মবুদ্ধির ও ধর্ম্ম-চেতনার বিকাশ হয়। প্রতিভাবান্ মানুষ কতকগুলি খড়ের উপরে মৃত্তিকা লেপন ক'রে নানারকমের রং ব্যবহার ক'রে প্রতিমা তৈরী করে, তাতেই কত দোষ, কত ভুল, কত ত্রুটি থাকে, অথচ মানব-শরীরের ভিতরে কতকগুলি খড় আর মাটি ঢুকিয়ে দিয়ে নয়, পরন্তু শত শত রকমের বৈচিত্র্যসম্পন্ন নানা যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে দিয়ে তার প্রত্যেকটার সুপরিচালনের কি নিখুঁত নির্ভুল সুব্যবস্থা শ্রীভগবান্ ক'রে রেখেছেন ! এ' দেখ্‌লে কার না মনে ভগবদ্-ভক্তির সঞ্চার হবে, যদি সে খোলা চোখে সব দেখে, খোলা মনে সব বোঝে ? বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি অপূর্ব্ব সুব্যবস্থা, ভাব্‌তে কার না অবাক লাগে ?

বিদ্যার্জ্জনে অনলস হইবে

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—বিদ্যার্থী প্রাণপণে বিদ্যার্জন কর্‌বে। এতে তার আলস্য, ঔদাস্য বা নিরুৎসাহ-ভাব থাক্‌লে চল্‌বে না। আলস্যকে পাপ ব'লে জান্‌তে হবে। ঔদাস্যকে রোগ ব'লে জান্‌তে হবে। নিরুৎসাহ-ভাবকে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ব'লে জান্‌তে হবে। অন্য জিনিষ টাকা দিয়ে কেনা যায় কিংবা গায়ের জোরে দখল করা যায়, কিন্তু বিদ্যা কখনও অধ্যয়ন ব্যতীত লাভ হয় না।

বাক্-সংযমের প্রয়োজনীয়তা

সন্ধ্যার পরে ট্রেণ জগন্নাথগঞ্জ-ঘাটে পৌছিল। সিরাজগঞ্জের ষ্টীমারে উঠিবার পরে কোনও এক আশ্রমের একটি গৈরিকধারী অল্প-বয়স্ক ব্রহ্মচারীর সহিত শ্রীশ্রীবাবার পরিচয় হইল। শ্রীশ্রীবাবা সস্নেহে ব্রহ্মচারীকে তাহার কুশল ও আশ্রমের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ খুব ভাল গেল। কিন্তু ব্রহ্মচারীটি দীর্ঘকাল খুব ভাল ভাবে চলিল না। সন্নিকটবর্ত্তী সকল ভদ্রলোকের সহিত কত প্রকারে যে সে বাক্-চপলতা সুরু করিল বলিবার নহে। কেহ কৌতূহলী হইলেন, কেহ বা উত্যক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবা সারাপথ একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন।

ষ্টীমার যখন সিরাজগঞ্জের কাছাকাছি হইয়াছে, শ্রীশ্রীবাবা ষ্টীমারের ইঞ্জিনের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন, ব্রহ্মচারীটীও সেইখানে আসিল। শ্রীশ্রীবাবা তখন তাহাকে সস্নেহে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—বাছা, পবিত্র গৈরিক ধারণ ক'রে পথ-পর্য্যটন কচ্ছ। এই গৈরিকের জন্যই তুমি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হচ্ছ, এই গৈরিক দেখে আর তোমার বয়স দেখে আমি তোমাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখ্ছি। তাই দুটী কথা বল্‌তে চাই, রাগ্ ত' কর্‌বে না ?

ছেলেটি শ্রীশ্রীবাবার কথা শুনিতে সম্মতি জানাইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, আজকালকার যুগে কেউ কাউকে শ্রদ্ধা কত্তে চায় না, সকলেই সকলকে অবিশ্বাস করে, সন্দেহ করে। এই যুগে যারা গেরুয়া ধারণ কর্ব্বে, তাদের উচিত এমন ভাবে চলা, যাতে বিরুদ্ধে একটি কথা বল্‌বারও পথ কারো না থাকে। তোমার প্রতি ভদ্রলোকদের অনেকেই বড় বিরক্তি বোধ কচ্ছিলেন। আমার তাতে কষ্ট হচ্ছিল। তোমাকে আর কখনো দেখিনি, কিন্তু তুমি গৈরিক ধারণ করেছ দেখে তোমাকে কত আপন ব'লে আমার বোধ হয়েছে। সেই জন্যই তোমাকে বল্‌ছি বাবা, যতক্ষণ গৈরিক-পরিহিত থাক, যতটা পার বাক্-সংযম ক'রো। কথা যত বেশী বলবে, ততই লোকের ধারণা তোমার সম্পর্কে খাটো হবে ; কথা যত কম বল্‌বে, ততই লোকের ধারণা তোমার সম্পর্কে বড় থাক্‌বে। লোকের সম্মান যদি চাও, তা হ'লে এটা একটা মস্ত কৌশল জেনো। কিন্তু সকলেই ত' সম্মানের প্রত্যাশী নয় ! তুমিও হয়ত সম্মান চাও না, মানুষ হ'তে চাও, জীবনকে সার্থকতার পথে নিতে চাও। কিন্তু বাবা, তাই যদি কাম্য হয়, তাহ'লে বাক্-সংযমের মধ্য দিয়ে সে কামনা সহজে পূরণ হবে।

ইতিমধ্যে ষ্টীমার সিরাজগঞ্জ পৌছিয়া গেল। মনে হইল, ছেলেটী শ্রীশ্রীবাবার

উপদেশের মর্ম্ম কতক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ছেলেটি ভক্তিভরে শ্রীশ্রীবাবার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতে করিতে ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিল।

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন ১৩৩৯

অদ্য প্রাতে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা পৌছিয়াছেন। ৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছেন।

কর্ত্তব্য কর—নিরুদ্বেগ মনে

দ্বিপ্রহরে একটী ভদ্রলোক উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। তাহার মনে বড় অশান্তি। সংসারের জ্বালায় প্রতপ্ত হইয়া তিনি মহাপুরুষের চরণাশ্রয় খুঁজিতেছেন।

উপদেশ-দান-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ত্তব্য ক'রে যাও বাবা, কিন্তু নিরুদ্বেগ মনে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি তোমাকে যে দিকে পরিচালন করে, দ্বিধা না রেখে তা কর। কর্ত্তব্য-পালনের সাথে হিংসা, দ্বেষ, কামনা, বাসনা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে মিশ্রিত হ'তে দিও না। কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তোমার প্রত্যেকটী আচরণের নিয়ন্ত্রিকা হউক, আচরণের কঠোরতা এবং কোমলতার পশ্চাতে যেন বিদ্বেষ অথবা লালসা এসে স্থান না নিতে পারে। পুলিশ চোর ধরেছে, না ধরলে তার কর্ত্তব্যে অপালন হ'ত, কিন্তু চোর ধরেছে ব'লেই তার মনে বিদ্বেষ রাখার কোনও সঙ্গত যুক্তি নেই। সাধারণ মানুষ এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ পোষণ করে, কিন্তু পূর্ণ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আদর্শ যাঁদের জীবনে রূপবন্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে বিদ্বেষ থাকে না, থাকতে পারে না। তোমাকেও আদর্শ-স্থানীয় হ'তে হবে। একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে জলে ডুবেছে, তাকে তুমি টেনে তুলেছ, শুশ্রূষা কচ্ছ, সুস্থ কর্ব্বার জন্য প্রাণপণ কচ্ছ। এ' যদি তুমি না কত্তে, তাহ'লে তোমার কর্ত্তব্যে ত্রুটি হ'ত, কিন্তু একটি যুবতী মেয়েকে উদ্ধার করেছ ব'লেই যে তার সুন্দর মুখ-খানার দিকে তুমি বারবার সকাম নেত্রে তাকাবে, তার কোনো সঙ্গত যুক্তি

কর্ত্তব্যের নামে শুধু কর্ত্তব্যই পালন কর, তার সাথে বিদ্বেষকেও যুক্ত কত্তে পার না, মোহকেও যুক্ত কত্তে পার না। সকল রিপু-তাড়নার ঊর্দ্ধে থেকে তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য-পালন ক'রে যেতে হবে। তাহ'লেই দেখ্‌বে, অসার সংসার তোমাকেও অসার ক'রে ফেল্‌তে পাচ্ছে না।

রজতধ্বজ রাজার গল্প

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, রজতধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। ইতিহাসের রাজা নন, গল্পের রাজা। কিন্তু এই গল্প থেকেই অনেক উপদেশ পাবে। সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁর আদেশ পালন করে, কত তাঁর ভোগসামগ্রী, কত তাঁর ধন-রত্ন, তার ইয়ত্তা নেই। উপবনশোভিত পরম সুন্দর প্রাসাদে তিনি বাস করেন, দুগ্ধে স্নান করেন, গোলাপ-জলে মূত্রশৌচ মলশৌচ করেন, স্বর্ণ-পাত্রে পানাহার করেন, বিলাসিতার অন্ত নেই। এক দিন বিদেশী দস্যু-দলপতি রজতধ্বজের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে হঠাৎ তাকে বন্দী করল্‌। রজতধ্বজ প্রাণপণে বাধা দিলেন, কিন্তু অসতর্ক মুহূর্ত্তে আক্রমণকারী অধিকতর বলীয়ান দস্যুপতির সাথে পারলেন না, হেরে গেলেন এবং বন্দী হলেন। রজতধ্বজ ভাব্‌তে লাগলেন,—"ক্ষত্রিয়রূপে আমার কর্ত্তব্য আততায়ীকে পরাভূত বা নিহত করা, কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হতবল হ'য়েছি। এজন্য কি আমি আততায়ীর উপরে ক্রুদ্ধ হব? ক্রুদ্ধ আমি নিশ্চয়ই হব না, কিন্তু কর্ত্তব্য-পালনে যদি চূড়ান্ত কঠোরতাও অবলম্বন কত্তে হয়, তবে তা থেকে ক্ষান্তও থাক্‌বো না। যা হোক্‌, আমি নিরুদ্বেগ চিত্তে সুযোগ-প্রতীক্ষা করি।" রজতধ্বজের দাস-দাসীদের দ্বারা রজতধ্বজের অপমান করান হ'তে লাগল, বন্দী রাজা নিরুদ্বেগ চিত্তে সকল অপমান সহ্য কত্তে লাগ্‌লেন এবং মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"এ অপমান সাধারণের অসহ্য হ'লেও আমি নিরুদ্বেগ চিত্তেই সহ্য কর্‌ব, কিন্তু অপমানের প্রতীকারের জন্য যদি অতীব নিষ্ঠুর উপায়ও অবলম্বন কত্তে হয়, তবে তাও নিরুদ্বেগ চিত্তেই কর্‌ব।" রজতধ্বজের অতি প্রিয় মূল্যবান্‌ মুক্তাহার, মোতির মালা, হীরার অলঙ্কার ধনাগার থেকে খুলে এনে

কোনোটা একটা বানরের গলায়, কোনোটা একটা উল্লুকের গলায়, কোনোটা একটা পেচকের গলায়, পরিয়ে দেওয়া হ'তে লাগল, রজতধ্বজ অন্তরের ক্রোধ-কে দমন ক'রে স্থির মনে সব সহ্য কত্তে লাগ্লেন। তাঁর মনের বিচার হচ্ছে এই যে,—"ক্রোধের কারণ আছে, তবু ক্রুদ্ধ হব না, কিন্তু ক্রুদ্ধ হই নাই ব'লেই যে কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন হব, তাও না। কর্ত্তব্য যতই কঠোর হোক পালন-কত্তেই হবে।" তিনি অসহায় বন্দী অবস্থায় কালকর্ত্তন কত্তে লাগলেন। একদিন নূতন রাজার জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রহরীরা মদ্যপানে উন্মত্ত হ'য়ে অচেতন অবস্থায় কারাকক্ষের দ্বারে পড়ে আছে দেখে রাজা রজতধ্বজ হাতের কড়ি পায়ের বেড়ি ছিঁড়ে প্রহরীদেরই একজনের খাপ থেকে তলোয়ার খুলে একে একে তাদের মুণ্ড-চ্ছেদ কর্‌লেন। তার পরে প্রহরীদেরই বেশ পরিধান ক'রে সুরাপানমত্ত সেনা-পতির নিকটে গিয়ে অসতর্ক অবস্থায় তার মস্তক ছেদন ক'রে নিজে পুনরায় সেনাপতির বেশ ধারণ কল্লেন। এদিকে রাজা রজতধ্বজের অনুরাগী একদল ক্ষত্রিয়-কুমার হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার-কল্পে রজতধ্বজকে সাহায্য করবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল, কৌশলে রজতধ্বজ তাদের এনে সমবেত ক'রে অনন্দোৎসব-মুখরিত রাজ-প্রাসাদ অবরোধ ক'রে রমণী-বিলাস-প্রমত্ত নূতন রাজাকে বন্দী কর্‌লেন। বন্দী ক'রে রজতধ্বজ সেই বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"বন্দি, তুমি কোন্ শাস্তি চাও?" বন্দী বল্ল,—"আমি যখন বন্দী, তখন তোমার করুণা-ভিক্ষার আমার ইচ্ছা নেই।" রজতধ্বজ বল্লেন,—"করুণা ভিক্ষা কর্‌লেও করুণা আমার কাছে পাবে না। সেদিন যখন আমার চোখের সামনে আমার গৃহের অঙ্গনা-গণকে আমারই ললনা জানবার পর আমাকে অপমানিত করবার জন্যই তোমার অনুচরদের মধ্যে সব চেয়ে যারা নীচ জাতীয় তাদের দ্বারাই ধর্ম্ম নষ্ট করিয়েছিলে, আমি ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ হই নাই। পরন্তু মনে মনে বিচার ক'রে ছিলাম যে, আমি যখন পরাজিত, তখন এ মর্ম্মন্তুদ অপমান আমার প্রাপ্য। সে দিন যেমন ক্রুদ্ধ হই নাই, আজও তেমন দয়ার্দ্র হব না। কিন্তু তুমি সেইদিন আমার ললনাগণ সম্পর্কে যে ব্যবহার করেছিলে, আমি যদি আজ তোমার ললনাগণ সম্পর্কে সেই ব্যবহার করি, তবে তা' সুবিচার হবে

না, হবে প্রতিহিংসা। সুতরাং তোমার সম্পর্কে আমার প্রথম আদেশ এই যে, জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড দ্বারা সর্ব্বসাক্ষাতেই তোমার উপস্থ-প্রদেশ দগ্ধ ক'রে দেওয়া হবে।" বন্দী আর্ত্তনাদ কত্তে লাগল, কিন্তু কথামত কাজ করা হল। রজতধ্বজ বল্লেন,—"বন্দি, আমার রক্তমাংসের চেয়ে প্রিয়তর মূল্যবান্ হীরা-মুক্তা সেদিন তুমি শুধু আমাকে ক্লেশ দেবার উদ্দেশ্যেই বানরকে আর পেচককে বিতরণ করেছিলে। সে দিন আমি ক্রুদ্ধ হই নাই, তাই আজ দয়ালু হব না। সুতরাং তোমার সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় আদেশ এই যে, আমার যে যে অঙ্গের অলঙ্কার তুমি সেদিন ইতর জন্তুকে দিয়েছিলে, তোমার সেই সেই অঙ্গ থেকে মাংস কেটে নিয়ে শৃগাল, কুক্কুর ও শকুনিকে প্রদান করা হবে।" বন্দী আর্ত্তনাদ কত্তে লাগল কিন্তু কথামত কার্য্য হ'ল। তারপরে রজতধ্বজ বল্লেন,—"বন্দি তুমি আমার দক্ষিণ-বাহু-স্বরূপ মন্ত্রীকে কৌশলে হস্তগত ক'রে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ ক'রেছিলে। সেই দিন আমি ক্রুদ্ধ হই নি, মনে মনে বিচার ক'রেছি, যে ব্যক্তি নিজের হস্তকে নিজের শাসনে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখ্‌তে পারে না, তার শাস্তি এরূপই হওয়া সঙ্গত। সেদিন যেমন ক্রুদ্ধ হইনি, আজ তেমনি দয়ার্দ্রও হব না। এই নাও তীক্ষ্ণ ছুরিকা, নিজের দক্ষিণ হস্তে তাকে ধারণ ক'রে নিজের হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ ক'রে বোঝ যে নিজের হাত নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কর্ল্লে কেমন লাগে। আদেশ যদি পালন না কর, তাহ'লেও তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। তবে তিলে তিলে পলে পলে প্রাণদণ্ডকে আস্বাদন ক'রে মর্ত্তে হবে, এই মাত্র।" বন্দী আর্ত্তনাদ কত্তে কত্তে ক্ষণেকের জন্য স্থির হল এবং নিজের হাতের ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ কর্‌ল। সকলে বল্‌তে লাগ্‌ল,—"বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে, যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল।" রজতধ্বজ বল্‌লেন,—"উত্তেজিত হয়ো না, এতে আনন্দের কিছু নেই, আমি কর্ত্তব্য পালন মাত্র করেছি,যে দস্যু হয়,যে কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকে বিশ্বাস-ঘাতকে পরিণত ক'রে স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধি ক'রে, যে বিজিত নরপতির অর্থ অকারণে নাশ করে এবং বিজয়ের উচ্ছ্বাসে রমণীদের সতীত্ব-নাশ করে বা করায় এবং তাও অতীব জঘন্য ভাবে, ধর্ম্মানুসারে এই তার শাস্তি। ইহা কর্ত্তব্যের বিধান,

বিদ্বেষের জয় বা প্রতিহিংসার চরিতার্থতা নয়।" তারপরে রজতধ্বজ বল্লেন,—"বিশ্বাস-ঘাতক মন্ত্রি, তুমি কোন্ শাস্তি চাও?" মন্ত্রী বল্লে,—"মহারাজ, ক্ষমা চাইবার অধিকার আজ নেই, আমাকে অবিলম্বে প্রাণদণ্ড দিন্।" রাজা রজতধ্বজ বল্লেন,—"শাস্তির উদ্দেশ্য চরিত্রের সংশোধন,—হয় অপরাধীর, নয় দর্শকের, নয় উভয়ের। তোমাকে প্রাণদণ্ড দিলে সে উদ্দেশ্য সফল হবে না।" বন্দী মন্ত্রী জিজ্ঞাসা কল্ল,—"তবে কি শাস্তি দেবেন রাজা?" রাজা রজতধ্বজ বল্লেন,—"যে দিন তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে তোমার চিরকালের অন্নদাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রেছিলে, সেইদিন আমি ক্রুদ্ধ হইনি। তোমার চরিত্রে যে সঙ্গোপনে নীচতা, খলতা, অবিশ্বস্যেয়তা প্রভৃতি প্রবেশ কচ্ছে, আমি রাজা হয়েও তা দেখ্‌তে পাইনি ব'লে নিজের দোষেই এ ঘোর বন্দিদশায় পড়েছি বিচার ক'রে নিজেকে শাসন করেছি। সেদিন যেমন ক্রুদ্ধ হইনি আজও তেমন দয়ার্দ্র হব না। এই রইল একটা হীরক-থালে বিষমিশ্রিত অন্ন, এ অন্ন খেলে মৃত্যু হয় না, কিন্তু দিবা রাত্রি শরীরে মৃত্যু-যন্ত্রণার অনুভব হ'তে থাকে; আর এই রইল স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে বিষ মিশ্রিত পানীয়, এই জল খেলে মৃত্যু হয় না, কিন্তু পানমাত্র ধমনীতে ধমনীতে আগুনের হল্কা বইতে থাকে, সপ্তদিবসের পচা পশু-মাংসে দুর্গন্ধযুক্ত কারাগারের ভিতরে এই দুই সম্বল সহ তোমাকে বন্দী ক'রে রাখা হবে। ছয় মাস পরে তোমাকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত ক'রে এনে যখন দেখ্‌ব, তোমার মন অনুতপ্ত, পাপমুক্ত, নিষ্কলুষ হয়েছে, তখন তোমার মুক্তি।" মন্ত্রী আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল কিন্তু রাজার আদেশ পালিত হ'ল। এদিকে রাজা রজতধ্বজ সমগ্র রাজ্যময় ঘোষণা ক'রে দিলেন যে, মৃত দস্যুপতির দেহের মহাসমারোহে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করা হবে। একজন ক্ষত্রিয়-কুমারকে পুত্রের প্রতিনিধিরূপে মুখাগ্নি কত্তে আদেশ দেওয়া হল, লক্ষ মণ চন্দন কাষ্ঠ ও সহস্র মণ গব্য ঘৃত দ্বারা মৃত দেহ দাহ করা হ'ল, মৃতের পারলৌকিক কল্যাণার্থে মৃতব্যক্তির ললনাদের দ্বারা রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করান হ'ল, যথাকালে শ্রাদ্ধাদি মহা-আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হ'ল। কুল-পুরোহিত রাজা রজতধ্বজকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—"রাজন্‌ একটা শত্রুর সম্পর্কে এসব ব্যবস্থার কোন্ প্রয়োজন ছিল?

প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তির মৃতদেহ তার কোনো আত্মীয়ে গ্রহণ না কল্লে শ্মশানে ফেলে রেখে আসাইত প্রচলিত বিধি, শেয়ালে শকুনে তার দেহ ছিঁড়ে খাবে।" রজত-ধ্বজ বল্লেন,—"হে কুলপুরোহিত, আমি ক্ষত্রিয়। বিজিত ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিজয়ী ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য অতীব মহৎ।" রাজা রজতধ্বজ দস্যুপতির বিধবাদের জন্য নগরের এক প্রান্তে বাসস্থান নির্দ্ধারণ ক'রে দিলেন এবং তাদের সদুপায়ে জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাছা, তুমিও এভাবেই কর্ত্তব্য পালন কর। পুত্র বিবেকহীন? ক্ষুব্ধ হ'য়ো না। ভ্রাতা গঞ্জনা-কারী? ক্রোধ কেন? স্ত্রী অসতী? ধৈর্য্য ধর। ধৈর্য্যের গুণে এদের চরিত্র-পরিবর্ত্তন হবে। আর, যখন যে শাসন বা তোষণ প্রয়োজন, কর্ত্তব্যবোধে কর, রিপুর তাড়নায় নয়।

কর্ম্ম ও কর্ম্মী

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা হেদুয়ার মাঠে (Cornwaliis Square) বসিয়াছেন। উপদেশার্থীরা জড় হইয়াছেন। নানা কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—A true and strong leader never follows the dictates of his whimsical lieutenants [প্রকৃত ও দৃঢ়-চেতা নেতা কখনো তার খাম-খেয়ালী সহকর্ম্মীদের মতলব-মত চলেন না] দশ লক্ষ অবাধ্য কর্ম্মীর নেতা হ'য়েও সুখ নেই, একটী বা দুটী বিশ্বস্ত কর্ম্মী তার চেয়ে ঢের ভালো। কর্ম্মীদের সংখ্যাধিক্যই কর্ম্মের সাফল্যের হেতু নয়; স্বল্প-সংখ্যক কর্ম্মীও যদি নিজেদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়, নিজেদের কর্ম্মতালিকায় আস্থা-সম্পন্ন হয়, পরস্পরের প্রতি প্রীতি-শীল ও শ্রদ্ধাবান্ হয়, নিরভিমান চিত্তে একে অন্যের অনুপূরক রূপে কাজ কত্তে প্রস্তুত হয়, নিজের মান, প্রতিপত্তি ও সুখ-সুবিধার আকাঙ্ক্ষী না হ'য়ে সহধর্ম্মি-গণকে তা দিতে প্রস্তুত হয়, অনলস অতন্দ্রিত একনিষ্ঠ হয়, এবং নেতার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য-যুক্ত হয়, তাহ'লে জগতে কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকে?

কলিকাতা

১৬ আশ্বিন, ১৩৩৯

সমগ্র দিনটাই আজ শ্রীশ্রীবাবার পত্র লেখায় গিয়াছে। স্তূপীকৃত পত্র লেখা হইয়াছে। একখানারও অনুলিপি রাখা সম্ভব হয় নাই।

সহধর্ম্মিণীর শক্তি

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীটে এক ভক্তের গৃহে আসিয়াছেন। জনৈকা ভক্তিমতী মহিলাকে উপদেশ-দান-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ মা, সহধর্ম্মিণীর শক্তি স্বামীকে শক্তি দেয়। তার দুর্ব্বলতা স্বামীর ভিতরে দুর্ব্বলতার সঞ্চার করে। তার আশা-উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এজন্যই তোমাদের প্রয়োজন এমন জীবন যাপন করা, এমন চিন্তার অনুশীলন করা, এমন সাধন এমন ভজন করা, যেন তোমরা প্রকৃতই শক্তি-সঞ্চারিণী শক্তি অর্জ্জন কত্তে পার। স্বামীরা স্ত্রীকেই মনে করে তাদের রত্ন-পেটিকা কিন্তু যে স্ত্রী নিজের তপস্যার গুণে মহারত্ন ভগবৎ-প্রেম অন্তরে না সঞ্চয় করেছে, তাকে রত্ন-পেটিকা নাম দিলেই ত' কোনও কাজ হবে না! স্ত্রীর ভালবাসা যেখানে স্বামীর মনকে বাইরের শত প্রলোভন থেকে টেনে আন্‌তে পারে, সেখানেই স্ত্রীকে রত্ন-পেটিকা ব'লে মনে করা সঙ্গত। স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ আহ্বান যেখানে সকল অধঃপতন থেকে স্বামীকে রক্ষা কত্তে সমর্থ হয়, সেখানেই স্ত্রী তার রত্ন-পেটিকা। স্ত্রী যেখানে চপলা, স্বামীর সেখানে ইহ-পরকালের সর্ব্বনাশ ছাড়া গতি নেই। স্ত্রী যেখানে ধীর, বিবেচক, সংযমী, স্বামীর সেখানে সর্ব্বনাশের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তোমরা তেমন পত্নী হও এবং তোমাদের স্বামীদের কুশল কর।

সাময়িক কর্ম্মী ও সার্ব্বকালিক কর্ম্মী

রাত্রি নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা জনৈক সহকর্ম্মী সহ হাওড়া হইতে মোকামা-ঘাট রওনা হইলেন। পথে পথে বলিলেন,—সার্ব্বকালিক কর্ম্মী ছাড়া বড় প্রতিষ্ঠান চালান যায় না। পাচ দিকে পাঁচটা প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়ে অবসর সময়ে এসে প্রতিষ্ঠানের সেবা কর্ব্ব, কর্ম্মীদের মধ্যে এভাব থাক্‌লে বাজে কাজ গুলি হয় মুখ্য, প্রতিষ্ঠানের কাজ হয় গৌণ। এজন্যই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান চালাতে

হ'লে বা প্রতিষ্ঠানের কাজ বহু-ব্যাপক কত্তে হ'লে প্রতিষ্ঠানে সার্ব্বকালিক কর্ম্মী (whole-time worker) চাই। সার্ব্বকালিক কর্ম্মীরা কর্ম্মের মূল-সূত্র ধ'রে রাখ্‌বেন এবং সাময়িক কর্ম্মীরা (part-time workers) তাঁদের কাজে সহযোগ রক্ষা কর্‌বেন। সাময়িক ও সার্ব্বকালিক উভয়বিধ কর্ম্মীরই আবশ্যকতা আছে।

১৭ আশ্বিন, ১৩৩৯

প্রাতে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা মোকামা-ঘাট আসিয়া পৌছিলেন। কোনও এক ভদ্রমহিলার আতিথ্যে অবস্থান করা হইল।

গৃহীদের সংসর্গে ব্রহ্মচারী

সেখানে ন- ব্রহ্মচারী নামক কলিকাতা বরাহনগরস্থিত কোনও আশ্রমের একজন সাধু ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—গৃহীদের দীর্ঘ সংসর্গে কি কোনও ব্রহ্মচারীর থাকা সঙ্গত ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না, তা সঙ্গত নয়। গৃহস্থদের সাথে দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে ব্রহ্মচারীর মনে গার্হস্থ্যের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আসক্তি জ'ন্মে যেতে পারে। আবার গৃহস্থদের নানা আচরণের দোষ দর্শন ক'রে তাদের প্রতি বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হ'তে পারে। আসক্তিও যেমন দোষের, বিদ্বেষও তেমন দোষের। কিন্তু প্রয়োজনে প'ড়ে যে সব ব্রহ্মচারী গৃহস্থদের গৃহে বাস কত্তে বাধ্য হয়, তাদের উচিত গৃহ-স্বামীকে শিব-মহাদেব, গৃহ-কর্ত্রীকে স্বয়ং ভগবতী, তাদের পুত্রদিগকে কার্ত্তিক-গণেশ ও কন্যাদিগকে লক্ষ্মী-সরস্বতী, দাসীগুলিকে জয়া-বিজয়া, ভৃত্যগুলিকে নন্দী-ভৃঙ্গী ব'লে জ্ঞান করা। যে যত নিকৃষ্ট হোক্, তাকে উৎকৃষ্ট ও মহদ্‌গুণবিশিষ্ট ব'লে জ্ঞান করায় ব্রহ্মচারীর পক্ষে গৃহস্থের গৃহে বাস কতকটা কৈলাস-বাসের মত পবিত্র ভাবের উদ্দীপক হ'তে পারে।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা

উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় তৎপরে সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় সাকার উপাসনায় অনুরক্ত।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাকার উপাসনা ভাল কি নিরাকার উপাসনা ভাল, তা নির্ভর করে আধারের উপর। আবাল্য যে সাকার উপাসনার প্রশংসা শ্রবণ ক'রে এসেছে, সেই ব্যক্তি বেদ-বেদান্ত-পারগ হ'য়েও নিরাকার উপাসনায় মনকে বসাতে পারে না। আবার আবাল্য যে নিরাকার মতে উপদেশ শুনে এসেছে, নিরক্ষর গো-মূর্খ হ'য়েও তার নিরাকার উপাসনা আট্‌কে থাকে না। অনেকের যে ধারণা, সাকার উপাসনা না ক'রে কেউ নিরাকারে পৌঁছুতে পারে না, এ ধারণা সম্পূর্ণই সত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ ধারণার আংশিক প্রতিষ্ঠা অনুমানে। মানুষ নিজেকে দিয়েই ভগবানের বিষয়ে কল্পনা করে, একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু মানুষ নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে নিজেকে যা কল্পনা করে, নিজের আত্মার দিকে তাকিয়ে নিজেকে তা, কল্পনা করে না। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে মানুষ নিজেকে হস্তপদবিশিষ্ট চক্ষুকর্ণধারী ব'লে কল্পনা করে এবং সেই জন্যই ভগবান্‌কেও ঐরূপ কল্পনা কত্তে ইচ্ছুক হয়,—এইটি হ'ল সাকারবাদীদের প্রধান যুক্তি। আবার মানুষ নিজেকে দেহ ব'লে জ্ঞান না ক'রে যদি একটু ভিতরে তাকায়, তাহ'লে বুঝতে পারে,—"এই দেহটা একটা জড়পিণ্ড, আমিই এই দেহটাকে চালাই, দেহের আকার আছে, কিন্তু আমার কোনো আকার নেই; এক বিন্দু শুক্রের লক্ষ ভাগের একভাগ থেকে এই দেহটার উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু আমি শুক্রও নই, আমার উৎপত্তিও ঘটেনি; দেহের ভিতরে আশ্চর্য্য সব ক্ষমতা রয়েছে, অথচ এসব ক্ষমতা একটাও দেহের নয়, যাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, এসব ক্ষমতা সেই আমার; আমার ক্রিয়া ও শক্তি সমগ্র দেহের সকল স্থানেই সমভাবে চলেছে অথচ আমি দেহের কোনো অংশেই আবদ্ধ নই; দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ আছে, অথচ আমার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই, দেহের সাহায্যেই আমি স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ সম্পর্কে অনুভব গ্রহণ করি. শব্দ-শ্রবণ-জনিত আনন্দ ও দৃশ্য-দর্শন-জনিত তৃপ্তি লাভ করি, অথচ এ সকল অনুভূতির, এ সকল তৃপ্তির যিনি সম্ভোক্তা, সেই আমার কোনও আকার নেই; দেহকে খণ্ড করা যায়, আমাকে যায় না, দেহকে দগ্ধ করা যায়, আমাকে যায় না, দেহকে ধ্বংস করা যায়, আমাকে

যায় না, দেহকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, আমাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না ; সুতরাং দেহ সাকার হ'লেও আমি সাকার নই ; আমি নিরাকার। তখন সে নিজেকে নিরাকার ব'লে অনুভব করার দরুণ ভগবানকেও নিরাকার ব'লেই কল্পনা কত্তে ইচ্ছুক হয়। তার পক্ষের যুক্তি এই যে,— "আমাকে দেখা যায় না, তবু আমার অস্তিত্ব সমগ্র দেহে সর্ব্বক্ষণ অনুভব করা যায়, তবে ভগবানকে দেখা যায় না ব'লেই তাঁর অস্তিত্ব সর্ব্বভূতে সর্ব্বক্ষণ অনুভব করা যাবে না কেন?" সাকার-বাদীর প্রশ্ন এই হবে যে, ভগবান্ নিরাকার হ'লে তাঁর পূজা-অর্চ্চনা আবার কি ক'রে সম্ভব হয়? নিরাকার-বাদী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে,—"ভগবানের অস্তিত্ব অনুক্ষণ উপলব্ধি করাই হচ্ছে তাঁর অর্চ্চনার প্রধান কথা, এতে ফুল-বেলপাতা না থাক্‌লেই বা ক্ষতি কি?"

এক আশ্রমের লোকদের দ্বারা অপর আশ্রমের নিন্দা

সুবিখ্যাত একজন মনীষী মহাপুরুষ দক্ষিণ ভারতে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই আশ্রমে একটি বিদেশী মহিলা সাধিকা জীবন গ্রহণ করিয়া নেতৃত্ব করিতেছেন। উক্ত সাধিকা সম্পর্কে বলিতে গিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় তন্ত্রমতোক্ত ভৈরবীর সহিত তুলনা দিলেন। ব্রহ্মচারীজীর কথায় একটু নিন্দায় কণ্ডূয়ন আছে।

শ্রীশ্রীবাবা মনে মনে বড় ব্যথা অনুভব করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— কার আশ্রম কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হ'য়েছে, বাইরে থেকে কে তার প্রকৃত বিচার কত্তে সমর্থ হবে? আর, কোনও আশ্রমে যদি মহিলারা থাকেন, তাঁরা জগতের মঙ্গলের জন্যই আছেন, এ ধারণা করাটাই সজ্জন মাত্রের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শুনেছি, আপনি নাকি কোন্ এক আশ্রমেরই শিষ্য। এক আশ্রমের আশ্রিত ব্যক্তি অপর এক আশ্রমের দোষ-কল্পনা কর্ব্বেন কেন?

ব্রহ্মচারীজীর সংসর্গ হইতে বিদায় লইয়া শ্রীশ্রীবাবা নিজ সঙ্গীকে বলিলেন,— "এক আশ্রমের লোকের পক্ষে অপর আশ্রমের লোকদের সম্পর্কে দোষচিন্তা করা ভাল নয়। অন্য লোকে যাই করুক, তোরা এরূপ করিস্ না। এরূপ করা শিষ্টাচারেরও বিরোধী, নৈতিক কুশলেরও পরিপন্থী।

বেলা দুইটায় মোকামাঘাট হইতে ষ্টীমারে উঠিয়া সামেরিয়াঘাট দিয়া শ্রীশ্রীবাবা বরাউনি রওনা হইলেন।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

বরাউনি জংশনে শ্রীশ্রীবাবা নামিতেই কয়েকজন রেলকর্ম্মচারী শ্রীশ্রীবাবার সহিত ধর্ম্মালাপে রত হইলেন। বাগচী-বাবু নামে একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন,—দ্বৈতবাদ সত্য না অদ্বৈতবাদ সত্য ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—যতক্ষণ "বাদ" বা "theory", ততক্ষণ উভয়েই অসত্য। যে মুহূর্ত্তে "স্বাদ"বা "Realization,"তন্মুহূর্ত্তে উভয়ই সত্য। কেউ "স্বাদ" পায় দ্বৈতের পথে, কেউ "স্বাদ" পায় অদ্বৈতের পথে। "স্বাদ" পাওয়াই প্রয়োজন, যে যে-পথে চ'লে পায়, পাক। মতামত নিয়ে লড়াই করা পণ্ডশ্রম। সাধারণতঃ গৃহীরা দ্বৈতবাদ পছন্দ করেন, ত্যাগীরা অদ্বৈতবাদ পছন্দ করেন। গৃহীর জীবনই হচ্ছে দ্বৈতের, স্বামীকে দিয়ে স্ত্রী পূর্ণ, স্ত্রীকে দিয়ে স্বামী পূর্ণ। এজন্যই তার ভগবৎ-সাধনের মূল formula (মন্ত্র) হ'ল,—"ভগবানকে দিয়ে ভক্ত পূর্ণ, ভক্তকে দিয়ে ভগবান্ পূর্ণ, একজনকে ছেড়ে আর একজন অপূর্ণ।" সন্ন্যাসীর জীবন হচ্ছে একক, নিঃসঙ্গ, পরোয়া-বর্জ্জিত, কারো প্রতীক্ষা নেই, কারো অপেক্ষা নেই। তার ঘর-কন্না নিজেকে নিয়েই, বোঝা-পড়া নিজেরই সঙ্গে। এজন্যই তার ভগবৎ-সাধনের মূল formula (মন্ত্র) হ'ল—"কোঽহং ? সোঽহং।"

মা হ'য়ে তুই আয়

শ্রীশ্রীবাবা সন্ধ্যার ট্রেণে দ্বারভাঙ্গা রওনা হইবেন বলিয়া স্থির ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্যায়নে তুষ্ট করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। জ্ঞানবাবুর সহধর্ম্মিণী প্রাণপণে শ্রীশ্রীবাবার সেবা-বিধান করিলেন। কণ্ঠ-লহরীতে দশদিক আলোড়িত করিয়া শ্রীশ্রীবাবা গাহিতে লাগিলেন,—

মা হয়ে তুই আয়,
মা হয়ে তুই আয়।

চিত্ত যেন তোর পরশে
তৃপ্ত হয়ে যায়।
চাইতে যেন মুখের পানে
নয়ন ভাসে অশ্রু-বানে,
ললাট যেন লোটে মা তোর
ঐ চরণ-তলায়।

শুন্‌তে যেন কণ্ঠবাণী
নেচে অধীর হয় পরাণি,
হৃদয় যেন স্নেহের কোলে
নূতন জীবন পায়।

দ্বারভাঙ্গা

১৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯

প্রাতে সাড়ে নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গা আসিয়া পৌছিলেন; প্রসিদ্ধ নার্শারী-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

ভাবের পাগল

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা লছমী-সাগরের পারে বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তর তীরে আসিয়া বসিলেন। দ্বারভাঙ্গার বাঙ্গালী যুবকেরা আসিয়া সৎকথা শুনিবার জন্য ঘিরিয়া বসিলেন। তিনটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষাদান করিলেন।

দীঘীর ঘাটে বসিয়া একটী হিন্দুস্থানী যুবক, বয়স ২৫।২৬ হইবে, পা ধুইতেছিল আর অবিরাম পুরিয়া রাগিণী আলাপ করিয়া যাইতেছিল, তান, কর্ত্তব, মীড়, গমকে যেন সে বাতাস মুখরিত করিতেছিল, স্বর মৃদু, দৃষ্টি অন্যমনস্ক, ভাবভঙ্গী হাবার মত, কিন্তু পা ধোওয়াও তার শেষ হইতেছিল না, গান গাওয়াও তার শেষ হইতেছিল না।

একজন বলিল,—লোকটা পাগল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাগলই যদি হ'য়ে থাকে, তবে জেনো সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি। কিন্তু ভাবের পাগল কজন হয়? অধিকাংশেই ত' অভাবের পাগল। "অমুককে বিয়ে কত্তে চেয়েছিলাম, মেয়েটী আমাকে পছন্দ কর্ল্ল না"—"অনেক খরচ ক'রে ছেলেকে পড়িয়েছিলাম, বৌ ঘরে আনার পর আর ছেলে আমাকে খেতে দেয় না,"—"অনেক টাকা পাব মনে ক'রে জুয়া খেলেছিলাম, এখন সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি,"—এই সব অভাব থেকেই ত' অধিকাংশ লোক পাগল হয়! তেমন পাগল হ'য়ে কোনো লাভ নেই। "তপঃশক্তি সঞ্চয় ক'রে, বিশ্বামিত্রের মত নূতন জগৎ সৃষ্টি কর্ব্ব," অথবা "দধীচির মত পরার্থে অস্থিদান ক'রে নিজের অস্তিত্বের অহমিকা ধূলায় লুটিয়ে দিব," অথবা "দেশ, সমাজ ও জগতের পরমকুশল সাধনের জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে একেবারে নিষ্কিঞ্চন হব,"—এই সব উচ্চ ভাব অন্তরে নিয়ে যদি পাগল হ'তে পার, তবে সে বড় লাভের পাগলামী। এ পাগলামীতে তোমারও লাভ, জগতেরও লাভ। আরো মজার পাগলামি হচ্ছে, যাঁকে ভালবাসলে সবাইকে ভালবাসা হয়, যাঁকে প্রেম-নিবেদন করলে সবার কাছে প্রেম পৌছে, সেই প্রেমস্বরূপ রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপকে ভালবেসে পাগল হ'তে পারলে। প্রকৃতিস্থ লোকের চাইতেও পাগলের যুক্তির জ্ঞান প্রখর থাকে।

লাহেরিয়া-সরাই

১৯ আশ্বিন, ১৩৩৯

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা লাহেরিয়া-সরাই পুলিশ-হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত হিরন্ময় প্রজাপতির গৃহে আসিয়াছেন। বহু ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হইতেছে।

অবিচ্ছেদ স্মরণের কৌশল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁকে ভালবাসা যায়, অধিকাংশ সময়ে তাঁর কথাই স্মৃতিপথে উদিত হয়। ভালবাসা যেন গঁদের আঠা। একবার

যার সাথে যাকে যুক্ত ক'রে দেয়, শত চেষ্টা ক'রেও যদি আঠা মুছে নেবার চেষ্টা করা যায়, তবু একটু জলো হাওয়া বইলেই পুনরায় দুটীকে জু'ড়ে দেয়। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে ভুল্‌তে পারে না, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ক্ষণে ক্ষণে বা অবিরাম তার কথা শুধু মনে পড়্‌তে থাকে। এজন্যই ভগবান্‌কে অবিচ্ছেদ স্মরণ রাখ্‌বার কৌশল হ'ল তাঁকে ভালবাসা।

ভালবাসার কৌশল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আবার, অবিচ্ছেদ স্মরণই তাঁকে ভালবাসার কৌশল। যাঁকে অবিরাম স্মরণ করা যায়, প্রীতি সহকারে হোক বা ক্লেশ সহকারে হোক্, স্মরণ কত্তে কত্তে তাঁর প্রতি ভালবাসা এসে যায়। এজন্য অবিচ্ছেদ তাঁকে স্মরণই হচ্ছে তাঁকে ভালবাসার উৎকৃষ্ট কৌশল। কেউ স্মরণ করে তাঁর কথা শ্রবণের দ্বারা, কেউ স্মরণ করে তাঁর কথা কীর্ত্তনের দ্বারা, কেউ স্মরণ করে তাঁকে মননের দ্বারা। ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ, স্বাধ্যায় আর নাম-কীর্ত্তন সব কিছুরই গৌণ উদ্দেশ্য তাঁকে স্মরণ, মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁকে ভালবাসা।

প্রায় নিস্ফল হরিকথা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাঁর কথা স্মরণে জাগ্রত রইল না অথচ খুব হরিকথা বল্‌ছি, এরূপ হরিকথা এজন্যই প্রায় নিস্ফল। আমি যখন হরিকথা ব'লে লোকের যশ চাই, খ্যাতি-প্রতিপত্তি চাই, শিষ্য-সেবকের সংখ্যাবৃদ্ধি চাই, তখন হরিকথা-কালে হরিস্মরণ না হ'য়ে আমার হয় যশঃ-স্মরণ, খ্যাতি-স্মরণ, শিষ্য-স্মরণ। সুতরাং অনুরাগ হরিতে বর্দ্ধিত না হ'য়ে যশে, খ্যাতিতে, শিষ্যেই বর্দ্ধিত হ'তে থাকে। এজন্যই হরিকথা-কালে হরিস্মরণকেই জাগরূক রাখা কর্ত্তব্য।

যৌগিক বিভূতির বিপদ

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘটক মহাশয় আসিয়া সৎকথায় যোগদান করিলেন।

তাঁহার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটী গল্প শুনুন। একজন রাজা অশ্বারোহণে প্রাতর্ভ্রমণ কচ্ছেন, এমন সময়ে দেখলেন, একটী মুমূর্ষু ব্যক্তি রাস্তার কিনারে প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে নাভিশ্বাস ফেল্‌ছে। বয়স তার পঁচিশ ত্রিশ, সাধারণ ব্যক্তির সন্তান ব'লে মনে হয়। রাজা তখন রাজবৈদ্যকে আদেশ দিলেন এই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে আরোগ্যশালায় নিয়ে যেতে এবং প্রাণপণ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা কত্তে। রাজবৈদ্য রাজাদেশ পালন কর্লেন এবং দীর্ঘকালের চেষ্টায় রুগ্ন যুবক নিরাময় হ'ল। রাজা প্রথমতঃ তাকে ধনাগারের দ্বাররক্ষকের কাজে নিয়োজিত কল্লেন। যুবক মনে মনে ভাবল,—"এই রাজা আমার প্রাণরক্ষা করেছেন, তাঁর কাজে আমার নিরলস কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত থাকা দরকার।" খুব সততার সহিত কাজ করায় রাজা তার এই সামান্য প্রজাটীকে প্রথমতঃ সহকারী ধনাধ্যক্ষ, পরে প্রধান ধনাধ্যক্ষ এবং তৎপরে রাজ-অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ কর্ল্লেন। রাজা দেখেন, তাঁর এই নবনিযুক্ত কর্ম্মচারী খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং মনে মনে ভাবেন—"একেই ভবিষ্যতে আমার সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যাব।" কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশের কিছুদিন পর থেকে কর্ম্মচারীর মনে একটু আধটু ক'রে কামনা-বাসনার শিখা জল্‌তে সুরু হ'ল। কর্ম্মচারী দেখ্‌লে, রাজ-অন্তঃপুরের মহিলারা বড়ই চপলা, চঞ্চলা, বিলাস-ব্যাকুলা এবং প্রার্থীর প্রার্থনা-পূরণ-কুশলা,—যে তাদের প্রতি লালসা করে, তারা সযত্নে তার লালসা-পূরণ এবং লালসা বর্দ্ধন করে। কর্ম্মচারীর চরণ বিপথে চল্‌তে লাগ্‌ল। অবারিত ক্ষমতা হাতে পেয়ে সে একদিকে যেমন ধন-ভাণ্ডারের ধনরত্ন গোপনে গোপনে আত্ম-সুখের প্ররোচনায় ব্যয় কত্তে লাগ্‌ল, তেমনি অপর দিকে প্রভু-পত্নীরা অগম্যা জেনেও তাদের সাথে নানাবিধ অন্যায়াচরণ কত্তে লাগ্‌ল। বাইরে তার বিশ্বস্ততার অন্ত নেই, সে কতই জানি আজ্ঞাবহ, কতই জানি অনুগত, এই ভাণ প্রদর্শন ক'রে সে চল্‌তে লাগ্‌ল। দীর্ঘকাল যায়, এক দিন রাজা এই কর্ম্মচারীকে রাজসভায় ডাক্‌লেন। তারপরে বল্লেন,—"ওহে

ভৃত্য, পশুপক্ষীর ন্যায় অসহায় ভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হবে দেখে আমি তোমাকে মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ প্রদান ক'রেছিলাম। কৃতজ্ঞতার বোধে ক্ষণকালের জন্য তোমার ভিতরে মানুষের মত জীবন ধারণ করার প্রবৃত্তি এসেছিল। তোমার সঙ্কল্পের শুদ্ধতা দেখে আমি তোমাকে প্রথমতঃ কর্‌লাম ধনাগারের রক্ষী, পরে ক্রমশঃ কর্‌লাম ধনাধ্যক্ষ। দেখ্‌লাম্‌, তুমি কর্ত্তব্যনিষ্ঠই রয়েছ, মদোন্মত্ততা তোমার আসে নি. পদগর্ব্বিত তুমি হও নি। তখন তোমাকে অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধায়ক কর্‌লাম। কিন্তু এ অন্তঃপুর আমার আসল অন্তঃপুর নয়, এটী হচ্ছে মায়ার পুরী, এর পুরবাসিনীরা সব মায়ানারী, এদের কারো কোনো দেহ নেই, অথচ তুমি এদের সঙ্গ ক'রে মনে মনে ভাব্‌ছ যে, তুমি দিব্যি আরামে নারীসঙ্গ কচ্ছ। তুমি ভুলে গেলে যে, আমার রমণী ব'লেই এদের সঙ্গ তোমার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, কিন্তু লালসার জাল সৃষ্টি ক'রে সেই জালে তুমি নিজেই জড়িয়ে পড়্‌লে এবং জগতের যত অনাচার যত কদাচার এদের সাথে অনুষ্ঠান কত্তে লাগ্‌লে। তুমি ভাব্‌লে, আমি কিছুই জানি নি, আমি কিছুই দেখিনি। কিন্তু প্রতিদিন আমি তোমার প্রত্যেকটী কার্য্য দেখে এসেছি;—এই রাজসভাতে যেমন আমার দুইটী চক্ষু সকলকে দেখ্‌ছে, তোমার কুকার্য্যানুষ্ঠানের স্থানেও দিবারাত্রি আমার তেমন দুইটী চক্ষু সর্ব্বদা খোলা রয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজ কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে পার, তবে তোমাকে আমার সিংহাসনে বসাব। কিন্তু তুমি ত' তা করনি! তাই আজ থেকে তোমার অন্তঃপুর তত্ত্বাবধানের চাকুরী গেল, ধনাধ্যক্ষের চাকুরী গেল, এখন আর তুমি দ্বারপাল থাকবারও উপযুক্ত নও, সুতরাং তোমার পূর্ব্বপদোচিত পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ এখানেই খুলে রেখে যাও পুনরায় সেই রাস্তারই ধারে, যেখান থেকে আমি তোমাকে একদিন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম।"

গল্পটী শেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ব্যক্তি হ'ল সাধারণ জীব, এই রাজা হলেন ভগবান, এই ধনাগার হ'ল শুক্রভাণ্ডার, এই অন্তঃপুর

হ'ল যৌগিক উপলব্ধি সমূহ, এই অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা হ'ল যৌগিক বিভূতিসমূহ। শুক্রধারণের ফলে যৌগিক উপলব্ধিসমূহ জন্মে, কিন্তু কত সাধক-পুরুষ ক্ষমতা-মদে নিজ কর্ত্তব্য ভুলে যায়, শেষে পরম লক্ষ্য ভুলে গিয়ে বিভূতি-বিকাশ নিয়ে প্রমত্ত হয়, ফলে তার লভ্য হয় "পুনর্মূষিকো ভব।" বিভূতির চতুরালি দেখে যে টলেনা, প্রকৃত ভগবদ্-ভক্তি তারই লাভ হয়। জগতে সেই প্রকৃত সিদ্ধ মানব, ধন্য পুরুষ।

নিষ্পাপ লোভ

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধনলোভও লোভ, যৌগিক বিভূতির লোভও লোভ। উভয়বিধ লোভই সাধকের পরম ক্ষতি-সাধক। হৃদয়ে লোভোত্তেজনা প্রবল হ'লে চক্ষুষ্মানও অন্ধ হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিও মূর্খবৎ আচরণ করে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ইতর ব্যবহারে কুণ্ঠিত হয় না, সত্যবান্ পুরুষও অসত্যের আশ্রয় নেয়, ধর্ম্মশীলও অধর্ম্মের অনুশীলন করে। সুতরাং স্বর্ণ-রৌপ্যাদি-সমন্বিত ঐশ্বর্য্যই হোক্ আর অনিমা-লঘিমাদি-সমন্বিত ঐশ্বর্য্যই হোক্, উভয় সম্পর্কেই লোভ বর্জ্জনীয়। জগতে মাত্র এক প্রকারের লোভ আছে, যা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। সেই লোভ হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের লোভ।

লাহেরিয়া-সরাই
২০শে আশ্বিন,১৩৩৯

কোন্ পদ্ধতির উপাসনা সহজ

ভগবৎ-সাধন বিষয়ে কথা উঠিতে নিরাকার ভাবে উপাসনা সহজ না সাকার ভাবে উপাসনা সহজ, এই প্রসঙ্গ হইতে লাগিল।

উপস্থিত সজ্জনেরা নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,— অনেকেরই মত এই যে, নিরাকার ভাবে উপাসনা কঠিন, সাকার ভাবে উপাসনাই সহজ। কিন্তু এ কথাটা সর্ব্বজনীন সত্য নয়। নিরাকার তত্ত্ব নিয়ে আবাল্য যে উপদেশ শ্রবণ করেছে, অথবা পূর্ণ-বয়সেও যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধ'রে ভগবানের নিরাকার-সর্ব্বব্যাপিত্বের

বিষয় নিয়ে একাগ্র ভাবে আলোচনা করেছে, তার পক্ষে নিরাকার ভাবে উপাসনা কঠিন হয় না। অধিকাংশ লোকেই যে বলে,—"সাকার উপাসনা সহজ,"—তার প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ লোকই সাকার উপাসনার অনুকূলে আবাল্য চিন্তা ক'রে এসেছে এবং চতুর্দ্দিকের আব-হাওয়া তার এই চিন্তাকে পরিপুষ্ট করেছে। যে যেমন ভাবে আবাল্য উপদেশ পায়, যে যেমন ভাবে দীর্ঘকাল চিন্তা-পরিচালন করে, তার পক্ষে সেই ভাবেই ভগবৎ-সাধন সহজ হয়।

সাকার উপাসনাও সহজ নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মুখে আমরা সবাই বল্‌ছি বটে যে, সাকার উপাসনা খুব সহজ, কিন্তু কি বহিরঙ্গ ভাবে কি অন্তরঙ্গ ভাবে দেখতে গেলে বুঝা যাবে যে, সাকার উপাসনাও নিতান্ত সহজ নয়। দুর্গা-পূজার অনুষ্ঠান কত্তে যে সকল বহিরঙ্গ আয়োজন শাস্ত্র-বিধানানুযায়ী আবশ্যক, তার সবগুলিই সব সময়ে করা সহজ কথা নয়। লগ্নের একচুল গোল হ'লে কার্য্য অশুদ্ধ হবে। কত দ্রব্য মিলে না, অনুকল্প দিয়ে চালাতে হয়। কিন্তু অনুকল্প দিতে গেলে আবার কার্য্য অসম্পূর্ণ হবে। পূজার যে সময়ে যে রাগ অবলম্বন ক'রে বাদ্যাদি হওয়ার বিধান, তা ত' কোথাও হ'তে দেখা যায় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে নির্দ্দিষ্ট রাগ অবলম্বন ক'রে বাদ্যাদি হ'ল না বা হ'তে পাল্ল না, এতে কি পূজা অসম্পূর্ণ হ'ল না? আবার যেখানে বাদ্যকর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাগ বাজিয়ে গেল, সেখানেও রাগের বিকাশ ঠিক্ সঙ্গীত-শাস্ত্র-মত হ'ল কি না, তা কে খোঁজ ক'রে দেখে? ভৈরব-রাগ বিকাশ কত্তে গিয়ে যদি একটী বার গান্ধার কোমলে প'ড়ে গেল, তা হ'লেই ত' ভৈরবের দফা রফা। আবার দেখুন, শাস্ত্রে আছে, মন্ত্রগুলি সঠিক ভাবে উচ্চারিত হওয়া চাই। কিন্তু দেশে ক'জন লোক আছে যে, মন্ত্রোচ্চারণ বিশুদ্ধ ভাবে কত্তে পারে? আবার অন্তরঙ্গ ভাবে দেখুন, মন্ত্রের অর্থ না বু'ঝে মন্ত্রোচ্চারণ শাস্ত্র-বিধি নয়। এত পূজার্চ্চনা ত' করা হ'য়ে থাকে, কিন্তু অর্থ বু'ঝে মন্ত্রপাঠ কয়টী স্থানে

হয়? সুতরাং পূজা অসম্পূর্ণ হ'ল। আবার দেখুন, প্রত্যেক দেবতার নির্দ্দিষ্ট এক একটী ধ্যান আছে। ধ্যান সাকার উপাসনারও অঙ্গ। একে বাদ দেবার উপায় নেই। কিন্তু এই ত' আমাকে চখের সাম্‌নে দেখ্‌ছেন কিন্তু চোখ বুজে এই আমার সামনেই আমার ধ্যানটা করুন দেখি, ঠিক্ ঠিক্ সব চিত্র চখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় কি না? চ'খ বুজে ধ্যান কত্তে ব'সে যদি আমার মুখটা আপনি ঠিক্‌ই দেখ্‌তে পান, তবে হয়ত নাকটা পূরাপূরি দেখ্‌তে পাবেন না, মাথা স্পষ্ট দেখ্‌বেন ত' বক্ষ দেখ্‌তে পাবেন না, আবার যা এখনি দেখ্‌ছেন ক্ষণ-পরে তা স্মরণে থাকৃছে না, ভিন্ন অঙ্গে মন সন্নিবিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। জীবন্ত একটা মানুষ দেখেই ধ্যান জমাতে এত কষ্ট। আর, কোনও একটী দেবতার, ধরুণ কালীমাতার, একরূপ মূর্ত্তি দেখেছেন বটতলার ছবিতে, আর এক রকম মূর্ত্তি দেখেছেন কালীঘাটের পটে, আর এক রকমের মূর্ত্তি দেখেছেন আর্টস্কুলের গ্যালারীতে, আর এক রকমের মূর্ত্তি দেখেছেন জয়পুরের প্রতাপাদিত্যের ঠাকুরবাড়ীতে, আর এক রকম মূর্ত্তি দেখেছেন উমানাথ ঘোষালের যাত্রাগানের পালা শোন্‌বার সময়ে অভিনেতার পরিগৃহীত সাজে। কোন্ মূর্ত্তিটী থেকে চখটী নেবেন, কোন্ মূর্ত্তিটী থেকে জিভটী নেবেন, কোন্ মূর্ত্তিটী থেকে বাহুটী নেবেন, কোন্ মূর্ত্তিটী থেকে চরণ দুটী নেবেন, বলুন ত? ধ্যান কত্তে ব'সে একবার এই রকমের কালী, আর একবার ঐরকমের কালী মনে হ'তে থাকৃবে। সুতরাং সাকার উপাসনাও বড় সহজ উপাসনা নয়। যে প্রাণপণে অভ্যাস করে, সেই পারে, যার তীব্র অধ্যবসায় নেই, সাকার উপাসনা তার পক্ষে সহজ হয় না।

কবি-প্রকৃতি ও দার্শনিক--প্রকৃতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোকের ভাবমুগ্ধতা বেশী, প্রকৃতি তাদের কবির, যুক্তি দিয়ে যেখানে কিছু পাবে না, কল্পনার বলে সেখানে একটী সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য তারা উপভোগ করে। এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ সাকারবাদী হয়। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা স্বভাবতঃ যুক্তিনির্ভর, বাস্তব-পক্ষ-

পাতী, সহজ বিচারে যেখানে যতটুকু বোঝে, ততটুকু স্বীকার করে, যেটুকু যুক্তির দ্বারা বুঝ্‌তে পারে না, তাকে কল্পনার বলে বু'ঝে নিতে চেষ্টা করে না,—এই শ্রেণীর দার্শনিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সাধারণতঃ নিরাকারবাদী হয়। কিন্তু তার জন্য এমন কথা বলা চলে না যে, সাকার উপাসনা সহজ, আর নিরাকার উপাসনা কঠিন। ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে নিরাকার উপাসনা সহজ, সাকার উপাসনাই কঠিন।

উপাসনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াই আবশ্যক

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাকার উপাসনা ভাল কি নিরাকার উপাসনা ভাল, এই কথা নিয়ে আমরা তর্কবিচারে বহু মূল্যবান্ সময় ক্ষেপণ ক'রে থাকি। কিন্তু উপাসনা কেউ করিনা। কেউ হয়ত নিজেকে সাকারবাদী বলি এবং পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠানও করি, কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠানের আসল কাজটুকু যেখানে, সেইখানে বড় ফাঁকিবাজীটাই করি। কেউ হয়ত নিজেকে নিরাকার-বাদী বলি এবং নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক গ্রন্থও লিখি, বক্তৃতাও দেই, তর্কও করি কিন্তু উপাসনায় মনোনিবেশ করিনা। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তা সম্পূর্ণ নির্ভর কচ্ছে, যে কর্ব্বে, তার মনের গঠনের উপরে। অতএব ভাল-মন্দের তর্ককে একেবারে গৌণ ক'রে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের যথাভিমত উপাসনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াই একান্ত আবশ্যক।

গুরুবাদ

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা লাহেরিয়া-সরাই হইতে দ্বারভাঙ্গা আসিতেছেন। সঙ্গিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—দেখ, সাকার-বাদ আর নিরাকার-বাদ নিয়ে যেমন ভারতের সকল ধর্ম্মালোচনাকারীদের এক বিষম সংশয়, গুরুবাদ নিয়েও ঠিক্ তাই। গুরু প্রয়োজন কি নিষ্প্রয়োজন, গুরু আর পরমেশ্বর এক কিনা, গুরু আর গুরুদত্ত মন্ত্র এক কিনা, গুরু-সেবা কর্ল্লেই সাধন-ভজনের চূড়ান্ত হ'য়ে গেল কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নে প্রত্যেকের মন সমাকুল। এ বিষয়ে অতীতকালের পূজ্যপাদ আচার্য্যেরা এক এক

জন এক এক রকম উপদেশ দিয়ে গেছেন। সেই সব যুগের প্রাচীন উপদেশ বর্ত্তমান যুগেও প্রযোজ্য কিনা, এসব সংশয় লোকের বড় বিষম সংশয়।

অখণ্ড-গুরুবাদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই সব বিষয় নিয়ে সাধকদের যে সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত যেরূপ হ'য়ে থাকুক না কেন, তোমাদের গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত আমি তোমাদের স্পষ্ট ক'রে শুনিয়ে রাখছি। সাধন দিয়ে যদি তোমরা জীবের উপকার কত্তে চাও, নিজের ভিতরে সাধন-বল উপলব্ধি করলে এবং নামের চরণে তোমাদের পূর্ণ আনুগত্য এলে, অনায়াসে তা ক'রো। কিন্তু নিজেদের ভিতরে গুপ্ত অভিমান পোষণ কত্তে পারবে না। তোমারও যিনি গুরু, দীক্ষাপ্রাপ্তেরও তিনিই গুরু হবেন, অর্থাৎ পরমমঙ্গলনিলয় শ্রীভগবানকেই গুরু ব'লে জান্‌তে হবে এবং জানাতে হবে, মান্‌তে হবে এবং মানাতে হবে, বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে, বল্‌তে হবে এবং বলাতে হবে, ভাবতে হবে এবং ভাবাতে হবে, প্রচার কত্তে হবে এবং প্রচার করাতে হবে। জগতে আর কেউ গুরু নন। নরবপুধারী জীব-কল্যাণকারী মহতেরা কেউ পুরুষ-দেহে, কেউ বা নারী-দেহে অখণ্ডকে তার সাধনপথের পাথেয় অল্প কিম্বা অধিক দিতে পারেন, কারো কারো বা আধ্যাত্মিক ঋণ হয়ত হবে আবক্ষ আকণ্ঠ আমস্তক, কিন্তু অখণ্ডের গুরু-নিষ্ঠা তাঁদের কারো উপরে হবে না, তার সমগ্র প্রাণের সকল নিষ্ঠা একমাত্র শ্রীভগবানেরই চরণে। তোমরা নিজদিগকে একমাত্র তাঁরই শিষ্য ব'লে মনে কর, তোমাদের দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তিদিগকেও তাঁরই শিষ্য ব'লে গণনা কর এবং গণনা করাও। ভগবান্‌কে সম্যক্ বোধে আন্‌তে যখন না পারো, তখন তাঁর সাক্ষাৎ নাদাত্মক বিগ্রহ অখণ্ড-নামকেই গুরু ব'লে জান্‌বে এবং যখন তাতেও একান্ত অক্ষম হবে, তখন তোমাদের আদি-গুরুকেই সকলের গুরু ব'লে জ্ঞান করবে, দীক্ষাদাতা-দীক্ষিত নির্ব্বিশেষে আর সকলে পরস্পর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-বিশেষে গুরুভ্রাতা মাত্র থাকবে।

ব্যক্তিগত গুরুবাদের উচ্ছেদ

একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ সিদ্ধান্ত দেশ-প্রচলিত বর্ত্তমান বহু মতামতের সঙ্গেই এক নয়। এইজন্য তোমাদের নিষ্ঠা আরোপে ক্লেশ

হ'তে পারে। দেশকালের প্রভাব অতিক্রম করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব দেখি না। তারই জন্ম আমি নিজেকে "গুরু নই" জেনেও তোমাদের গুরু ব'লে অঙ্গীকার ক'রে নিচ্ছি। এই অঙ্গীকার করার মানে এই যে, আমি গুরু হ'লে তোমাদের পক্ষে আমার আদেশ অলঙ্ঘনীয় হবে, তোমরা আমার আদেশ পালনে বল পাবে,—এবং তার পরেই আমি আদেশ কচ্ছি যে, আমার সাধন-মণ্ডলীতে এর পরে তোমাদের মধ্যে কেউ কারো ব্যক্তিগত গুরু হ'তে পার্কে না। একজন আদি-গুরুর প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ ক'রে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপে তোমরা জীবকুলের আধ্যাত্মিক কুশল সম্পাদন কর্ব্বে এবং দীক্ষা কাউকে একক দেবে না। পুরুষ-পরম্পরাক্রমে দীক্ষা একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিধান মে'নে চল্‌বে, যাতে ব্যক্তিগত গুরুবাদ কিছুতেই না প্রশ্রয় পায়। দীক্ষা পাবে লক্ষ লক্ষ লোক, কিন্তু গুরু হবেন না একজন দীক্ষাদাতাও।

দ্বারভাঙ্গা
২১শে আশ্বিন, ১৩৩৯

আজ মহাষ্টমীর দিন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আজকের দিন ছাগ-বলির পক্ষে প্রশস্ত।

শ্রীশ্রীবাবার জনৈক ভক্ত যুবক বলিলেন,— ছাগ ত' বলির জন্ম প্রস্তুত হয়েই আছে, চলুন লছমী-সাগরের তীরে।

বলি হওয়ার মানে

লছমী-সাগরের তীরে শ্রীশ্রীবাবা তিনটী যুবককে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে বলিলেন,—বাল শব্দের মানে হচ্ছে, আত্মসমর্পণ। "হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর, আজ থেকে আমি আমাকে তোমার পায়ে স'পে দিলাম, তুমি আমাকে তোমার ক'রে নিয়ে তোমার প্রয়োজনে তোমার প্রিয়-কার্য্য সাধনে নিয়োজিত কর",—অন্তরে এই ভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার নামই হচ্ছে বলি হওয়া।

দ্বারভাঙ্গা,
২২শে আশ্বিন, ১৩৩২

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গার চারিটী যুবককে দীক্ষাদান করিলেন। দীক্ষাদানান্তে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ভগবদুপাসনায় তুমিই লাভবান্ হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তুমি যখন মঙ্গলময় ভগবানের উপাসনা কর, তখন তাতে তাঁর কিছু লাভক্ষতি ঘটে না। লাভ ষোল আনা তোমারই জান্‌বে। তিনি চিরকাল যা ছিলেন, চিরকাল তাই থাক্‌বেন, এর কখনও ব্যত্যয় হবে না। কিন্তু তুমি তাঁকে উপাসনা ক'রে নিজে সকল অকল্যাণের হস্ত থেকে মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পবিত্র হও, শক্তিশালী হও, হৃষ্টচিত্ত হও। তাঁকে ভজনা ক'রে তোমারই লাভ।

সকাম উপাসনা ও নিষ্কাম উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তোমার লাভকে লক্ষ্য রে'খে যখন তুমি তাঁর উপাসনা কর, তখন তুমি থাক নিম্নস্তরের সাধক। আর তাঁর প্রীতিকে লক্ষ্য ক'রে যখন তুমি তাঁর উপাসনা কর, তখন তুমি হও উচ্চস্তরের সাধক। নিজের প্রীতির জন্য নিজের কুশলের জন্য তাঁকে ডাকা, আর তাঁর প্রীতির জন্য তাঁর তৃপ্তির জন্য তাঁকে ডাকা, সমান কথা নয়। একটাতে সাত্ত্বিক স্বার্থ থাকে, অপরটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। সাংসারিক উন্নতির জন্য ভগবানকে ডাকার চেয়ে আত্মিক উন্নতির জন্য তাঁকে ডাকা উৎকৃষ্ট। আত্মিক উন্নতির জন্য তাঁকে ডাকার চেয়েও তাঁর প্রীতি-সাধনের জন্য তাঁর চরণে সম্যক্ আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে, তাঁকে ডাকা আরও উৎকৃষ্ট। যে যে-ভাবে পার, তাঁকে ডেকে যাও। তুমি যখন তোমার কুশলের জন্য তাঁকে ডাক, তখন তিনি প্রীতও হন না, অপ্রীতও হন না, কিন্তু তোমাকে সাধনের ফলস্বরূপে উন্নত অবস্থা সমূহ দান করেন। তুমি যখন তাঁর প্রীতির জন্য তাঁকে ডাক, তখন তিনি প্রীতি-অপ্রীতির অতীত

হয়েও স্বীয় প্রেমময় স্বভাবের বশে তোমাতে প্রীত হন এবং সাধনের অপ্রাপ্য শুদ্ধাভক্তি দান করেন। যখন যে ভাবে পার, তাঁকে ডেকে কৃতার্থ হও। উচ্চাধিকারে বা নিম্নাধিকারে যখন যেখানে অবস্থান কর, তাঁর পবিত্র নাম বাবা ভুলো না।

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে নৈশ ভোজন সমাপন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার সুমধুর কণ্ঠোত্থিত ধর্ম্ম-সঙ্গীতে গৃহ আলোড়িত হইতে লাগিল।

দ্বারভাঙ্গা,

২৩শে আশ্বিন, ১৩৩৯

চেষ্টা রাখো অতন্দ্রিত

দ্বারভাঙ্গা সহরে উড়িষ্যার কোনও এক সামন্ত রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী "প্রিন্স পিপ্‌ল্ কোম্পানী" নামে একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া ধনীর ধনসাম্য বিধান করিয়া দরিদ্র জনসাধারণকে তাহার লভ্যাংশের ভাগী করা। এই প্রতিষ্ঠান শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা আমন্ত্রণ রক্ষার্থে বেলা দশ ঘটিকায় এই প্রতিষ্ঠানে আসিলেন।

মন্ত্রী সাহেব ছাড়া আর কেহ বাংলা জানেন না। সম্বর্দ্ধনার বিনিময়ে শ্রীশ্রীবাবা সকলকে সুমধুর সঙ্গীত-যোগে উপদেশ শ্রবণ করাইতে লাগিলেন, মন্ত্রী সাহেব হিন্দীতে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া করিয়া সকলকে বুঝাইতে থাকিলেন।

আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবার মধুময় উপদেশ আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। লক্ষ্য রাখো মহৎ, সঙ্কল্প রাখো পবিত্র, চেষ্টা রাখো অতন্দ্রিত, অনলস অবিরাম প্রয়াসে জীবহিত ও আত্মোপলব্ধির পানে অগ্রসর হও, পরম চিত্তশুদ্ধির পথে তোমার সাফল্য

হবেই হবে, বহির্ম্মুখ কর্ম্মের গতি যাই হোক্ তোমার বিনাশের কোনো আশঙ্কা নেই।

সাধকদের মধ্যে কলহ নাই

সায়ংকালে শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দ্বারভাঙ্গার তিনটী যুবক এখানে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—সাধকের বাঙ্গালী-বিহারী নেই, কালো-সাদা নেই, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নেই। যত কলহ অসাধকের, যত দ্বন্দ্ব ভজনহীন সাধনহীন বহির্ম্মুখ জীবদের। সাধন ক'রে তোমরা অন্তর্ম্মুখ হও; যে সাধন করে, তাকেই প্রিয় ব'লে জানো, তারই সঙ্গ কর, তার সঙ্গ হ'তে নিজের অধ্যাত্মিক প্রেরণা সংগ্রহ কর, নিজের সঙ্গ দিয়ে তার আধ্যাত্মিক প্রেরণা বর্দ্ধন কর। জগতে বেঁচেই যদি থাকৃতে হয়, মানুষের মত বাঁচ, স্বার্থপর কুক্কুরের মত নয়। নিজে ভগবানের নামে মাতো, আর জগৎকে এই নামে মাতাও। নিষ্ঠা, সংযম এবং একাগ্রতা দিয়ে সাধক-জীবনের উৎকৃষ্ট অবস্থা সমূহ আয়ত্ত কর। তা'হলেই সহজে সকল কলহ-কোলাহল বিদূরিত হবে।

২৪শে আশ্বিন,
১৩৩৯

অদ্য প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গা শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ হইতে লাহেরিয়া-সরাই ডাক্তার প্রজাপতির গৃহে আসিয়াছেন। যে কয়টা দিন শ্রীশ্রীবাবা এ অঞ্চলে আসিয়াছেন, সর্ব্বত্রই এক আনন্দের প্রস্রবণ বহিয়া চলিতেছে। যুবকদের মনে ধর্ম্ম-ভাবের নব উদ্দীপনা, প্রৌঢ় বৃদ্ধেরা শোনেন মধুর ধর্ম্মকথা, স্ত্রীপুরুষ সকলে শোনেন মধুরতর ধর্ম্মসঙ্গীত।

ভালবাসা জীবের সহজাত

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘটকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভালবাসাই জীব জনমের পরম পুরুষার্থ, চরম

সার্থকতা। একটী বিদ্যাই তার সহজাত, সেটী হচ্ছে ভালবাসার বিদ্যা। একটী বিদ্যাই হচ্ছে তার শিক্ষণীয়, সেটী হচ্ছে ভালবাসার বিদ্যা। তার রক্তমাংস থেকে সুরু ক'রে মন, প্রাণ, আত্মা সকলেরই একটী মাত্র অফুরন্ত পিপাসা। সে পিপাসা হচ্ছে ভালবাসার পিপাসা।

ভালবাসার আধার

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু এ ভালবাসার আধার কোথায়? যত আধারেই একে রক্ষা করা যাক্, আধার ছোট হ'য়ে যায়, ভালবাসার স্রোত উপচে উ'ঠে গড়িয়ে প'ড়ে যায়, সবটুকু ভালবাসাকে ধ'রে রাখ্‌বার পাত্র মিলে না। এখানেই ভালবাসার ব্যর্থতা। কিন্তু ভালবাসা যেমন অফুরন্ত, অনন্ত আধার শ্রীভগবান্ যখন হন সেই ভালবাসার অর্পণ-পাত্র, তখন ভালবাসা নিজকে সম্যক্ সমর্পণ ক'রে কৃতার্থ হয়ে যায়। এই জন্যই ভগবানকে বলা হয় প্রেম-রস-বিগ্রহ।

জাতি দুইটী

মেডিকেল স্কুলের প্যাথলজির অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জাতিভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শারীরিক ভাবে জগতে জাতি দুটি, একটী স্ত্রীজাতি, একটি পুরুষ জাতি। সকল দেশের সকল যুগের সকল বর্ণের পুরুষই এমন এক বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত, সকল দেশের সকল যুগের সকল বর্ণের নারীই এমন এক বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত, যাতে দেশ-গোত্রাদির পরিচয় না জান্‌লেও একজনকে সকলেই অনায়াসে পুরুষ ব'লে চিন্‌তে পারবে, অপর জনকে সকলেই অনায়াসে স্ত্রী ব'লে চিন্‌তে পারবে। আর্থিক হিসাবে জগতে জাতি দুটী,—একটী প্রপীড়িত দরিদ্রের দল, অপরটি প্রপীড়ক ধনিকের দল। ধার্ম্মিক ভাবে জগতে জাতি দুটী, একটী হচ্ছে মুক্ত-পুরুষের দল, অপরটী হচ্ছে বদ্ধজীবের দল। আমরা যে শত শত জাতির কল্পনা করি, সে হচ্ছে আমাদের ভেদ-বুদ্ধির ফল।

ভেদ-বুদ্ধির দাওয়াই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান্‌কে আপন ব'লে জান্‌লে আর ভেদবুদ্ধি থাকেনা, তাঁর জীব সকলকেই আপন ব'লে মনে হয়। পেটব্যথার দাওয়াই যেমন Tincture Nux, ভেদবুদ্ধির দাওয়াই তেমন ভগবানকে ভালবাসা।

সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় দ্বারভাঙ্গা হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীল সেন মহাশয় তাঁহার মটরকার পাঠাইয়া দিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবাকে সেখানে যাইতেই হইবে। শ্রীশ্রীবাবা ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে অর্দ্ধঘণ্টাকাল সৎপ্রসঙ্গ করিয়া দ্বারভাঙ্গা রওনা হইলেন।

পর-সেবার্থে আত্ম-পালন কর

ডাক্তার সেন দ্বারভাঙ্গার একজন প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার গৃহে আসিতেছেন শুনিয়া কতিপয় বিশিষ্ট-ব্যক্তি এবং রাজ হাসপাতালের বহু কম্পাউণ্ডার সৎকথা শুনিতে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—আত্মসুখকে প্রাধান্য দিতে গেলেই হৃদয়ের দয়া-বৃত্তি খর্ব্ব হবে, পরের দুঃখে ব্যথানুভবে বাধা জন্মাবে। ভগবানের সৃষ্ট জীবের প্রতি যে দয়াশীল, ভগবানের সান্নিধ্যে সে সহজে পৌছে। আত্মপালন কত্তে হয়, পর-সেবার্থেই তা কর। তাহ'লেই স্বার্থবুদ্ধি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে।

পর-সেবা ও আত্মসেবা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"পর-সেবা" কথাটারও মানে তলিয়ে বুঝ্‌তে হবে। তুমি ছাড়া জগতে আর যত লোক আছে, তারা তোমার পর। সুতরাং তাদের সেবা হবে পর-সেবা। তুমি যাদের আপন ব'লে মনে কর যথা,—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার,—তাদের সেবা করাও আত্মসেবাই হবে। কিন্তু তুমি যখন পরসেবার্থেই নিজের তনুধারণ কর, পরসেবার্থে প্রস্তুত করার জন্যই স্ত্রীপুত্র পরিবারের সেবা কর, তখন আত্মসেবা ও পরসেবা এক কথা হ'য়ে যায়। তখন আত্মীয় প্রতিপালনেও পরসেবাই হয়। নিজের স্বার্থের

জন্য না রেখে জীবনকে বিশ্বজীবের স্বার্থের জন্য রাখাই হচ্ছে পরসেবার পরিণত অবস্থা।

প্রকৃষ্ট পরসেবা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু "পর" কথাটার আরও গভীর আরও উন্নত মানে আছে। "পর" শব্দের আর এক মানে হচ্ছে "পরম", যার চেয়ে বড় কেউ নেই, শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। অর্থাৎ পরাৎ-পরের সেবাই হচ্ছে পরসেবা, ভগবানের সেবাই হচ্ছে পরসেবা। ভগবানের সেবার জন্য যে নিজেকে রক্ষা করে, সে ভগবানের সেবাই করে। ভগবানের সেবার জন্য যে পরিবারবর্গকে পালন করে, সে ভগবানেরই সেবা করে। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে যে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেয়, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দেয়, রুগ্নকে ঔষধ দেয়, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয়, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেয়, অমানীকে মান দেয়, ভীতিগ্রস্তকে অভয় দেয়, সে ভগবানেরই সেবা করে। পরাৎ-পর পরমেশ্বরের সেবাই প্রকৃত পরসেবা। যে সর্ব্বতোভাবে কায়মনো-বাক্যে-চেষ্টায়-চিন্তায়-আচরণে তাঁর সেবা করে, সেই প্রকৃত পরসেবী।

চিরস্মৃতির ব্রত

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—প্রলোভনময় এই ভোগের সংসারে ভোগায়তন দেহ নিয়ে বাস ক'রে পরাৎপর পরমেশ্বরের সেবার কথা সর্ব্বদা স্মৃতিতে জাগরূক রাখা এক অতীব দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু দুরূহ ব'লেই, এই স্মৃতি-ব্রত যে উদ্‌যাপন কত্তে পারে, তার অত প্রশংসা। নিজ রসনায় সন্দেশের আস্বাদন কচ্ছ, কারণ শরীর-পোষণার্থে খাদ্য-রূপে সন্দেশের উপযোগিতা আছে, কিন্তু এই আস্বাদ-সুখ তোমার নিজের নয়, দেহের জন্য সন্দেশ গ্রহণ ক'রেও ভগবানের জন্য তুমি স্বাদটুকু অর্পণ কচ্ছ,—এ সাধনা সাধারণ সাধনা নয়। ভোগায়তন দেহ আছে, ভোগ্যবস্তু সমূহ চতুর্দ্দিকে পরিকীর্ণ হয়ে আছে, শরীর-যাত্রা ও লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কোনও বস্তু তোমাকে গ্রহণ কত্তে হচ্ছে, কোনও বস্তু তোমাকে বর্জ্জন কত্তে হচ্ছে, কিন্তু গ্রহণ-জনিত তৃপ্তি ও

অগ্রহণ-জনিত ক্ষোভ কিছুই তোমাকে স্পর্শ কত্তে সমর্থ হবে না,—তবে হ'লে তুমি প্রকৃত স্মৃতিব্রতী পুরুষ। গ্রহণ-জনিত তৃপ্তিও তাঁর, অগ্রহণ-জনিত অতৃপ্তিও তাঁর, তুমি তাঁর প্রয়োজনে নিজেকে তাঁর কাজে অনুক্ষণ লাগিয়ে রাখ্‌ছ মাত্র, এর অধিক আর তোমার করণীয় নেই। তুমি যে সর্ব্বতোভাবে তাঁর, তোমার প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য যে তাঁরই প্রীত্যর্থে, তোমার রতি ও বিরতি, শ্রম ও বিশ্রাম ,কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য, অনুরাগ ও বিরাগ, উঠা ও নামা, ডোবা ও ভাসা সব-কিছু একমাত্র যে তাঁর নয়নে নয়ন রে'খে, একথা সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রাখা চাই। এই চিরস্মৃতির ব্রতই হচ্ছে সর্ব্বোত্তম ব্রত।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা একটি পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন।

২৫শে আশ্বিন,
১৩৩৯

গতকল্য শ্রীশ্রীবাবা ডাঃ সেনের কন্যা শ্রীমতী মিনতিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। অদ্য প্রাতে শুনা গেল যে, শ্রীমতী মিনতি রজনীযোগে এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক-ভাবপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং তজ্জন্য ভাবাবেশে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন।

দীক্ষান্তিক স্বপ্নের অর্থ

শ্রীশ্রীবাবা গভীর মনোযোগের সহিত সমগ্র স্বপ্নের বিবরণ শ্রবণ করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—দীক্ষার পরে গৃহীত সাধনের অনুকূল নানা আধ্যাত্মিক ভাব-পরিপূর্ণ স্বপ্ন দেখা দ্বারা দুটি বিষয় সূচিত হয়। একটি হচ্ছে এই যে, দীক্ষা-গ্রহণকারী গভীর একাগ্রতা নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। আর একটি হচ্ছে, ভবিষ্যতের সাধন-জীবনের উন্নতি সম্পর্কে পূর্ব্বাভাস।

স্বপ্নযোগে সংস্কার-ক্ষয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাউকে কাউকে দেখা যায় যে, দীক্ষা নিয়েছেন এক রকম, কিন্তু স্বপ্ন দেখ্‌ছেন আর এক রকম। স্বপ্ন অবশ্য ধর্ম্ম-বিষয় অবলম্বন ক'রেই হচ্ছে, কিন্তু দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনের প্রকরণ হচ্ছে এক,

অথচ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে অন্য প্রকরণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন ধর, একজন পেয়েছে ব্রহ্মমন্ত্র, জপ কচ্ছে ব্রহ্মমন্ত্র, কিন্তু স্বপ্ন দেখ্‌ল হর-পার্ব্বতীর বিবাহ বা দেবাসুরের সংগ্রাম। এসব স্থলে বুঝ্‌তে হবে যে, তার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কালের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সকল প্রচ্ছন্ন সংস্কারগুলি আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ ক'রে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সাধনে যদি নিষ্ঠা না টুটে, তাহ'লে এভাবে স্বপ্নযোগে সাধকদের বহু সংস্কার কেটে যায়।

কুপ্রবৃত্তি দমন অসম্ভব নহে

বেলা সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা প্রাতঃ-স্নানান্তে শ্রীযুক্ত রাম বাবুর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন এবং একটী শিবমন্দিরের নিকট আসিয়া বসিলেন। সাত জন দীক্ষার্থী যুবক দীক্ষা গ্রহণ করিল।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিতে লাগিলেন,—লোকে মনে করে যে কুপ্রবৃত্তি দমন অসম্ভব, কাম-ক্রোধাদির সংযম অসম্ভব, ঈর্ষা-বিদ্বেষের হাত অতিক্রম করা অসম্ভব। অসম্ভব বাবা এদের একটাও নয়, কিন্তু ঠিক্ পথটী জানা চাই। এ সব কুপ্রবৃত্তি ভগবানই সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং এদের দমনের জন্য ভগবানেরই শরণাপন্ন হও। তাঁর চরণে যে আত্মসমর্পণ করে, তার উপর থেকে কাম-ক্রোধের অধিকার উঠে যায়। কারো যদি সামান্য কিছু জমি-জমা থাকে ও প্রজা থাকে, এই প্রজাদের যদি সে শাসনে না রাখতে পারে, তাহ'লে প্রতাপসম্পন্ন জমিদারকে ইজারা দিলে তার শাসনের চোটে সব অবাধ্য প্রজা বাধ্য হ'য়ে যায়। ঠিক্ তেমনি জান্‌বে। নিজে এই দেহ-রূপ জমি-জমা নিয়ে কাম-ক্রোধাদি নানা প্রজার হাতে দিয়েছ। উদ্দেশ্য, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ করণীয় কাজ ক'রে খাজানা যেন আদায় দেয়। কিন্তু তোমাকে দুর্ব্বল দে'খে দেহ-ভূমিকে করণীয় কাজে নিয়োজিত না ক'রে তারা অকর্ত্তব্য কাজে নিয়োগ কচ্ছে এবং দেহের সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছে । তখন তুমি মহাপরাক্রান্ত ভগবানের হাতে এই দেহকে দিয়ে দাও। দেখ্‌বে, সকল কুপ্রবৃত্তির আস্ফালন তাতেই থেমে গেছে।

দীক্ষাগ্রহণ, সাধন-করা ও সিদ্ধিলাভ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাগ্রহণ হচ্ছে সেই আত্মসমর্পণেরই শিক্ষাগ্রহণ। সাধন করার মানে নিজেকে ভগবানের পায়ে সঁপে দেওয়ার চেষ্টা করা। সিদ্ধি-লাভ করার মানে হচ্ছে নিজেকে নিঃশেষে ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে দেওয়ার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা।

নোয়াদা (গয়া)

২৬শে আশ্বিন, ১৩৩৯

গতকল্য বেলা দেড়টার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা লাহেরিয়া-সরাই হইতে রওনা হইয়াছিলেন এবং রাত্রি দেড় ঘটিকায় নোয়াদা পৌছিয়াছিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র মোহন লাহিড়ীর বাড়ীতে উঠিবার কথা। কিন্তু বাড়ী চেনা নাই বলিয়া রাত্রিটা ষ্টেশনেই কাটান হইল।

অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত ভূপেন-দার বাড়ীতে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবা পৌছিয়াছেন। দীর্ঘ দিন পূর্ব্বে একদা কলিকাতায় শ্রীশ্রীবাবা ভূপেনদাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। দীর্ঘকালের ভিতরে আর পরস্পরে সাক্ষাৎকার নাই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ভক্তিলতার বীজ এই উর্ব্বর ভূমিতে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতেছে।

পূর্ণ জীবন চাই

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা ভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা সদ্‌বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু বেঁচে থাকাকেই যথেষ্ট ব'লে মনে করা চলে না। পূর্ণ জীবনের আস্বাদন পাওয়া চাই। জীবনের পূর্ণতার প্রমাণ হচ্ছে ত্যাগে, আর ত্যাগের সামর্থ্য লাভ হচ্ছে ভক্তিতে। ভক্তির মূল হচ্ছে সম্যক আত্মসমর্পণে। ভগবানে নিজেকে বিকিয়ে দাও, জীবনের পূর্ণতা তা'থেকেই আস্‌বে।

অনাসক্ত মনই প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— সংসারী বা ফকিরী, এর ভিতরে অধিক কিছু নেই, সব কিছু তোমার মনে। দেহ সংসারে আবদ্ধ থাকতে পারে, দেহ

সংসার-বন্ধন অস্বীকারও কত্তে পরে, কিন্তু তার দরুণই তুমি সংসারী হয়েছ বা ফকীর হয়েছ, তা' বলা চলে না। মন যার সংসারে আসক্ত, সেই সংসারী; মন যার সংসারে অনাসক্ত, সেই ফকীর। কেউ গৃহ-পরিজন নিয়ে বাস ক'রেও ফকীর থাকে, কেউ ঘর-দুয়ার আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ ক'রে নির্জ্জন স্থানে একাকী বাস ক'রেও সংসারীই থাকে। অনাসক্ত মন, নিষ্পাপ হৃদয়, নির্লালস চিত্তবৃত্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্বকে আস্বাদনীয় করে। আসক্তির যে অধীন, সেই বদ্ধ। আসক্তি যার অধীন, সেই মুক্ত। মুক্ত পুরুষই জীবনকে ও তার পূর্ণতাকে আস্বাদন কত্তে পারে। বদ্ধ জীব শুধু দুর্ভোগ ভোগে।

প্রকৃত সহধর্ম্মিণী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বিবাহ ক'রে ঘর যখন বেঁধেছ, তখন এই বন্ধনের ভিতর থেকেই তোমাকে মুক্তির আস্বাদ অর্জ্জন কত্তে হবে। ভোগের ভিতরে দিয়েই ত্যাগকে, সংসারীর ভিতর দিয়েই ফকীরীকে আয়ত্ত কত্তে হবে। স্ত্রীকে, শুধু স্ত্রী মাত্র গণ্য না ক'রে, ধর্ম্মের সহায়িকারূপে গ'ড়ে নাও। সন্তান-পালনেও সে তোমার সঙ্গী হোক্, ধর্ম্ম-সাধনেও সে তোমার সঙ্গী হোক্। তবেই সে তোমার সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্য হবে। প্রকৃত সহধর্ম্মিণী লালসার অনলে ইন্ধন দেয় না, প্রেমরূপ পবিত্র সলিলের সিঞ্চন দ্বারা কামনার অগ্নি নির্ব্বাপিত করে।

নোয়াদা
২৭ আশ্বিন, ১৩৩৯

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ প্রদান করিতে করিতে নরনারীর সম্পর্ক-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

যুগল সাধনার মর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পুরুষের পক্ষে নারী লালসার প্ররোচিকা, নারীর পক্ষে পুরুষ কামনার ইন্ধনদাতা,—এ বিচার কতকটা স্থূল। তোমার দেহের

ভিতরেই পুরুষ-অংশ ও নারী-অংশ উভয় বিরাজিত। একের প্রতি অপরের আবেগই বহির্ম্মুখ গতি পেয়ে এক নারীর প্রতি অপর পুরুষের বা এক পুরুষের প্রতি অপর নারীর আবেগ ও আসক্তি ব'লে প্রতিভাত হয়। জগতের সকল নারী যদি আজ ম'রেও যায়, তবু তোমার ভিতরের নারী ভিতরের পুরুষের জন্য ব্যাকুল হবে। জগতের সকল পুরুষ যদি আজ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, তবু তোমার ভিতরের পুরুষ ভিতরের নারীর জন্য ব্যাকুল হবে। জগতের সকল পুরুষ ও সকল নারীর লালসা-ব্যাকুলতার মূল ঐখানে। বাইরের কারণ একটা তথাকথিত উপলক্ষ মাত্র। নিজের ভিতরের নারী-পুরুষের এই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই বিবাহ। সেই বিবাহ কারো হয় অন্তরের দেশে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার, কারো হয় বাইরের প্রদেশে বরের সাথে কনের। জগতের যত যুগল-সাধনা, সব কিছুর মর্ম্ম-রহস্য এইখানে।

বিবাহিতের যুগল-সাধনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহিত দম্পতীর জীবনও এই যুগল-সাধনারই জীবন। হাসি-খেলার নয়, আমোদ-প্রমোদের নয়, এ জীবন প্রখর সাধনার জীবন। একের সাথে অপরকে মিলিত হ'তে হবে। এ মিলন ক্ষণিকের নয়, এ মিলন মাত্র দেহটুকুর নয়, দেহে, মনে, প্রাণে, চিত্তে, হৃদয়ে, আত্মায়, সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বতোভাব সর্ব্বতোকুশল মিলন। একে যখন বাক্যে বা দেহে অপরের সন্নিহিত হও, তখন তাকে মনে বা আত্মায় পূর্ণ ঐক্য দানের জন্য থাক্‌বে তোমার অভ্রম লক্ষ্য। তবেই এ সাধনা সফল হবে।

মুঙ্গের

২৮শে আশ্বিন, ১৩৩৯

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা মুঙ্গেরে জেল-ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনী মোহন নন্দীর গৃহে আসিয়া পৌছিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে।

অনিত্য বস্তুতে আসক্তিই বিনাশ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবদ্-ভক্তের বিনাশ নেই। দুঃখ আসুক, দারিদ্র্য আসুক, তাঁর কখনও হতাশা নেই, অবিশ্বাস নেই, ভয় নেই। দেহ-মন-প্রাণ ভগবানের পায়ে সমর্পণ ক'রে তিনি নিশ্চিন্ত। সুখ তাঁকে উদ্বেলিত করে না, দুঃখ তাঁকে অধীর-আকুল করে না,—যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। প্রত্যেকটী হৃৎস্পন্দনে তাঁর ভগবানের নাম, দেহের প্রতি অণুপরাণুতে তাঁর ভগবানের স্মৃতি। বিনাশ কাকে বলে? অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হওয়াই হচ্ছে বিনাশ। নিত্য বস্তুতে প্রেম-স্থাপনই হচ্ছে জীবন। ভগবৎ-ভক্ত নিত্যবস্তুতে নিত্যপ্রেম স্থাপন করেন, মৃত্যুর অতীত হন,—তাঁর জীবন নিত্যজীবন।

মুঙ্গের

২৯শে আশ্বিন, ১৩৩৯

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা গঙ্গানীরে স্নান করিতে কষ্টহারিণীর ঘাটে নামিয়াছেন। মুঙ্গেরের একটী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে নামিলেন।

দীক্ষা গ্রহণের স্থান

যুবক প্রশ্ন করিলেন,—দীক্ষা গ্রহণের পক্ষে কোন্ স্থান উৎকৃষ্ট?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে স্থানে মন স্বভাবতঃ শান্ত হয়। যেমন, তীর্থ, মন্দির, আশ্রম, গুরুগৃহ, ভক্ত বা জ্ঞানিগণের সমাধি।

যুবক কহিলেন,—এই গঙ্গাতীর?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইহাও উত্তম স্থান।

যুবক বলিলেন,—আমাকে এখানে দীক্ষা দিন্।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—এক পাগলকে সেদিন দিয়েছি ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোজলে দাঁড়িয়ে দীক্ষা, আজ দেখছি দ্বিতীয় পাগলের পালা। আর একদিন কাউকে দীক্ষা দিতে হবে দামোদরে।

কিন্তু জলে দাঁড়াইয়া দীক্ষা না দিয়া শ্রীশ্রীবাবা তীরে উঠিয়া দীক্ষা দান করিলেন।

দীক্ষান্তে দীক্ষিত যুবককে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিতে লাগিলেন,—সাধন-ভজনের দুই দিকে দুইটী শত্রু,—একটী হচ্ছে অভিমান, অপরটী হচ্ছে আলস্য। দীক্ষা নিলাম কিন্তু সাধন কর্ল্লাম না, এর মানে হচ্ছে চাষ করার জন্য জমি পেলাম, কিন্তু সেই জমিতে হলকর্ষণ কর্ল্লাম না, বীজ পেলাম কিন্তু সেই বীজ বপন কর্ল্লাম না; কিন্তু মার্গশীর্ষ মাসে হাহাকার ক'রে কপাল থাপ্ড়াতে লাগ্লাম যে, ঘরে আমার ফসল এল না। দীক্ষা নিলাম, সাধনও কর্ল্লাম, কিন্তু কত যে আমি সাধন কচ্ছি, কত বড় যে আমি সাধক হয়েছি, এভাব পোষণ কত্তে লাগলাম। এর মানে হচ্ছে এই যে, চাষ করার জন্য যে জমি পেয়েছি আর যে বীজ পেয়েছি, সেই জমি কর্ষণ কর্ল্লাম খুবই, কিন্তু আসল বীজ বপনের সাথে সাথে আগাছার বীজ, ভাদা-ঘাসের বীজ, কাঁটার বীজ বপন ক'রে দিলাম; আর ভাদ্র মাসে যখন ক্ষেত নিড়াবার সময় এল, তখন তাকিয়ে দেখি যে ধান গাছের সঙ্গে দেখা নেই, সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে শুধু ভাদা আর জঙ্গল, কাঁটা আর বন। সুতরাং, মনে রেখো, সাধন কত্তে আলস্যও কর্ব্বে না, সাধন ক'রে স্পর্দ্ধিতও হবে না।

নামের মেইলে চাপ

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবা কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী স্থানে জনৈক ব্যক্তির নিকটে এক পত্র লিখিলেন। যথা,—

"আমাদের সাধন-গোষ্টিতে মালা-তিলকাদি বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু অপর কোনও সাধন-গোষ্ঠির কেহ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রথা, রীতি বা নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া যদি মালা-তিলকাদি ধারণ করেন, তবে তাঁহার নিন্দা-বিদ্রূপ করাও আমরা গর্হিত বিবেচনা করি। সাধন যাঁহাদের যেইরূপ, তাঁহাদের তদ্রূপ বাহ্যানুষ্টানে অপরের নিন্দা করিবার কিছু নাই।

"তুমি তোমার সমগ্র অতীত ও সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ভবিষ্যতের নবজীবনের আশায় বুক বাঁধ। আজ হইতে তুমি জানিয়া রাখ, শুধু নিজের দুঃখ দূর করাই তোমার উদ্দেশ্য নহে। তোমার জীবনের

উৎসর্গের দ্বারা লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনকে উৎসর্গমুখী করিতে হইবে। মঙ্গলময় নামের সহিত পরমাত্মার অপরিসীম স্নেহ ও অফুরন্ত শক্তি যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহারই অনন্ত মহিমায় তুমি নিজের দুঃখের সাথে সাথে জগতের অনন্ত কোটি দুঃখার্ত্তের চিরদুর্ব্বহ দুর্ভাগ্য নিচয় ঘুচাইতে পারিবে। মঙ্গলময় নামের কৃপাগুণে সেই অপরিমেয় সামর্থ্যের তুমি সুনিশ্চিত অধিকারী হইতে পারিবে, নাম নিজের অফুরন্ত মহিমায় তোমার ভিতরে সেই শক্তির স্ফুরণ ঘটাইবেন।

"অতীত জীবনে কোনও মহৎ কর্ম্মের সূচনা তোমার মধ্য দিয়া হয় নাই বলিয়া মনে করিওনা যে, ভবিষ্যতেও হইবে না। খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া যাহাকে পথ চলিতে হয়, দুর্ব্বলতার দাবী সহস্রবার যাহাকে পথি-পার্শ্বে আলস্য-তন্দ্রিত করে, নিজ শক্তিতে লক্ষ্যে পৌছিবার আশা করাটাই যাহার পক্ষে এক বিরাট প্রহসন, একটী শক্তিশালী বোম্বে মেইলে, দিল্লি মেইলে বা পাঞ্জাব মেইলে চাপিলে তাহার পক্ষে এক রাত্রিতে ছয় মাসের পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়া কিছু অসম্ভব কথা নয়। নামের মেইলে চাপ। নিজের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক, নামের শক্তি ক্ষুদ্র নহে।

"বিশ্বাসই সকল শক্তির মূল এবং বিশ্বাস হইতেই পূর্ণ নির্ভর আসে। বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া জগতে যিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি ত্রিলোক-বিস্ময়কর মহামঙ্গলময় ফলের উদ্ভব ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। নিষ্ঠা হইতে বিশ্বাস আসে এবং বিশ্বাস হইতে নির্ভর আসে। সত্যবস্তুকে অবিচলিত প্রয়াসে জীবনের সর্ব্বাবলম্বন বলিয়া হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার নামই নিষ্ঠা এবং এই বস্তুর মধ্য হইতেই ইহপরজীবনের সকল সমস্যার অমোঘ মীমাংসা অকাট্য-ভাবে প্রকটিত হইবে,—এইরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব-হীন আশাশীলতার নাম বিশ্বাস। নিষ্ঠাবান্ হও, বিশ্বাসবান্ হও, সাধনার মধুময় পথ বাহিয়া পূর্ণ নির্ভর আপনিই আসিবে। আমার মতে পূর্ণ নির্ভরতাই যোগীন্দ্র-জন-বাঞ্ছিত ব্রহ্মজ্ঞান।"

সন্ধ্যার পরে নানা সদ্-বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। ডাক্তার

অবনীবাবু এবং তাহার সহধর্ম্মিণী কিরণ বালা নানা বিষয়ে প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা একের পর একটি করিয়া বিষয়ের উত্তর দিতে লাগিলেন।

অতীতের কর্ম্মফল ও বর্ত্তমানের সাধন-ভজন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধনের সূক্ষ্মশক্তি দ্বারা অতীত জন্মের কর্ম্মফল তিন প্রকারে খণ্ডন করা যায়। প্রথমতঃ অতীতের কোনও কর্ম্ম যে ফলকে সৃষ্টি ক'রেছে সেই ফলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা যায়। দ্বিতীয়ত অতীতের যে কর্ম্মফলকে বিনষ্ট করা যায় না, তার অনিষ্টজনক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত ইষ্টপ্রদ অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়। তৃতীয়তঃ যেখানে অতীতের কর্ম্মফলজনিত অনিষ্টের সমপরিমাণ ইষ্ট-উৎপাদনের পক্ষে বাধা জন্মে, সে স্থলে দুর্ব্বিসহ ক্লেশরাশিও অবহেলে সহ্য ক'রে যাবার, শক্তি অর্জ্জন করা যায়। মোটকথা, সাধন যদি কর, তবে তার ফলে অতীতের কর্ম্মফল কোথাও লুপ্ত, কোথাও অর্দ্ধফলপ্রদ, কোথাও সহজে সহনীয় হ'য়ে থাকে। অতএব অতীতে অনেক পাপ ক'রেছি, এজন্মে আর উদ্ধার নেই, এইরূপ ভেবে চুপ ক'রে বসে থাকার মত ভ্রম আর কিছু নেই।

দুরাশা ও নিরাশা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুরাশাও দোষ, নিরাশাও দোষ। বীজবপন কর্ব্ব না, কিন্তু ভগবানের করুণার বলে ফসল ঘরে তুলে আন্‌ব, এরূপ দুরাশা সাধকের ক্ষতিকর। আবার, এত পাপ করেছি যে, এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব, এরূপ ভাবের অধীন হ'য়ে হতাশ হ'য়ে পড়াও দারুণ ক্ষতিকর। ভগবান্ দয়ালু হ'লেও তাঁর দয়া পাবার যোগ্য হবার জন্য শ্রম কত্তে হবে, সাধন কত্তে হবে, চিত্তশুদ্ধিকর নানা সৎকার্য্য কত্তে হবে। আবার সঞ্চিত পাপ ও পাপজ কর্ম্মফল অপরিসীম হ'লেও তার ক্ষয়ের জন্য প্রাণপণে সাধন কত্তে হবে। মোটকথা, অন্যায় আশাও ক'রো না, নিরাশও হয়ে প'ড়ো না।

সকল পাপেরই ক্ষালন আছে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে পাপী কে নয়? দোষ করে নি, অপরাধ করেনি, এমন মানুষ কয়েক শতাব্দীতে একজন তুজন মিলে। মানুষ নিজের ভিতর খুঁজে দেখে না, তাই নিজের দোষ দেখ্‌তে পায় না। আমরা সবাই নিজের বেলা চালুনীর ছিদ্রও দেখতে পাই না, কিন্তু পরের বেলা ছুঁচের ছিদ্র নিয়েই যথেষ্ট কলরোল করি। কিন্তু স্থির চিত্তে নিজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, কাল যাকে মহাপুণ্য ব'লে মনে করা হয়েছিল, তা' প্রকৃত প্রস্তাবে পুণ্য নয়। পরশুরাম পুণ্য ভেবে মাতৃহত্যা কর্লে্ন, কিন্তু পরে যখন আর হস্তের পরশু তার হস্তত্যাগ ক'রে খসে পড়্‌ল না, তখন বুঝ্‌লেন, পুণ্য ভেবে পাপ করেছেন। লক্ষণ পুণ্য ভেবে ইন্দ্রজিৎকে বধ কর্লে্ন, কিন্তু কথিত আছে যে, পরে এই কাণ্ডটীকেই পাপ জ্ঞান ক'রে প্রায়শ্চিত্তের জন্য গিয়ে হৃষিকেশের নিকটে তপস্যা ক'রে পাপক্ষয় কর্লে্ন। কিন্তু পাপ যে যতই করুক, সকল পাপেরই ক্ষালন আছে। মঙ্গলময় পরমাত্মা সকল পাপের মোচনকারী ও করুণাময়। তাঁর শরণাপন্ন হ'লে সকলেরই উদ্ধার হয়। প্রয়োজন হচ্ছে, একান্ত মনে তাঁর শরণাগত হওয়ার।

শরণাগতির শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা সাধারণ মানুষের যদি শরণাগত হই মনে প্রাণে, তাহ'লে সেও আশ্রয় না দিয়ে পারে না, নিজের সামর্থ্যানুযায়ী রক্ষা না ক'রে পারে না। শরণাগতির এত শক্তি। অথচ মানুষ মানুষকে কতটুকু সাহায্য কত্তে পারে? মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য। এ অবস্থায় ভেবে দেখ, সর্ব্বশক্তিমানের শরণাপন্ন হ'লে তিনি কেন সর্ব্বপাপাৎ প্রমুক্তি প্রদান কর্ব্বেন না? নিজের ভার তাঁর উপরে দিতে পার্‌লে তিনি পাপ-মোচনে কৃপণতা করেন না।

শরণাগতির অর্থ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শরণাগতির এই মানে নয় যে, নিজেকে ভগবানের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে নিজে হাত পা ছেড়ে চীৎ হ'য়ে প'ড়ে

রইলাম। যাঁর শরণাগত হ'লাম, তাঁর নির্দ্দেশমত আমাকে কাজ ক'রে যেতে হবে। আলস্য আর শরণাগতি এক কথা নয়। এতক্ষণ কাজ কচ্ছিলাম নিজের কর্ত্তৃত্বের অহমিকা নিয়ে, এখন থেকে কাজ কর্ব্ব সকল কর্ত্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ ক'রে। এরই নাম শরণাগতি। যাঁর আমি শরণাগত, তাঁর আমি কিঙ্কর, তাঁর আদেশ ছাড়া একচুল চলার ইচ্ছা পর্য্যন্ত আমার মনে উদিত হ'তে দিব না, তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি, তিনি তাঁর কার্য্য সাধনের জন্য যখন যে ইঙ্গিত প্রদান কচ্ছেন, তিলমাত্র আপত্তি না ক'রে তখনি বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে সেই কার্য্যে নিজকে নিঃশেষে নিয়োজিত কচ্ছি,—এর নাম শরণাগতি।

শরণাগতির লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সত্যিকারের শরণাগতি এলে তখন পুরোণো মানুষ নূতন হ'য়ে যায়। যখন দেখ্‌বে, অন্তরে আর ঔদ্ধত্য নেই, বাহাদুরীর লোভ নেই, লোকমানের আসক্তি নেই, কারো প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ নেই, তখন জান্‌বে শরণাগতির লক্ষণ স্ফুট হচ্ছে। শরণাগতি এলে লাভের লোভ আর লোকসানের ভয়, দুটিই চলে যায়। শরণাগত ব্যক্তি যেমন নিশ্চিন্ত, তিন ভুবনে তেমন নিশ্চিন্ত আর কে আছে ? তাঁর মুখের গান হবে,—"কেন ভাব্‌না আসে মনে ; তাঁরি কাজ কর্‌বে রে সে আপনি দেখে শুনে।"

ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বামিস্ত্রীর ভিতরে যদি খুব ভালবাসা থাকে, তাহ'লে একজনে আর একজনের উপরে কেমন নির্ভর করে। ভগবানের সাথেও যদি ভালবাসা থাকে, তবে তার উপরে নির্ভর করা যায়। ভালবাসা নেই, অথচ মুখে মুখে শরণাগত হলাম, এ'ত হয় না! ভালবাসার চরম অবস্থায় হয় আত্মসমর্পণ। মুখের ভালবাসায় আত্মসমর্পণ আসে না।

দাম্পত্য-প্রেম তথা ভগবৎ-প্রেম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই যে তোমরা সংসারী জীবন যাপন কচ্ছ, এখানে তোমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য কি? ভগবানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করা। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, এ ভালবাসা ত' ভগবানের প্রতি প্রদেয় ভালবাসার একটী অতীব অস্পষ্ট ছায়া মাত্র। এই অস্পষ্ট ছায়ার মত ভালবাসা বেসেই স্বামী ভাবে,—"স্ত্রীকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব," স্ত্রী ভাবে,—"স্বামীকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব,"—কিন্তু যে ভালবাসা হচ্ছে ভালবাসার প্রকৃত কায়া, সেই ভালবাসার অধিকারী ও অধিকারিণী হ'লে তোমরা ভগবানকে কেমন ক'রে ভালবাস্‌তে! কোটি জন্মের ভালবাসার সুখ তোমরা এক পলকে আস্বাদন কত্তে পাত্তে যদি সেই আসল ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ কত্তে পাত্তে। দম্পতীর ভালবাসা মধুর, ভগবানের সাথে তোমাদের ভালবাসা সৃষ্ট হ'লে তা হবে মধুরতম, কল্পনাতীত গভীর ও নিত্যস্থায়ী। সেই ভালবাসার প্রতি স্বামী দেবে স্ত্রীকে অগ্রসর ক'রে, স্ত্রী দেবে স্বামীকে অগ্রসর করে, এই জন্যই তোমাদের দাম্পত্যবন্ধন। এইটাই হচ্ছে তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য।

পরিবারের প্রতি আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু কর্ত্তব্য এখানেই শেষ হ'ল না। বিবাহিত যখন জীবন, তখন কর্ত্তব্য শুধু স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। সন্তান-সন্ততির প্রতিও কর্ত্তব্য রয়েছে। তাদের শুধু স্কুলে পড়িয়ে আর বিয়ে দিয়েই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হবে না। পরিবারস্থ প্রত্যেকটী জীবকে ভগবন্মুখী ক'রে তুল্‌তে হবে। পুত্র, কন্যা, আশ্রিত, আত্মীয়, দাস, দাসী, প্রভৃতি সকলের ভিতরে ভগবৎ-প্রেমরসাস্বাদনের জন্য উন্মুখতা সৃষ্টি কত্তে হবে। পুত্রকে উপার্জ্জন-যোগ্য শিক্ষাদান, কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করা, আশ্রিত বা আত্মীয়ের জীবনোপায়ের বিধান করা, দাসদাসীর বৈধ বেতন প্রদান করা,—এগুলি এদের প্রতি তোমার সাংসারিক কর্ত্তব্য। কিন্তু

এদের প্রত্যেককে ভগবন্মুখী করার চেষ্টা করা তোমার আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য। আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যকে বাদ দিয়ে শুধু সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন কর্লে কর্ত্তব্যের অর্দ্ধাংশেরও কম পালন করা হ'ল।

৩১শে আশ্বিন,
১৩৩৯

মুঙ্গের হইতে ফিরিতে পথিমধ্যে আসানসোল ষ্টেশনে আজ শ্রীশ্রীবাবাকে প্রায় পাঁচঘণ্টা কাল ট্রেণের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইতেছে। এই সময়-টুকুর অবসর পাইয়া, শ্রীশ্রীবাবা আজ পুঞ্জীকৃত পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলেন। প্লাটফর্ম্মের এক প্রান্তে কম্বল বিছাইয়া বসিলেন। দোয়াত কলম সঙ্গে ছিলনা বলিয়া পেন্সিল দিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া চল

রহিমপুর আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ অথবা শঙ্কর, নানক, গৌরাঙ্গ যখন নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচার আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা জানিতেন কি না যে তাঁহাদের সম্প্রদায় কত বড় হইবে, এই বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ কিছু নাই। আর্য্যা গৌতমীকে সন্ন্যাস দিবার প্রস্তাবে যখন শ্রীবুদ্ধ আপত্তি করিতেছিলেন, তখন ভবিষ্যতে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ যে বিরাট সঙ্ঘারাম সমূহ গঠন করিবেন, ইহা তিনি অনুমান করিতেছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্ঘারাম যে অর্দ্ধপৃথিবীকে গ্রাস করিবে, এমন কথা স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে দশ দিকে তাঁহার বার্ত্তা লইয়া মানব-ত্রাণের জন্য যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে তাঁহার বাণী অবশ্যই সমাদৃত হইবে, এমন কথা বলেন নাই। হজরত মহম্মদ তিন দিন নির্জ্জন-বাসের পরে আসিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি ভগবানকে ধ্রুব করুণাময় অবস্থায় পাইয়াছিলেন এবং ভগবান মহম্মদের শিষ্যগণের মধ্যস্থ সত্তর হাজার ব্যক্তিকে স্বর্গে যাইবার অধিকার দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার

করিয়াছিলেন। ভগবান আরও বলিয়াছিলেন যে, সেই সত্তর হাজার শিষ্যের প্রত্যেকের সহিত সত্তর হাজার করিয়া পাপীকেও স্বর্গে যাইতে দিবেন। তখন মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আমার শিষ্য কি তত হইবে?" ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোটি কোটি লোক যে হজরত মহম্মদের অনুবর্ত্তী একদিন হইবে, ইহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। নানকের ধর্ম্মপ্রচারের প্রারম্ভ বড় সাধারণ, উচ্ছ্বাস নাই, আড়ম্বর নাই, বহু বহু জনের সমাবেশ নাই, নিভৃত একাকীত্বের ভিতর দিয়া মিষ্টি মিষ্টি হিতকথা দু একটী করিয়া প্রাণে আস্তে আস্তে ভাব-তরঙ্গ-মালা লোক-চক্ষুর অগোচরে সৃষ্টি করিতেছিল। হয়ত তিনিও কল্পনা করেন নাই যে, তাঁহার শিষ্যগোষ্ঠী কত বৃহৎ হইবে। অবশ্য শ্রীগৌরাঙ্গ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন —"পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম, সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম",—কিন্তু ইহা দ্বারাই কেহ তখন বুঝিতে সমর্থ হয় নাই বা এখনও বুঝিতে সমর্থ হইতেছে না যে, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কতখানি সুব্যাপক হইবে। তোমাদের পক্ষেও আজ অনুমান করা অতীব কঠিন যে, তোমাদের ধর্ম্মমত ধর্ম্মপথ ভবিষ্যতে কত লক্ষ, কত কোটি, কত শঙ্খ, কত পদ্ম, কত অর্ব্বুদ, কত সাগর নরনারীর একান্ত অবলম্বনীয় আশ্রয় হইবে, তোমাদের এক এক জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচরণ কত জনের কত সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় দিক্‌দর্শনের কার্য্য করিবে। একথা ভাবিয়া তোমরা তোমাদের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র-বৃহৎ বাক্য অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া উচ্চারণ কর, ক্ষুদ্র-বৃহৎ কার্য্য অনন্ত ভবিষ্যতের অনুবর্ত্তি-গণের: দিকে চাহিয়া নিয়ন্ত্রিত কর, ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেকটী চিন্তা অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের একমাত্র প্রভু মঙ্গলময় পরমাত্মার পাদপ্রান্তে চাহিয়া পরিচালিত কর।"

স্বগুণ-কীর্ত্তন

চট্টগ্রাম নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"নিজ মুখে নিজ-গুণ-কীর্ত্তন সাধুব্যক্তির নিকট কেহ প্রত্যাশা করে না। কারণ, স্বগুণ-কীর্ত্তনের দ্বারা উন্নততর ভবিষ্যতের পথে

কণ্টক রোপিত হয়। নিজেকে মহৎ ও গুণী ভাবা গুণবর্দ্ধনের পরিপন্থী। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে স্বগুণ-কীর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে। কোনও অন্ধ পথও দেখিতে পায় না, তোমাকেও দেখিতে পায় না; তেমন ব্যক্তিকে গহ্বরে-পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার মনে আস্থা স্থাপন যদি আবশ্যক হয়, তবে নিজে যে চখে দেখিতে পাও, একথা বলা সঙ্গত হইবে। এই ব্যাপারটা কিরূপ হইল জান? কোথাও তুমি চাকুরীর অন্বেষণে গিয়াছ, সেইরূপ স্থলে কি কি কাজে তুমি পারদর্শী, তাহার যথার্থ ভাষণ তোমার চাকুরী পাইবার পক্ষে প্রয়োজন। জন-সেবা, জীব-সেবা যাহার চাকুরী, তাহার পক্ষে সেব্য জনগণের আস্থা উৎপাদনের জন্য অপারগ-পক্ষে নিজগুণ বর্ণনের প্রয়োজন দেখা গিয়া থাকে। ব্রহ্মদর্শনকারী কদাচিৎ লোক সমক্ষে বলিয়া থাকেন যে তিনি ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জনক-রাজ-সভায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। যীশুকে বলিতে হইয়াছিল,— 'I and my Father are one,—আমি এবং আমার স্বর্গস্থ পিতা এক, অভিন্ন, অদ্বৈত-সত্ত্বায় অপৃথক্।' মহম্মদকে বলিতে হইয়াছিল —'আমি আল্লার দেখা পাইয়াছি।' তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় ইহা না বলিলে যাহাদের সেবার জন্য তাঁহাদের তনুমন সমর্পিত, তাহাদের সেবা-কার্য্যে ত্রুটী হইত। উপদেষ্টায় আনাস্থা থাকিলে উপদিষ্ট কখনও উপদেশ ঐকান্তিকতার সহিত অনুসরণ করে না। তোমরা কোথাও কোন সাধু-সজ্জনের মুখে কোনও কথা শুনিলে নিজেদের রুচিমত তাহার ব্যাখ্যা করিও না। মনে করিও,—'তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে বলিবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তোমরা কেহ উহা করিলে তাহাতে দোষ হইবে। যেহেতু অনুরূপ ক্ষেত্র ও প্রয়োজন তোমাদের নাই। —মোটকথা, সর্ব্বতোভাবে সকলের সম্পর্কে অদোষদর্শী হইও।"

শারীরিক সদাচার কুসংস্কার নহে

নোয়াখালী-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"থুথু ফেলিয়া মুখ প্রক্ষালন, কফ ফেলিয়া বা চখে, মুখে, ঠোঁটে হাত লাগাইয়া হস্ত-ধাবন, মূত্র-ত্যাগান্তে জলশৌচ, দন্ত-ধাবনান্তে চক্ষুরাদি সহ সমগ্র মস্তক প্রক্ষালন, মলত্যাগান্তে বস্ত্র-পরিবর্ত্তন, পূতিগন্ধময় স্থানাদি স্পর্শে অবগাহন,— এগুলি শারীরিক সদাচার। ইহা প্রতিপালনে যত্নশীল হওয়াকে কুসংস্কার বলিয়া গালি দেওয়া ভুল। বরং মনের ভিতরে যে সংস্কার থাকিলে এই সকল সদাচার পালনকে লোকে ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে, সেই সংস্কারই কুসংস্কার। তোমাদেরই একটী আপনার জন পশ্চিম বঙ্গের কোনও একটী সাধুর আশ্রমে গিয়াছিল। সে সেখানে মূত্র-ত্যাগান্তে জলশৌচ করিতেছে দেখিয়া আশ্রমবাসী বয়স্ক ব্যক্তিরাও ঠাট্টা সুরু করিয়াছিলেন। আশ্রমে-বাস করিয়াই যখন এ অবস্থা তখন স্পঞ্জের সাহায্যে মলশৌচে অভ্যস্ত অর্দ্ধ-ইংরাজ শিক্ষিত ভদ্রলোক-দের কথা আর নাই তুলিলাম। কে কি বলিবে ভাবিয়া তুমি তোমার দৈহিক সদাচার পরিত্যাগ করিতে পার না। যতবার মূত্রত্যাগ করিবে, ততবার উপস্থকে শীতল ও পবিত্র সলিলের দ্বারা ধৌত করিবে। ইহা যে না করে, তাহার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে পাপ হয়।"

ভাবের আবেগে চলিও না

ময়মনসিংহ-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তুমি সন্ন্যাসী হইবে, কিন্তু মস্তক-মুণ্ডন করিলে বা দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিলে অথবা ভিক্ষাটন করিয়া বেড়াইলেই কি বিষয় তোমাকে ত্যাগ করিবে? কেশ যখন বাড়িয়া যাইবে, ক্ষৌরকারকে পাইবার জন্য তোমার মন কি উদ্বিগ্ন হইবে না? কমণ্ডলু যখন চোরে লইয়া যাইবে, তস্করের প্রতি তোমার মন কি বিদ্বিষ্ট হইবে না? ভিক্ষা যে দিন মিলিবে না, সেদিন কি ক্ষুধার যন্ত্রণা তোমার মনের ক্লেশে ইন্ধন প্রদান করিবে না? যাচ্ঞা যাহার নিকট করিবে, সে যদি প্রয়োজনের অপেক্ষা অল্প দান করে অথবা বস্তুদানে বিরত রহিয়া বিরক্তিকর ও অসম্মানজনক বাক্যই মাত্র দান করে, তাহা হইলে কি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হইবে না?

ভাবিয়া দেখ, বুঝিয়া দেখ, ইহা সংসারী কি না। মঠ গড়িবে, শিষ্য করিবে লোক-হিতার্থে। কিন্তু লোকহিতবুদ্ধি একদিন যখন কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে এবং মঠ ও শিষ্য তোমার আসক্তির বস্তুসমূহের মধ্যে পরিণত হইবে, তখন নিজ হস্তে এই মঠ দগ্ধ করিতে পারিবে বা শিষ্যদিগকে গুর্ব্বন্তর গ্রহণ করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিতে প্রেরণা দিতে সমর্থ হইবে ? ভাবের আবেগে চলিও না, কাজ করিবার আগে ভাল করিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখ। অসংখ্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা দারুণ বিষয়ী। বিষয়ের সেবার জন্যই তাঁহারা একদা এক শুভ প্রভাতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু চিত্তের দৌর্ব্বল্য-বশাৎ ঘোর বিষয়-বিপাকে জড়াইয়া পড়িয়াছেন।"

অনাদৃতকে কোল দাও

চাঁদপুর (ত্রিপুরা) নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"অসভ্য বা বর্ব্বর জাতিসমূহকে আমরা ঘৃণা করিব না। এই কথাটী বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিও। জগতে অন্নযুক্তকেই অন্নদান করার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, সভ্যগণের ভিতরেই সভ্যতার বাণী প্রচারে অত্যধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তোমাদিগকে তাহার বিপরীত আচরণ করিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে অসভ্য বর্ব্বর জাতিসমূহের মধ্যে গিয়া আমরণের বাস-ভবন নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহাদের মত পাতার কুটীরে বাস করিয়া, ম্যালেরিয়া-বসন্তে জর্জ্জরিত হইয়া, মরিতে মরিতে বাঁচিয়া থাকিয়া বিশ্বপ্রভুর মহিমা-বারতা বিতরণ করিতে হইবে। আজ তোমরা সংখ্যায় অত্যল্প কিন্তু চিরকাল অত্যল্প থাকিবে না। যে শিশু কোলে কোলে আদৃত হইতেছে, তাহাকেই কোলে নিয়া আদরের প্রথা দেখিতে পাই। তোমরা মৃত্তিকাশায়িত অনাদৃত শিশুকে কোলে তোল।"

ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হও

লৌহজঙ্গ (ঢাকা) নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ঐশ্বর্য্যের তুমি অধীশ্বর হইতে পার, কিন্তু বিচার করিয়া দেখ যে, নিজ.

ইন্দ্রিয়গণেরও তুমি অধীশ্বর হইয়াছ কি না। বিপুল সম্পদের অধীশ্বর হইয়াও যদি ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর হও, তোমার এ সম্পদ কয় দিন তোমাকে ভর্ত্তা বলিয়া বন্দনা করিবে? লক্ষ্মী চিরকালই চঞ্চলা, কিন্তু ইন্দ্রিয়নিচয় যার ক্রীতদাস হইয়া আছে, তাহার গৃহে লক্ষ্মী চির-অচঞ্চলা। ধন-সম্পদ আহরণ করিতেছ ভাল কথা, কিন্তু স্বকীয় প্রত্যেকটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেকটী কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখিবার অনুশীলনে সঙ্গে সঙ্গেই নিরত হও। অনেকে প্রভূত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মজয়ের বিদ্যা-অর্জ্জনে পরাঙ্মুখ রহে বলিয়া সকল বিদ্যাই অবিদ্যায় পরিণত হয়। সে ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাতে কি লাভ হইয়াছে, যদি সে নিজের অন্তরের প্রসুপ্ত কামনার উদয়-বিস্তার-বিলয়ের ইতিহাস না অধ্যয়ন করিতে পারে? সে ব্যক্তি মহাজ্ঞানী দার্শনিকদের প্রত্যেকের বিশাল বিশাল গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেকের উপস্থাপিত কূটতর্কের গহণ-অরণ্য অতিক্রম করিয়া Ph. D. উপাধি অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইয়াছে, যদি নিজের অন্তরের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত কদর্য্য কলুষতার বীজাঙ্কুরগুলির সন্ধান নিতে না পারিয়া থাকে?"

ভোগাকাঙ্ক্ষাকে জয় কর

বেলা দশটায় আসানসোল হইতে ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণে সোনামুখী নিবাসী একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গেই চলিয়াছেন। কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবা যুবকটীকে নানা হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। যুবকটী পলাশডাঙ্গা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইন্দ্রিয়নিচয় যার বশে সেই মানুষ। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়নিচয়ের বশে, সে পশু। মানুষ আর পশুর ভিতরে এই হচ্ছে প্রধান পার্থক্য। হাত-পা-চখ-নাক-কাণ প্রভৃতির গঠনের জন্য শূকর বা কুক্কুর ঘৃণ্য নয়, সে ঘৃণ্য তার ইন্দ্রিয়-সুখ-বশবর্ত্তিতার জন্য। ইন্দ্রিয়-প্ররোচনায় সে অতি কদর্য্য অতি জঘন্য বস্তুকে কত তৃপ্তির সাথে আস্বাদন করে। মানুষকে এই ইন্দ্রিয়-প্ররোচনার ঊর্দ্ধে থাক্‌তে হবে। জান্‌তে হবে, ইন্দ্রিয়ের

সেবাদ্বারা কখনো ইন্দ্রিয়জয় সম্ভব হয় না, তাকে নিগ্রহের দ্বারাই জয় কত্তে হয়। কাষ্ঠ-প্রয়োগের দ্বারা কিম্বা ঘৃতাহুতির দ্বারা কি কখনও অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করা যায়? পাখার বাতাস দিলে কি আগুন বাড়ে, না কমে? আগুন নিবাতে হ'লে চাই বালি চাপা দিয়ে বায়ুর চলাচল বন্ধ ক'রে দেওয়া। শয়নের দ্বারা কি কখনও নিদ্রা-জয় হয়? নিদ্রাকে জয় কত্তে হ'লে শয্যা ছেড়ে উঠে বস্‌তে হয়, দেহকে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োজিত কত্তে হয়। শত শত নদীর সমাগমেও সমুদ্রের কখনো অতৃপ্তি জন্মে না, লক্ষ মণ কাষ্ঠ প্রদানের পরেও অগ্নির কখনো তৃপ্তি হয় না। ভোগ যতই কর, ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই। সুতরাং ভোগ থেকে বিরত থেকেই ভোগাকাঙ্ক্ষাকে জয় কত্তে হবে।

দুষ্প্রবৃত্তি দমনে ভগবৎ-স্মরণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ভোগ থেকে বিরতি হচ্ছে বাহ্য সদুপায়। মন থেকে ভোগ-প্রবৃত্তিকে দূর ক'রে দেওয়ার উপায় হচ্ছে অবিরাম অনুক্ষণ ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করা। যে নিজে চোরকে দমন কত্তে পারে না, সে থানায় গিয়ে খবর দেয়, থানার দারোগা পুলিশ মোতায়েন ক'রে অনিষ্ট নিবারণ করেন। তোমার নিজের শক্তিতে যদি দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন কত্তে না পার, তাহ'লে অবিরাম অবিশ্রাম ভগবানের কাছে নিবেদন কত্তে থাক। তিনি তখন তোমার দুষ্প্রবৃত্তি দমনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি ক'রে দেবেন।

পুপুন্‌কী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৯

সায়ংকালে শ্রীশ্রীবাবা পুপুন্‌কী গ্রামে জেলা-বোর্ডের রাস্তার সংলগ্ন কূয়ামূলে একখানা খাটিয়ার উপরে বসিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে গ্রামবাসীরা ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন।

রাজকন্যা-বিবাহকারী মেথরের গল্প

শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর মিশ্রের একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা একটী গল্প বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক দেশে এক প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁর একটী মাত্র পরমা সুন্দরী কন্যা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন চরিত্র, এমন স্বাস্থ্য জগতে কোথাও দেখা যায় না। রাজা আর রাণী ভাবেন যে, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্ ও রূপবান্ পুরুষের সাথে রাজকন্যাকে বিবাহ দিতে হবে। কিন্তু কত দেশের কত রাজপুত্র রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে আসেন, একজনকেও আর পছন্দ হ'য়ে ওঠে না। রাজা পছন্দ করেন ত' রাণীর পছন্দ হয় না। রাণী পছন্দ করেন ত' রাজার পছন্দ হয় না। রাজা-রাণী দুই জনেই পছন্দ করেন ত' রাজকন্যার পছন্দ হয় না। কোনো রাজপুত্র হয়ত খুব গৌরবর্ণ কিন্তু শরীর একটু হাল্কা, কোনো রাজপুত্র হয়ত খুবই সুগঠিত-দেহ, কিন্তু রংটা একটু কালো। কোনো রাজপুত্রের হয়ত রংও ভালো, গঠনও ভালো, কিন্তু একটা দাঁত একটু উঁচু, কারো বা একটী চোখ একটু বাঁকা। এই রকম ক'রে নির্দ্দোষ বর আর জোটে না। কোনো রাজপুত্র হয়ত বর্ণে, গঠনে, সৌন্দর্য্যে অনুপম, কিন্তু রাজ্যের আয় কম, কোনো রাজপুত্রের হয়ত ধনভাণ্ডার কুবেরের তুল্য, কিন্তু অন্য দিকে কিঞ্চিৎ ত্রুটী লক্ষ্য করা যায়। বর আর যখন কিছুতেই ঠিক হয় না, তখন কন্যার বিবাহ নিয়ে রাজাতে আর রাণীতে ভয়ঙ্কর গৃহ-কলহ সুরু হ'ল। গৃহে আর শান্তি নেই। যতক্ষণ রাজা সভাগৃহে থাকেন, ততক্ষণই শান্তি। অন্তঃপুরে এলেই রাজা-রাণীতে লেগে যায় তুমুল কলহ। রাণী বলেন,—"বরের কোনো খবর কচ্ছ?" রাজা বলেন,—"তোমাদের যখন কোনো বরই পছন্দ হবে না, তখন বরের তালাস নিজেরাই গিয়ে কর।" একদিন রাজা ও রাণীতে কলহ কত্তে কত্তে রাত্রি প্রায় দু'টা বেজে গেছে। রাজবাড়ীর মেথর পাইখানার ময়লা নিতে এসেছে, জানালার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কলহের কথাবার্ত্তা সে শুনতে লাগ্‌ল।

রাজা বল্‌ছেন,—"এ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য কত্তে পারি না। গৃহে অশান্তি, আর অশান্তি। সুতরাং আমি যদি ক্ষত্রিয়ের সন্তান হ'য়ে থাকি, তাহ'লে পূর্ব্বপুরুষদের পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে আজ প্রতিজ্ঞা কচ্ছি যে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজপুরীর বাইরে গিয়ে যার মুখ প্রথমে দেখব, সেই ব্যক্তি সুস্থ হোক, রুগ্ন হোক, যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, ব্রাহ্মণ হোক, চণ্ডাল হোক, আমি তারই হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্ব্ব।" রাণী একথা শুনে আরো রেগে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"আমিও আর সহ্য কত্তে পাচ্ছি না। তুমি ত' দিব্যি রাজসভায় বসে থাক, রাজ্যের বড় বড় লোক-সব মনের ভাব গোপন ক'রে অনুগ্রহ-প্রত্যাশী হ'য়ে সকল বিষয়ে তোমার মনের মত কথা ব'লে তোষামোদি ক'রে তোমাকে সন্তুষ্ট রাখতে প্রয়াস পায়। কিন্তু আমার ত' আর কিছুই অজানা থাকে না! দাসীরা রোজ সন্ধ্যায় নিজ নিজ গৃহে যায়, ফিরে এসে আমাকে জানায় যে রাজ্যময় প্রজারা সব ধিক্কার দিচ্ছে, ছিঃ ছিঃ কচ্ছে যে এতবড় আইবুড় মেয়ের বিয়ের জন্য কোনো চেষ্টা হচ্ছে না। আমি লজ্জায় ম'রে যাই। যাহোক, তুমি যখন এমন প্রতিজ্ঞা কল্লে, তখন আমিও প্রতিজ্ঞা কচ্ছি যে, আমি যদি ক্ষত্রিয়ের কন্যা হ'য়ে থাকি, তা'হলে পিতৃ-কুলের এবং মাতৃকুলের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষগণের ও প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণের পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে আমি তাঁকেই কন্যা সম্প্রদান কর্ব্ব, যাঁকে তুমি কাল প্রাতে রাজপুরীর বাইরে গিয়ে প্রথম দর্শন করবে।" এভাবে রাগারাগির ভিতরেই ঝগড়ার একটা আপোষ হ'ল। এদিকে মেথর ভাব্‌তে লাগ্‌ল,—"এইত সুযোগ! দরিদ্র ব'লে এত বয়সেও বিয়ে কত্তে পারিনি। কনে পাই ত' টাকা পাই না। আবার মেথরের মধ্যেও আমার কুল সকল মেথরের চেয়ে নীচ ব'লে ধার-কর্জ্জ ক'রে টাকা মিলে ত' কনে মিলে না। বিবাহের আমার প্রয়োজন এবং আজ ভগবান্ সে সুযোগ প্রদানও করেছেন দেখা যাচ্ছে।" এই না ভেবে মেথর তাড়া-তাড়ি ক'রে মলের ভাণ্ড যথাস্থানে রে'খে এসে স্নান ক'রে পরিষ্কৃত

পরিচ্ছন্ন হ'য়ে জটাবল্কল ধারণ ক'রে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মেখে একজন যোগী পুরুষের বেশে এসে রাজবাড়ীর ঠিক্ বিপরীতে পুষ্পোদ্যানের সাম্‌নে পাকা বাঁধান রোয়াকের উপরে ব'সে কপট ধ্যানে নিমগ্ন হ'ল। রাজা ও রাণী ঘুম থেকে উঠে রাজপ্রাসাদের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানের দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়ল। বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁরা নিরীক্ষণ কর্ল্লেন যে, জটাজুট-পরিহিত এক সৌম্যকান্তি দিব্যদর্শন মহাপুরুষ ব'সে আছেন। যোগী হ'লে'ই যোগী চিন্‌তে পারে, ভোগী কি কখনো যোগী চেনে? রাজা ও রাণী ভাব্‌লেন,—"ইনি সাক্ষাৎ মহেশ্বর, এঁর হাতেই কন্যা সম্প্রদান বিধেয়।" রাজা ও রাণী কৃতাঞ্জলি-পুটে বহু স্তব-স্তুতি ক'রে যোগী পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ কর্‌লেন এবং বল্‌লেন,—"হে প্রভু, আমরা কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন দম্পতী, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ ক'রে আমাদের নরক-সম্ভাবনা নিবারণ করুন। যোগী পুরুষ বল্লেন,—"দেখ, আমি একজন তপস্বী, আমার পক্ষে আমৃত্যু অকৃতদার থাকাই সঙ্গত, আমার পক্ষে বিবাহ কার্য্য সঙ্গত নয়। সুতরাং আমি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ কত্তে অক্ষম। রাজা তৎক্ষণাৎ রাজ পুরোহিতকে আহ্বান করালেন। এসব কঠিন আপত্তির জবাব দেওয়া ত' রাজার মত একজন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদের কর্ম্ম নয়! এজন্য চাই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। রাজকুল-পুরোহিত বল্লেন,—"হে যোগিশ্রেষ্ঠ, আপনার আপত্তি অতীব সঙ্গত সন্দেহ নেই, কেননা সাধক-সিদ্ধেরা কখনো মিথ্যা বাক্য ভ্রমেও উচ্চারণ করেন না, কিন্তু হে তাপসপ্রবর, দেবাদিদেব মহাদেব তপস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ এবং আদিগুরু, তিনি পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ ক'রে তপস্যা করেছিলেন। এতে তাঁর যোগ-বিঘ্ন হয় নাই। বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠও অরুন্ধতীকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করেছিলেন, তাতে তাঁর যোগ-বিঘ্ন হয় নাই। অগস্ত্যের ন্যায় উগ্রতপা মহর্ষিও লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, এতে তাঁর তপোবিঘ্ন হয় নাই। এমন কি, জরৎকারুর মত স্ত্রী-বিদ্বেষী মহাত্মাও শেষ পর্য্যন্ত আস্তিক মুনির জন্ম-

গ্রহণ- প্রয়োজনে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসুকীর ভগ্নীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শাস্ত্রে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অতএব হে যতি-শ্রেষ্ঠ, আপনিও অবশ্যই নিজ ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেই মহারাজ ও মহারাণীর প্রার্থনা পূরণ কত্তে পারেন।" যোগী পুরুষ এই কথার উত্তরে বল্‌লেন,—"আচ্ছা এ কথা যুক্তি-সঙ্গত, সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও একটী আপত্তি আছে। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, কি ক'রে আমি ক্ষত্রিয়-কন্যার পাণিগ্রহণ করি?" তখন বহু শাস্ত্র আলোচনা ক'রে রাজকুল-পুরোহিত বল্‌তে লাগলেন,—"হে যোগীশ্বর, পুরাকালে জমদগ্নি ঋষি ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়েও ক্ষত্রিয়-কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তাঁর নিন্দা হয় নাই। এই মাত্র যে অগস্ত্য মুনির কথা বল্‌লাম, তিনিও ক্ষত্রিয়-কন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন, এজন্য তাঁরও নিন্দা হয় নাই। উচ্চতর-বংশীয় বর নিম্নতর-বংশীয় কন্যাকে বিবাহ কচ্ছেন, এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব আপনি এ আপত্তি পরিত্যাগ করুন।" যোগী পুরুষ বল্‌লেন,—"এযুক্তি অখণ্ডনীয়, কিন্তু 'এই কন্যাকে গ্রহণ কর',—একথা রাজাই বলেছেন আর রাণীই বলেছেন। যাঁকে গ্রহণ কত্তে হবে, তাঁরও মতের প্রয়োজন। তাঁর অমতে বিবাহ হ'লে এমন অশান্তির সৃষ্টি হ'তে পারে যে, আমাকে সেই অশান্তিতেই যোগভ্রষ্ট হ'য়ে অনন্ত নরকে ডুব্‌তে হবে।" কথা শুনে রাজা-রাণী ভাব্‌লেন,—"কথাটা সত্য, মনের মিল না থাক্‌লে অশান্তি অনিবার্য্য। এজন্য পূর্ব্বেই কন্যাকে সম্মত করান ভাল।" রাজা ও রাণী কন্যাকে বুঝালেন যে, এমন শিব-সম যোগীশ্বর স্বামী খুব কম লোকেরই মিলে, অতএব তুমি এঁর গলে বরমাল্য অর্পণ কর। রাজ-কন্যা পিতামাতার কথার অনুগত হ'য়ে বরমাল্য নিয়ে যোগী পুরুষের কণ্ঠে অর্পণ ক'রে তাঁর পাদমূলে প্রণত হ'ল। তখন রাজ-পুরোহিত বল্লেন,—"প্রভো, এই বংশের কুলাচার-মতে শুধু বরমাল্যার্পণেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। শুভলগ্নে বৈদিক মন্ত্রাদির সাহায্যে সম্প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন কত্তে হয়; সুতরাং আপনি তদ্রূপ আদেশ করুন।" যোগিপুরুষ বল্লেন,—"তথাস্তু।" পাঁজি খুলে দেখা

গেল, তারপরের দিনই সন্ধ্যাকালে শুভলগ্ন আছে। সুতরাং সেই অনুসারে সকল উদ্যোগ-আয়োজন হ'তে লাগ্‌ল। রাজ্যময় হুলস্থুল প'ড়ে গেল। রাজকন্যার বিবাহ হবে, এক যোগি-পুরুষের সাথে তার বিয়ে হবে, সহস্র সহস্র নরনারী সেই যোগি-পুরুষকে দর্শন করার জন্য ভিড় কত্তে লাগ্‌ল, কেউ করে আরতি, কেউ দেয় ভোগ-নৈবেদ্য, সবাই করে প্রণাম। প্রহরীরাও প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে এ ভিড় আর থামাতে পারে না। বিবাহের দিন অপরাহ্নে সেই মেথরের মনে হ'তে লাগ্‌ল,—"তাইত', একজন যোগি-পুরুষের বেশ ধারণ করার ফলেই যখন এত সম্মান, এত পূজা, তখন প্রকৃত যোগি-পুরুষ হ'তে পার্লে না জানি কি হ'ত!" যোগিপুরুষের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হ'ল। তিনি বল্লেন,—"হে রাজন্‌, বিবাহ-লগ্নের আর তিন ঘণ্টা সময় দেরী আছে, এই সময়ের মধ্যে আমি আমার আরাধ্য দেবতার একটু অর্চ্চনা নীরবে কিছুকাল শ্মশানে ব'সে ক'রে আস্‌তে চাই,—তুমি ব্যবস্থা কর, এখন যেন কোনও জন-প্রাণীও আমার পশ্চাদনুসরণ কত্তে না পারে।" রাজা বল্লেন,—"সে কি কথা! বিবাহের দিন এবং তারপর থেকে এক বৎসরের মধ্যে কাউকে শ্মশানে গমন কত্তে নেই, এটী আমাদের কুলপ্রথা। যোগি-পুরুষ বল্লেন,—"কিন্তু আরাধ্য দেবতার আরাধনা না ক'রে আমিই বা কিরূপে বিবাহ কত্তে সম্মত হই?" তখন রাজ-কুলপুরোহিত বল্লেন,—"ইনি যখন সর্ব্বত্যাগী যোগি-পুরুষ, তখন গৃহস্থদের আইন এঁকে স্পর্শ করবে না, এঁকে অভিলষিত কার্য্যে বাধা না দেওয়াই সঙ্গত।" সম্মতি পেয়ে যোগি-পুরুষ একাকী শ্মশানে চ'লে গেলেন। শ্মশানের নিকটেই ক্ষুদ্র মেথর-পল্লী। দূরে রাজ-ধানীর উপরে কত আলোকমালার সজ্জা হচ্ছে, অদূরে মেথর-পল্লীতে নোংরা বস্তীতে ভাঙ্গা-কুটীরে মেথরেরা সস্ত্রীক মদ্যপান ক'রে আমোদ-প্রমোদ কচ্ছে। কোথায় অস্পৃশ্য অন্ত্যজ মেথর, আর কোথায় সর্ব্বজন-পূজিত রাজ-জামাতা যোগীশ্বর! কপট যোগীর দুই চক্ষু বে'য়ে দর-দর ধারে অশ্রুবিগলিত হ'তে লাগ্‌ল। একজন কপট যোগী সেজে আজ রাজকন্যার পাণিগ্রহণই শ্রেষ্ঠ, না, প্রকৃত যোগী হবার জন্য সংসার-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ? কপট-যোগী আর

কপট না থেকে অকপট-যোগী হবার উদ্দেশ্যে কপট বেশ-ভূষা পরিত্যাগ ক'রে অনিশ্চিত দেশের অভিমুখে রওনা হ'লেন এবং বহু দেশ অতিক্রম ক'রে এক নির্জ্জন প্রান্তরে ব'সে দীর্ঘকাল ধ'রে তপস্যা কত্তে লাগলেন। এদিকে বিবাহের লগ্ন অতীত হ'য়ে যায়! যোগিপুরুষ যে শ্মশানে গিয়েছেন, আর ত' ফিরেন না! শুভলগ্ন অতিক্রান্ত হ'লে আর ত' লজ্জার অবধি নেই! "খোঁজ" "খোঁজ" প'ড়ে গেল। মন্ত্রী এসে যুক্ত-করে রাজার নিকট জানালেন,—"মহারাজ, কোনও স্থানেই সেই যোগী পুরুষকে পাওয়া গেল না,—মুক্ত-জীবকে কি সংসার-বন্ধনে বাঁধা যায়?" রাজার ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠ্‌ল। কি এত বড় কথা? একটা মেয়ের জন্য নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক হবে? রাজা আদেশ দিলেন,—"জল্লাদগণ, দ্রুত আমার এই কুলঙ্কশা কন্যাকে শ্মশানে নিয়ে হত্যা কর, যতক্ষণ এই কন্যার মৃত্যু সংবাদ না শুন্‌ব, ততক্ষণ আর জলস্পর্শ কর্ব্ব না।" জল্লাদেরা যুক্ত করে রাজাকে প্রণাম ক'রে বল্‌লে,—"যে আজ্ঞা, মহারাজের আদেশ অমান্য কত্তে পারে কার সাধ্য?" রাজকন্যাকে ধ'রে জল্লাদেরা নিয়ে গেল শ্মশানে। এদিকে একটা দরিদ্র লোকের যুবতী স্ত্রী সেই দিন মারা গিয়েছে, আত্মীয়-বান্ধবেরা ঘাড়ে ক'রে শ্মশানে দাহ কর্ব্বার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। জল্লাদের সর্দ্দার জল্লাদদিগকে বল্‌লে,—"দেখ, রাজা-রাজড়ার ক্রোধ আর অনুগ্রহ সবই রহস্যময়। এই বলেছেন মেয়েকে হত্যা কর, আবার কালই হয়ত হুকুম হবে, যারা আমার মেয়েকে হত্যা করেছে, তাদের প্রাণদণ্ড দাও। সুতরাং এস, একটা বুদ্ধি করা যাক্‌। রাজকন্যাকে হত্যা না ক'রে কৌশলে ঐ মেথর-পল্লীতে নিয়ে মেথরদের পোষাক পরিয়ে রেখে আসি, আর এই যে মৃতদেহটী নিয়ে যাচ্ছে, একে রাজকন্যার পোষাক পরিয়ে মাথার সিঁদূর ঘ'ষে ঘ'ষে তুলে ফেলে তারপরে ছাগলের রক্ত মাখিয়ে রেখে দি।" যেমন কথা, তেমন কাজ। জল্লাদেরা রাজকন্যাকে নিয়ে মেথর-পল্লীতে ঢুকিয়ে মেথ্‌রাণীদের মত পোষাক পরালে, মেথ্‌রাণীদের মত সব ভারী ভারী রূপার কদর্য্য অলঙ্কার পরালে এবং তার কাপড়-চোপড়, স্বর্ণালঙ্কার সব খুলে নিয়ে এসে হঠাৎ ভূতের মত চীৎকার ক'রে যুবতী রমণীর

মৃতদেহকে আক্রমণ কর্ল্লে। আত্মীয়-পরিজনেরা ভূতের ভয়ে মৃতদেহ ফেলে যার যার প্রাণ নিয়ে পালাল। তখন জল্লাদেরা সেই মেয়েটীর কপালের সিঁদূর তেল-জল ঘ'ষে তুলে ফেলে সমগ্র শরীর জুড়ে রাজকন্যার সব অলঙ্কার পরিয়ে দিল, রাজকন্যার দামী শাড়ী, দামী ওড়না পরিয়ে দিল এবং মৃতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কত্তে বস্‌ল। সর্দ্দার-জল্লাদ বলতে লাগ্‌ল,—"হে সতি-লক্ষ্মি জননি, হে পুণ্যবতি সধবা, আজ আমরা তোমার নিষ্পাপ দেহ নীচ জাত হ'য়েও স্পর্শ করেছি এবং এখনই এ দেহ অস্ত্রবিদ্ধ ক'রে তারপরে পশুরক্তে রঞ্জিত কর্ব্ব, এ অপরাধ ক্ষমা ক'রো জননি! একটী জীবন্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্যই আমরা একাজ কচ্ছি, তুমি ক্ষমা ক'রো মা।" এই ব'লে সেই মৃতদেহকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম ক'রে সর্দ্দার শাণিত কৃপাণ সেই মৃতদেহের বক্ষে বিদ্ধ ক'রে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাঠা কেটে তার রক্ত ঐ মৃতদেহের বক্ষে মুখে খুব বেশী ক'রে এমন ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, যেন কোনও প্রকারে মুখ দেখে না চেনা যায়। এর পরে জল্লাদেরা বিষণ্ণ মুখে রাজার নিকটে গিয়ে নিবেদন কর্ল্ল যে, রাজকন্যার মৃত্যু হয়ে গেছে। রাজা জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—"কি ভাবে তাকে হত্যা করেছ?" সর্দ্দার বল্লে,—"মহারাজ, আমরা রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম যে, কি ভাবে তিনি মরতে চান? রাজ-কন্যা বল্লেন,—"জল্লাদ, নির্ব্বাচিত স্বামীর গলায় বরমাল্য অর্পণ ক'রেও যার বিবাহ হয় না, এজন্য যার পিতার কুলে কলঙ্ক পড়ে, তার উচিত স্বহস্তে কৃপাণ বক্ষে বিদ্ধ ক'রে মরা। কিন্তু আমি আজ বিবাহ হবে ব'লে সমগ্র দিবস উপবাসিনী আছি, এ জন্য কৃপাণ উপযুক্তরূপে গভীর ক'রে পরিচালন কত্তে পার্ব্ব না; সুতরাং তুমিই আমার বুকে কৃপাণখানা আমূল বিদ্ধ ক'রে দাও।" একথা বলেই সর্দ্দার জল্লাদ অশ্রু বিসর্জ্জন কত্তে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জল্লাদেরাও চখে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা ও রাণীর শোকের সমুদ্র যেন উথ্‌লে উঠ্‌ল। রাণী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন,—"কোথায় আমার সতী লক্ষ্মী কন্যার দেহ, আমি একবার জন্মের মতন দেখ্‌ব।" রাজা বল্লেন,—"চল সভাসদ্‌গণ, মৃত্যুদণ্ড দানের কালে যাকে বিন্দুমাত্র করুণা

প্রদর্শন করিনি, এখন তার মৃতদেহের রাজোচিত আড়ম্বরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করব।” রাজপুরোহিত বল্লেন,—“মহারাজ, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শবদেহ অস্নাত অবস্থায় দাহ কর্ত্তে হয়, এই এ দেশের প্রথা।” রাজা বল্লেন,—“তাতে দোষ কি? শত শত মণ ঘৃত, সহস্র সহস্র মণ চন্দন শ্মশানে নেওয়া হ’ল, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা এসে নরমেধ যজ্ঞের মন্ত্রসমূহ আবৃত্তি কর্ত্তে লাগ্‌লেন এবং সুসজ্জিত চিতার উপরে মৃতদেহ আরোহণ করান হ’ল। এদিকে প্রকৃত পক্ষে যে লোকদের আত্মীয়াটী মারা গেছেন, তারা ভূতের ভয়ে এতক্ষণ দূরে থাক্‌লেও, লোকজন আর আয়োজন-আড়ম্বর দেখে এসে সাম্‌নে দাঁড়াল। একজন বল্লে,—“ওরে, এ যে আমাদের বউদিরই মৃতদেহ!” আর একজন বল্লে,—“আরে থাম্, কথা বলিস্‌নে, নিশ্চয় একটা গোল বেঁধেছে। দেশের রাজা যদি বৌমার মুখাগ্নি করেন, তবে তাতে আমাদেরও ক্ষতি নেই, বউমারও ক্ষতি নেই। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার চ’খে দে’খে চুপ্ ক’রে থাকৃতে হয়, কথা বল্‌তে নেই। কথাটী বলেছ, কি মরেছ!” মহাতেজে অগ্নিদেব আকাশকে স্পর্শ করলেন, পুঞ্জীকৃত চন্দন-কাষ্ঠ, চুয়া, অগুরু ও হবির সংস্পর্শে চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তারিত হ’তে লাগ্‌ল, আর দিগ্‌বিদিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ’তে লাগ্‌ল, —“রামনাম সত্য হ্যায়।” মৃতদেহ দাহের পরে শ্মশান যখন জনহীন হ’ল, তখন, যাদের মরা, তাদের একজন একখানা অস্থি কুড়িয়ে নিয়ে গেল গঙ্গায় নিক্ষেপের জন্য। এদিকে মেথর-পল্লীর মেথরদের যখন মদের নেশা ভেঙ্গেছে, তারা দেখ্‌তে পেল যে পরমা সুন্দরী এক কন্যা তাদের মধ্যে এসে ব’সে আছে। তারা বল্লে,—“তুমি কে?” রাজকন্যা বল্লে,—“আমি এক মেথরের মেয়ে, আমার বাপও নেই, মাও নেই, কোথাও কোনো আশ্রয় নেই, বিয়েও হয়নি, তাই আমি আশ্রয়ের জন্য তোমাদের এখানে এসেছি।” একটী বয়স্কা মেথরাণী বল্লে,—“এসেছ বাছা, ভাল করেছ, আমার একটী ছেলে ছিল, ক’দিন ধ’রে তার কোনো খোঁজ নেই, আমি একাকিনী থাকি, তুমি আমার সঙ্গে থাকৃলে

আমার একা-একা ভাবটী থাকবে না।” রাজকন্যার একটী আশ্রয় মিলে গেল। এই বয়স্কা মেথরাণীটী কিন্তু হচ্ছে সেই যোগিপুরুষের পিসিমা। সে চলে গেছে ব'লে এই পিসিমা একা একা প্রতিদিন শেষরাত্রে রাজবাড়ী যায়, আর ময়লা পরিষ্কার করে ; ফিরে এসে রাজবাড়ী সম্পর্কে কত জানা-অজানা সত্য-মিথ্যা কাহিনী বলে, রাজকন্যা সব নীরব হ'য়ে শোনে। এভাবে প্রায় এক বৎসর যায়। রাজকন্যা মেথ্‌রাণীর ঘরে থেকে পিসিমার খুব যত্ন করে, মেথর-মেথ্‌রাণীর দল রাজবাড়ীর পূজা-পার্ব্বণে কত রং-তামাসা দেখ্‌তে যায়, এই মেয়েটী কুটীর ছাড়ে না। এদিকে দুই বৎসর কাল চ'লে গেল। সত্যকারের বৈরাগ্য যার আসে, তার অল্প সাধনেই সিদ্ধি লাভ হয়। যোগিপুরুষ তপস্যা কত্তে কত্তে উপলব্ধি কল্লেন,—জগতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, ব্রহ্ম-সম্বন্ধই সত্য সম্বন্ধ, জগতের অপর সকল-কিছু শুধু অনিত্য বস্তু এবং লৌকিক আচার। যোগিপুরুষ অনুভব কল্লেন,—ব্রহ্মে সর্ব্ব বস্তু দর্শন এবং সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শনই হচ্ছে সত্যদর্শন। নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে রত থেকে যদি কেউ মেথরের কাজও করে, তবু সে ঘৃণ্য নয়, অব্রহ্মদর্শী রাজা অপেক্ষা ব্রহ্মদর্শী মুচি শ্রেষ্ঠ। যোগিপুরুষ মানবজীবনের সত্যজ্ঞান লাভ ক'রে গৃহে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, কার একটী কুমারী মেয়ে পিসিমার খুব সেবা-পরিচর্য্যা কচ্ছে। দুদিন যেতেই যোগিপুরুষের খেয়াল হ'ল যে, এই মেয়েটী ত' বুঝি সেই রাজকন্যাই হবে। কিন্তু মনের অনুমান গোপন রেখে, রাজকন্যাকে বল্‌লেন,—“দেখ, ব'সে ব'সে খাওয়াত' ভাল নয়, আমি যে কাজ করি, সে কাজে তোমার সাহায্য করা উচিত। এতদিন পিসিমা কষ্ট ক'রে একা একা খেটেছেন, আর তুমি ব'সে ব'সে খেয়েছ, এটা ত' ভাল কথা নয়।” রাজকন্যা নতমুখে বল্ল,—“আমার ত' এসব নীচ কাজ অভ্যাস নেই।” এই ব্যক্তি যে সেই ব্যক্তি, তাত, আর রাজকন্যা জানে না! যোগিপুরুষের জটা-বল্কলাদি বাহ্য চিহ্ন কিছুই নেই, তাঁকে যোগিপুরুষ বলে কেউ জানেও

না। আমরা শুধু বল্‌বার সুবিধার জন্য তাঁকে যোগিপুরুষ বল্‌ছি। রাজকন্যা যখন বল্লে,—"মলভাণ্ড মস্তকে বহন করা নীচ কাজ," যোগি-পুরুষ তখন তাকে বুঝাতে লাগ্‌লেন,—"দেখ কন্যা, এজগতে উচ্চ কাজ আর নীচ কাজ ব'লে যে ভেদ দেখান হয়, সেটা নিতান্ত কল্পিত। একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতে নিত্য কাল নিমগ্ন হ'য়ে থাকাই উচ্চ কাজ। জগতের অপর সকল কাজই নীচ কাজ। ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন হয়ে যে মাংস-বিক্রয় করে, ব্রহ্মরসের অনাস্বাদী পণ্ডিত ব্রাহ্মণের চেয়ে সে উচ্চ। ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন হ'য়ে যে মল-পরিষ্কার করে, ব্রহ্মরসে বঞ্চিত ক্ষত্রিয় রাজার চেয়ে সে উচ্চ। যে যেমন কুলে দেহ লাভ করেছে, অথবা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে যে যেরূপ স্থানে জীবন যাপন কত্তে বাধ্য হয়েছে, সে তার পক্ষে অনুকূল জীবিকা অবলম্বন ক'রে পরকে প্রবঞ্চনা না ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন কর্ব্বে,—এর ভিতরে উচ্চতা বা নীচতার কোনো প্রশ্ন উঠে না কন্যা।" ব্রহ্মজ্ঞ যোগী মেথররূপে বাইরে প্রতিভাত হ'লেও সহজেই নিজ উপদেশের দ্বারা রাজকন্যার মনের দ্বিধা দূর ক'রে দিলেন। রাজকন্যা শেষ রাত্রিতে উঠে যোগিপুরুষের সাথে রাজবাড়ীর পাইখানা পরিষ্কারের জন্য গেল। এই না তার পিতৃগৃহ, ঐ না শুনা যায় তার জননীর দীর্ঘশ্বাস, এই স্বর্ণপুরীতেই না তার জন্ম হয়েছিল, এই পুরীতেই না সে একদিন কত সুখে জীবন যাপন করেছিল, আর এইখানেই আজ সে রাজকন্যা পাইখানা পরিষ্কার কর্ব্বার জন্য এসেছে। যোগিপুরুষ বল্লেন,—"কন্যা, কাঁদছ কেন?" রাজকন্যা বল্ল,—"এইটী আমার পিতৃগৃহ, তাই আমার মনে শোক উপস্থিত হয়েছে।" মলের ভাণ্ড মাথায় ক'রে পথ-পর্য্যটন কত্তে কত্তে যোগিপুরুষ রাজকন্যাকে উপদেশ দিতে লাগলেন,—"হে রাজকন্যা, ইনি পিতা, উনি মাতা, এঁর সঙ্গে সংযুক্ত হ'লাম, তাঁর কাছ থেকে বিযুক্ত হ'লাম, এই সব কথা চিন্তা ক'রে শোকাকুল হয় অজ্ঞানেরা। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জানেন, সংসারে কারো সঙ্গেই কারো সম্বন্ধ নিত্য নয়, একমাত্র নিত্য সম্বন্ধ পরব্রহ্মের সাথে। সেই সত্য সম্বন্ধকে যিনি জানেন, তিনি কোনো শোকেই

অভিভূত হন না।” এই ভাবে রোজই রাজকন্যা যোগিপুরুষের সাথে মেথরের কাজ কত্তে যায় এবং যেতে ও আস্‌তে অবিরাম তত্ত্বোপদেশ শোনে। একদিন যোগিপুরুষ বল্লেন,—“রাজকন্যা, তোমার এখন বিবাহ করা উচিত।” রাজকন্যা বল্লে,—“বিবাহ কি ক’রে হবে, কার সঙ্গেই বা হবে ?” যোগিপুরুষ বল্লেন,—“কেন, আমার সঙ্গে !” রাজকন্যা বল্লে,—“অসম্ভব !” যোগিপুরুষ বল্লেন,—“কেন অসম্ভব ?” রাজকন্যা বল্লে,—”আমি এক যোগিপুরুষের গলায় বরমাল্য অর্পণ করেছিলাম, তিনি বিবাহে সম্মত হ’য়েও বিবাহ লগ্নের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে কৌশলে পলায়ন করেন। আমি দিবারাত্রি তাঁকেই আমার স্বামী ব’লে ধ্যান কচ্ছি। এই কারণে আমি আর কাউকে বিবাহ কত্তে পার্ব্ব না।” যোগিপুরুষ বল্লেন,—“আচ্ছা, সেই যোগিপুরুষকে যদি পাও ?” রাজকন্যা বল্লে,—“তবে আমি বিয়ে কর্ব্ব।” যোগিপুরুষ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন,—“তবে আমাকেই বিয়ে কত্তে হবে !” রাজকন্যা বল্লে,—“কি রকম ?” যোগিপুরুষ বল্লেন,—“মানে, আমিই সেই যোগিপুরুষ, তোমার পিতামাতার মুখের কথা শুনে, যোগী সেজে গিয়ে আমিই সেখানে বসেছিলাম, আমারই গলায় তুমি বরমাল্য দিয়েছিলে।“ রাজকন্যা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। যোগিপুরুষ বল্লেন,—“অবাক্ হয়ে যেয়ো না, ঘরে চল।” গৃহে গিয়ে যোগিপুরুষ স্নান ক’রে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মেখে কৃত্রিম জটা-বল্কলাদি পরিধান ক’রেই ধ্যানে বস্‌লেন। রাজকন্যা দেখেই চিনতে পার্‌ল যে, এই সেই ব্যক্তি। রাজকন্যা অবলুণ্ঠিত হ’য়ে তার চরণে প’ড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল,—“হে আমার জীবন-প্রভু, তুমি যোগীই হও, আর মেথরই হও, আমার পক্ষে তুমিই জীবনারাধ্য প্রিয়তম।” এবার আর যোগীর কপট ধ্যান নয়। গভীর-ধ্যান-নিমগ্ন যোগিপুরুষের ধ্যান বহু কাল পরে ভঙ্গ হ’লে তিনি বল্লেন,—“হে রাজকন্যা, শুভলগ্ন উপস্থিত, এস আমাদের বিবাহ হোক।” মেথরদের পুরোহিতকে ডাকা হ’ল, মেথরদের কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহ হ’ল, তারপরে বরকন্যা চল্লেন পাল্কীতে চ’ড়ে রাজদর্শন কত্তে। মেথরদের ঢোলক-বাদ্য বাজ্‌তে লাগ্‌ল, আর বর ও কনের দুই খানা পাল্কী এসে

রাজপ্রাসাদের দ্বারে দাঁড়াল। রাজা তাঁর সভা থেকে হুঙ্কার ছেড়ে সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা কর্লেন,—"কে হে এই দুঃসাহসী ব্যক্তি, যে রাজপ্রাসাদের দুয়ারে এসে ঢোলক বাজাতে সাহস পায়?" সেনাপতি বল্লেন,—"মহারাজ, মেথরদের একটী বর এবং একটী কনে বিবাহের পরে রাজা-রাণীর দর্শনের জন্য পাল্কীতে চ'ড়ে এসেছে।" রাজা বল্লেন,—"কি! এতবড় সাহস যে, পাল্কীতে চড়ে রাজবাড়ীতে আসে!" এরমধ্যে বর আর কনে রাজ-সভাতে ঢুকে পড়েছেন। বর বল্লেন,—"মহারাজ, বিবাহের পরে মাতৃ-পিতৃ চরণ-বন্দনা আমাদের কুলের প্রথা। এই জন্যে চরণ-বন্দনা কত্তে এসেছি।" রাজা বল্লেন,—"মাতৃ-পিতৃ-চরণ বন্দনা! এর মানে?" এদিকে এ সব কাহিনী অন্তঃপুরে ব'সে শুনে মহারাণীও তামসাটা দেখ্বার জন্য রাজসভাতে স্বর্ণ-সিংহাসনে মহারাজার বামপার্শ্বে এসে বসেছেন। বর বল্লেন,—"হ্যাঁ মহারাজ, আপনারা আমাদের মাতাপিতা।" এই কথা ব'লেই উভয়েই প্রথমে মহারাণীকে প্রণাম ক'রে পরে রাজাকে প্রণাম কল্লেন। আগে কেন মহারাণীকে প্রণাম করা হ'ল রাজ-পুরোহিত এই প্রশ্ন কর্লেন। বর বল্লেন,—"হে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীর মাতাই স্বামীর মাতা, স্ত্রীর পিতাই স্বামীর পিতা। স্বামী এবং স্ত্রী অভেদ ব'লে এই সিদ্ধান্ত সজ্জনগণ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তদুপরি মাতা গর্ভধারণ-পোষণাৎ পিতার চেয়ে গরীয়সী। এই কারণেই প্রথমে আমরা জননীকে প্রণাম করেছি। পূজনীয়া মহারাণী আমার স্ত্রীর গর্ভধারিণী জননী।" এই কথা ব'লেই বর কনের মাথার ঘোম্টা নিজ হাতে টেনে খুলে দিলেন এবং নিজে বরের বেশ পরিত্যাগ ক'রে যোগিপুরুষের জটা-বল্কল ধারণ কর্লেন। সভাস্থলে যেন বজ্রপাত হ'ল। যেন ইন্দ্রজাল-বিদ্যার খেলা চলেছে। বিস্ময়ের বেগ একটু প্রশমিত হ'লে রাজা জল্লাদের সর্দ্দারকে ডাক্লেন। বল্লেন,—"সর্দ্দার, তুমি না বলেছিলে, আমার কন্যা নিহত হয়েছে?" সর্দ্দার যুক্তকরে প্রণাম ক'রে বল্লে,—"হে মহারাজ, একদিন হয় ত' এই রাজকন্যার জীবিত থাকার প্রয়োজন অনুভূত হবে, এই কথা ভেবে সেদিন আমরা রাজকন্যাকে অন্যত্র রেখে

অপর মৃতদেহে রক্ত ছড়িয়ে কৃপাণ বিদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম। মহারাজ! আপনারা ছিলেন শোকাচ্ছন্ন, এজন্য কিছু বুঝতে পারেন নি।" সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও রাণীর দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগ্‌ল। রাজা বল্লেন,—"কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না যে, এ কি হেঁয়ালী?" বর বল্লেন,—"মহারাজ, আমি আপনার বাড়ীর মেথর। শেষ রাত্রে শুন্‌লাম, আপনি এবং মহারাণী বলাবলি কচ্ছেন যে, প্রাতে রাজপ্রাসাদের বাইরে গিয়ে প্রথমে যার মুখদর্শন করবেন, তাকেই কন্যা-সম্প্রদান কর্বেন। আমি যোগী সেজে ব'সে রইলাম আর আপনারা গিয়ে আমায় আদর-আপ্যায়ন সুরু ক'রে দিলেন। বিবাহের লগ্ন হবার কয়েক ঘণ্টা আগে আমার প্রাণে বৈরাগ্য এল। মনে হ'ল, যোগীর বেশ ধারণের ফলেই যদি এত, তবে প্রকৃত যোগী হ'তে পার্লে না জানি কি হবে। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় ছুটে পালালাম এবং সুদূর এক প্রান্তরের পার্শ্ববর্ত্তী গোপন এক গুহায় ব'সে পূর্ণ দুই বৎসরকাল ব্রহ্মচিন্তা ক'রে কাটালাম। হঠাৎ আমার অনুভবে এল, নিখিল জগতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব অলীক কল্পনা। ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদন কত্তে কত্তে সংসার ও সন্ন্যাস আমার নিকট সমান ব'লে প্রতিভাত হ'তে লাগ্‌ল। আমি ভাব্‌লাম, অন্তরে যদি থাকি যোগস্থ, তাহ'লে বাইরে আমি মলভাণ্ড মস্তকে বহন ক'রে বেড়ালেও আমার ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনের কোনও ত্রুটী হবে না। এই ভেবে গৃহে ফিরে এসে দেখি, রাজকন্যা আমারই বৃদ্ধা পিসীমার সেবা কচ্ছেন। রাজকন্যার মুখে শুন্‌লাম, সেই যে তিনি যোগিপুরুষের গলদেশে মাল্যার্পণ করেছিলেন, তারপর থেকে আর ক্ষণকালের জন্যও পুরুষান্তরে মনকে নিক্ষেপ করেন নি। তখন আমি আমার প্রকৃত পরিচয় তাঁকে প্রদান কর্লাম এবং তাঁরই সম্মতি নিয়ে মেথরদের কুলপ্রথানুযায়ী তাঁকে বিবাহ কর্লাম,—কারণ, শাস্ত্রেই কথিত আছে যে, ত্রিকালদর্শী যোগীশ্বর মহাদেবের তুল্যও যদি কেউ হয়, তবু তার উচিত নয়, লৌকিক সদাচারকে লঙ্ঘন করা।" রাজকুল-পুরোহিত বল্লেন,—"হে যোগিবর, আমরা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, মেথর-কুলে আপনার জন্ম হ'লেও আপনি তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েছেন।

পুরাকালে কবস ঋষি শূদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেও তপস্যার বলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, জাবাল ঋষি অজ্ঞাত-কুল-জাত হ'য়েও বেদজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন, মাতঙ্গ ঋষি চণ্ডাল-কুলোদ্ভব হ'য়েও চতুর্ব্বর্ণের পূজ্য হয়েছিলেন, আর তপস্যার বলে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার ইতিহাস ত' ভুবন-বিদিত। তপস্যার প্রভাবে একই দেহের জাত্যন্তর লাভ ভারতীয় আর্য্য-সমাজে নূতন নয়। আপনি মেথরকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েছেন। অতএব হে যোগিপুরুষ, আপনার বিবাহ মেথরদের কুলপ্রথানুযায়ী হওয়া সঙ্গত হয় নাই। ব্রাহ্মণদের প্রথানুযায়ী পুনরায় বিবাহ সম্পাদিত হওয়া দরকার।" বর বল্লেন,— "আপনাদের যদি তাই আদেশ হ'য়ে থাকে, তবে এতে আমার আপত্তির কিছু নেই।" রাজা জানু পেতে ব'সে যুক্ত করে বলতে লাগ্‌লেন,—"হে যোগিপুরুষ, তুমি আজ আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করেছ। আমি ক্ষত্রিয় হয়েও এতদিনে ব্রাহ্মণত্বের পথে এককণা অগ্রসর হ'তে পার্‌লাম না, আর তুমি মেথরের ঘরে জন্মেও সামান্য একটা কারণকে উপলক্ষ ক'রে দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হয়েছ। জাতিভেদাদি প্রথা এক জাতিকে চিরকাল ছোট- ক'রে রাখার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, নিজ নিজ কৌলিক জীবিকা নিশ্চিত ও স্থির রাখবার জন্যই জাতিভেদ প্রথা এবং যাতে নিম্নতর জাতি উচ্চতর শ্রেণীতে নিজ ত্যাগ, তপস্যা, বিদ্যা ও সদাচারের বলে উন্নীত হ'তে পারে, তার ক্রমবিধানের জন্যই জাতিভেদ। তুমি জাতিভেদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছ এবং নিজ পুণ্যবলে আজ ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করেছ। আর ধিক্ আমাকে, আমি এখনও রাজ্যসুখে প্রমত্ত হ'য়ে আছি। হে যোগিপুরুষ, এই নাও আমার রাজত্ব, এই সিংহাসনে ব'সে তুমিই রাজ্য পালন কর, আমি তপস্যার জন্য বনে চল্লাম!" বর বল্লেন,—"মহারাজ! আমি যদি ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'রে থাকি, তবে আর সিংহাসনে বস্‌ব কেন? নৈমিষারণ্যের পাদপচ্ছায়া আমারই না আমৃত্যু তপস্যার জন্য সৃষ্ট হয়েছে! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন, আমরা তপোবনে গিয়ে তপস্যা ক'রে জগতের কল্যাণ সাধন কর্ব্ব।"

গল্পটী শেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেমন হে রামশঙ্কর, গল্প না শুন্‌তে চেয়েছিলে ?

শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর মিশ্র বলিলেন,—এ যে সত্য ঘটনার চেয়েও উপদেশ-পূর্ণ কাহিনী !

পুপুন্‌কী

২রা কার্ত্তিক, ১৩৩৯

প্রাতঃকালীন স্নান-ধ্যানাদির পর শ্রীশ্রীবাবা কতকগুলি স্থানে পত্র লিখিতে বসিলেন ।

জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ধন

কিশোরগঞ্জ-(ময়মনসিংহ)-নিবাসী জনৈক ভক্তকে লিখিলেন,—

"জন্মে জন্মে যে অমৃতময় অখণ্ডনাম তোমরা সাধিয়াছ, এই জন্মে তাহাই পাইয়াছ। এই নামেরই মহিমা নিম্নতর জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ জন্ম মনুষ্যত্বে তোমাদিগকে উপনীত করিয়াছে। নামই তোমাদিগকে পুনরায় দেব-জন্ম প্রদান করিবে।"

জীবন তাঁর লীলা-বিকাশ ; কর্ম্ম অমরতার অভিযান

ভবানীপুর-(কলিকাতা)-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন;—

"নামের অমৃতরসে জীবন যৌবন ডুবাইয়া দাও। স্বার্থবুদ্ধি এবং পঙ্কিল লালসাকে নামের পরশ-মণি স্পর্শে দিব্যীভূত করিয়া লও। জীবন হউক পরমাত্মার পবিত্র লীলার অত্যাশ্চর্য্য এক বিকাশ, কর্ম্ম হউক বন্ধনহীন অমরত্বের অভিযান।"

নাম ভুলিওনা

কালীঘাট-(কলিকাতা)-নিবাসিনী জনৈকা মহিলা ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভগবানের প্রেমমাখা মধুময় নাম নিমেষের জন্তও ভুলিও না। নাম ভুলিয়া থাক বলিয়াই সংসারের বিপদে মুহ্যমান হও। তাঁর নামের দিব্যালোকে যার স্মৃতিপথ আলোকিত, সুখদুঃখ শুভাশুভ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না।"

নাম সর্ব্ব-ব্যথা-হারী

ত্রিপুরা-হায়দ্রাবাদের জনৈকা মহিলা ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সংসারের সহস্র দুঃখ-তাপে যখন বড়ই জর্জ্জরিত হইবে, তখন ভগবানের মঙ্গলমধুময় অমৃতমাখা নাম স্মরণ করিও। নাম তোমার সকল ব্যথা হরণ করিবে।"

সংসারাশ্রমী হও, সংসারী হইও না

ত্রিপুরা-আকুবপুর নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তুমি বৃথা চিন্তা করিতেছ। এমন কোনও বিপদ তোমার আসিতেছেনা, যাহার আতঙ্কে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িতে হইবে। যুবতী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যুবক স্বামীকে সাধারণতঃ যে সকল মনোধারার সম্মুখীন হইতে হয়, তোমার বিপদ ততটুকুই। সাধনের বলে তুমি এই বিঘ্ন বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে। নামে গভীর অভিনিবেশ দাও,—যৌবনের তারল্য তোমার পক্ষে বালকের সারল্যে পরিণত হইবে।

"তরুণী-সংস্পর্শে বাস করিবে, চিত্তবিকার আসিবে না, এমন ঘটনা সাধারণ প্রকৃতির বাহিরে। যতক্ষণ তুমি সাধারণ প্রকৃতির দাস, ততক্ষণই তোমার পক্ষে যুবতী-স্ত্রী-সান্নিধ্য বিপদের কারণ। কিন্তু সাধন-বলে নিত্যা প্রকৃতিকে লাভ কর,—স্বামি-স্ত্রীতে মিলিয়া নিত্যানন্দময় ধামে বাস কর।

"সহস্র চাঞ্চল্য ও অধীরতার মধ্য দিয়াই জীবন গড়িয়া চল। সহ-ধর্ম্মিণীর মূর্ত্তিতে তোমার পরমারাধ্যের মূর্ত্তিটী চিন্তা করিও,—ইহাই ক্রমে শত অসাফল্যের মধ্য দিয়া স্থিতপ্রজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত করিবে। দেহের প্রতি দেহের আকর্ষণ ত' থাকিবেই,—জগতের একটী পরমাণুও অপর পরমাণু

হইতে এই আকর্ষণের দাবী এড়াইয়া চলিতে পারে না। কিন্তু মনকে দেহাতীত পরব্রহ্ম-সত্তায় ডুবাইয়া রাখিলে দেহধর্ম্মের মধ্য দিয়াও দিব্যজ্যোতিরই বিকাশ ঘটিতে থাকে। অথবা অন্য ভাষায়, পরমাত্মচিন্তা দেহকে বিদেহ-তত্ত্বে পরিণত করিয়া লৌকিক আকর্ষণকে অসম্ভব করিয়া তোলে।

"আশ্রম তোমার সংসারীর, কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কেন সংসারীই রহিয়া যাইবে? স্ত্রীকে বুকে ধরিয়াও তুমি প্রাণময় প্রভুর পবিত্র সঙ্গের স্পর্শ ধ্যানযোগে আস্বাদন কর। দেখিও, রিপুকুল স্তব্ধ হইয়া যোজন দূরে দাঁড়াইয়া রহিবে, তাহাদের শস্ত্রসঙ্কুল উদ্যত বাহু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।"

নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠতা কোথায়?

উক্ত ভক্তের পত্নীকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সন্ন্যাসীর শিষ্য হইতে তোমার বড়ই আপত্তি ছিল। কারণ বোধ হয়, সন্ন্যাসীরা ভোগ-বিমুখ। কিন্তু আমি বলি, সন্ন্যাসীরাই যথার্থ ভোগী, কারণ তাঁহারা নিকৃষ্ট ভোগ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ভোগের অনুসরণ করে। যে সুখ অনিত্য, তাহা পরিহার করিয়া নিত্যসুখ লাভের জন্যই ত' মা প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত।

"অবশ্য আমি বলিতেছি না যে, তোমরা সবাই সংসার ছাড়িয়া আমার মত পরিব্রাজক সাজ। পরন্তু, সংসারের মধ্যে থাকিয়াই তোমরা পরমানন্দ-সম্ভোগ কর। তোমাদের গর্ভেই যুগে যুগে জন্মিতে চাই; তাই আমি চাই, তোমরা সত্য সত্য গর্ভধারিণী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর।

"দেহমন যার পবিত্র নয়, তার গর্ভে জগৎ-পাবন মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হন না। অপবিত্র গর্ভের অত্যুৎকট পূতিগন্ধ তাঁহাদের ধ্যানস্থ চিত্তকেও প্রপীড়িত করে। তাই তাঁহারা দূরে সরিয়া দাঁড়ান এবং অপবিত্রাত্মাদিগের জন্যই অনুপযুক্ত গর্ভের প্রবেশ-পথ ছাড়িয়া দেন।

"ইচ্ছা করিলেই তোমার জঠরকে তুমি যীশু, বুদ্ধ, শঙ্করের ন্যায়,

নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের ন্যায়, শিবাজী, প্রতাপ, গোবিন্দের ন্যায় মহামানবের জন্ম রাখিতে পার। আবার ইচ্ছা করিলেই তুমি একপাল শূকর-ছানার জন্মদাত্রী হইয়া আমৃত্যু বিষ্ঠা-মূত্রে ডুবিয়া থাকিতে পার। কোনটাতে তোমার সাধ, তাহা নিজে বুঝিয়া বিচার কর। প্রথমোক্ত পথেই আমি তোমাদিগকে পরিচালিত করিতে চাহি। এজন্যই বুঝি মা তোমরা আমাকে ভয় পাও?

"ভয় পাও খামাখা। মানুষের মত মানুষ প্রসব করার মধ্যেই ত' নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠতা। ছাগপালের জননীর জন্য জগতে কোথাও পূজার অর্ঘ্য সজ্জিত নাই। কিন্তু মা, সংযম ছাড়া, ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া, ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপরে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন ছাড়া এ জগতে কেহ কখনও মানুষের মত মানুষ গর্ভেও ধরে নাই, প্রসবও করে নাই।"

দাম্পত্য সংযমের কৌশল

রহিমপুর আশ্রমের নিকটবর্ত্তী কোনও এক গ্রামনিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তিন বৎসরব্যাপী সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্য পালনের যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছ, এই ব্রতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তোমরা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যথাসাধ্য সতর্ক ও যত্নপরায়ণ থাকিও। এই সংযম তোমাদিগকে মহত্তর কর্ত্তব্যপালনের যোগ্যতা প্রদান করিবে।

"কোনও কোনও স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে দুই চারিজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির সহিত আলাপ হইয়া থাকে, যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে নিতান্ত অমূলক ভ্রান্তিবশতঃ দাম্পত্য জীবনের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে দারুণ বিরোধি-ভাবাপন্ন। ইহাদের বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য অল্পায়ুতা বিধান করে এবং দাম্পত্য জীবন হইতে প্রীতি, স্নেহ, সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিকে নির্ব্বাসিত করে। আমি বজ্রকণ্ঠে এই দুই ভ্রান্ত মিথ্যার প্রতিবাদ করিতেছি। শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসকালে সীতাদেবীর সহিত কোনও প্রকার দৈহিক ব্যবহারে লিপ্ত হন নাই,—ইহা কি তাঁহা-

দের স্নেহ, প্রীতি, সহানুভূতি নষ্ট করিয়াছিল? তোমরা নিজ নিজ জীবনের তপঃপূত আচরণের দ্বারা কার্য্যতঃ এই সকল মিথ্যা ধারণাকে ভস্মীভূত কর। সাধনে রুচির অভাবই একদল বুদ্ধিমান লোককে ব্রহ্মচর্য্যে অনাস্থাবান করিয়াছে। কিন্তু সাধনের দ্বারা যে-কোনও ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যের সম্ভাব্যতা, ইহার উপযোগিতা, ইহার সার্থকতা ও ইহার বহুমুখ প্রভাব দুই চারি মাসেই বুঝিতে সমর্থ হয়। দেশে সাধকের অভাব, তাই প্রকৃত ব্রহ্মচারীরও অভাব।

"শুধু সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ব্রহ্মনামের চরণতলে নিজেকে সম্যক্ সমর্পণের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মচর্য্য আসে। ব্রহ্মসাধনায় নিজেকে বিকাইয়া দাও, ইহার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মচর্য্য জাগ্রত হইবে।

"তোমার পত্নীকে তুমি নিয়ত পরমাত্মারই প্রতিমা বলিয়া জান, রক্তমাংসের ঢেলা বলিয়া জ্ঞান করিও না। খড় ও মাটি দিয়া তৈরী করা পুত্তলিকাকে এতকাল যে শ্রদ্ধা যে পূজা নিবেদন করিয়া আসিয়াছ, তাহার সহস্রগুণ শ্রদ্ধা পূজা স্বকীয় পত্নীর মানবী তনুর প্রতি অর্পণের মনোভাব অর্জ্জন কর। তোমার স্ত্রীও তোমাকে পরমাত্মারই বিগ্রহ বলিয়া ধ্যান করুক। একজন আর একজনকে নিয়ত প্রণবের দ্বারা পরিবেষ্টিতরূপে দর্শন কর। একজন অপরের চখে মুখে বুকে অবিশ্রান্ত কল্পনার বলে অবিরত ভগবানের নামই অঙ্কিত করিতে থাক, বিদ্যুদুজ্জ্বল পবিত্র ওঙ্কার তোমাদের নেত্রদ্বয়ের উপরে উপনেত্রের ন্যায় বিরাজ করুক। ইহাই সংযম-প্রতিষ্ঠার অমোঘ কৌশল।"

ভোগলোলুপতা দমনের কৌশলসমূহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-(ত্রিপুরা)-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মদ্যপান করিতে করিতে একদিন আপনিই পানাসক্তি কমিয়া যাইবে, এইরূপ যুক্তি বড় বিপজ্জনক। কোনো কোনো মদ্যপ যে এরূপ যুক্তির আশ্রয় লয় না, তাহা নহে। কিন্তু পরিণামে তাহাদের মদ্যপান পরিত্যাগ করা আর হইয়া উঠে না। তোমার প্লীহা কাটিতে পারে,

তোমার যকৃৎ পাকিতে পারে, কিন্তু পান করিতে করিতে পানাসক্তি কিছুতেই দূর হইতে পারে না। পানাসক্তি দূর করিবার পন্থা অন্যরূপ। মদ্যপানের কুফল চিন্তা দ্বারা পানাসক্তি কিঞ্চিৎ কমিয়া থাকে। মদ্যপ-দের সংসর্গ পরিত্যাগের দ্বারাও পানাসক্তি হ্রাসের সাহায্য হয়। যেখানে মদ্যপানের সুখ্যাতি কীর্ত্তিত হয়, এমন স্থান হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা দ্বারাও পানাভ্যাস বর্জ্জনে সাহায্য হয়। পীত মদ্যের পরিমাণ কঠোর সঙ্কল্পের বলে ক্রমশঃ কমাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে তাহা দ্বারাও এই বিষয়ে কতক উপকার পাওয়া যায়। সুরাপান যতই জঘন্য কার্য্য হউক, এক লক্ষ বার নাম জপ না করিয়া এক আউন্স মদ্যও পান করিব না, এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠার দ্বারাও বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। পরি-শেষে প্রাণ যাউক, ক্ষতি নাই, তথাপি মদ্য স্পর্শ করিব না বা ইহার নাম মুখে আনিব না, এইরূপ দৃঢ়তার দ্বারা মদ্যপানাসক্তি বিজিত হয়। কিন্তু মদ্যপানের অপেক্ষা অধিকতর মাদক কোনও নেশায় আসক্ত হইতে পারিলে, সুরাপানের প্রবৃত্তি সমূলে নাশ পায়। আমি ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবার বিষয়ে কহিতে গিয়া তোমার নিকটে সুরাপানাসক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। নামের রসে মজিতে চেষ্টা কর, কামের রস আপনি শুষ্ক হইয়া যাইবে। নামে যে মজে, কামে তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না।"

মাতৃঋণ

মেদিনীপুর-নিবাসী জনৈক লোকহিতব্রত ভদ্রলোককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মহিলা-সমাজের উন্নতির জন্য তুমি যে প্রতিনিয়ত কোনও না কোনও একটী পরিকল্পনা লইয়া নিজের মনকে ও অর্থকে নিয়োজিত রাখিতেছ, ইহা দর্শনে আমি আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচীনকালে পিতৃঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতি ঋণই পরিশোধের কথা উপদিষ্ট হইয়াছিল। মাতৃঋণ শোধের কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মাতৃঋণ পরিশোধের জন্যও আপ্রাণ অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

দের স্নেহ, প্রীতি, সহানুভূতি নষ্ট করিয়াছিল? তোমরা নিজ নিজ জীবনের তপঃপূত আচরণের দ্বারা কার্য্যতঃ এই সকল মিথ্যা ধারণাকে ভস্মীভূত কর। সাধনে রুচির অভাবই একদল বুদ্ধিমান লোককে ব্রহ্মচর্য্যে অনাস্থাবান করিয়াছে। কিন্তু সাধনের দ্বারা যে-কোনও ব্যক্তি ব্রহ্ম-চর্য্যের সম্ভাব্যতা, ইহার উপযোগিতা, ইহার সার্থকতা ও ইহার বহুমুখ প্রভাব দুই চারি মাসেই বুঝিতে সমর্থ হয়। দেশে সাধকের অভাব, তাই প্রকৃত ব্রহ্মচারীরও অভাব।

"শুধু সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ব্রহ্মনামের চরণতলে নিজেকে সম্যক্ সমর্পণের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মচর্য্য আসে। ব্রহ্মসাধনায় নিজেকে বিকাইয়া দাও, ইহার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মচর্য্য জাগ্রত হইবে।

"তোমার পত্নীকে তুমি নিয়ত পরমাত্মারই প্রতিমা বলিয়া জান, রক্তমাংসের ঢেলা বলিয়া জ্ঞান করিও না। খড় ও মাটি দিয়া তৈরী করা পুত্তলিকাকে এতকাল যে শ্রদ্ধা যে পূজা নিবেদন করিয়া আসি-য়াছ, তাহার সহস্রগুণ শ্রদ্ধা পূজা স্বকীয় পত্নীর মানবী তনুর প্রতি অর্পণের মনোভাব অর্জ্জন কর। তোমার স্ত্রীও তোমাকে পরমাত্মারই বিগ্রহ বলিয়া ধ্যান করুক। একজন আর একজনকে নিয়ত প্রণবের দ্বারা পরিবেষ্টিতরূপে দর্শন কর। একজন অপরের চখে মুখে বুকে অবিশ্রান্ত কল্পনার বলে অবিরত ভগবানের নামই অঙ্কিত করিতে থাক, বিদ্যুদুজ্জ্বল পবিত্র ওঙ্কার তোমাদের নেত্রদ্বয়ের উপরে উপনেত্রের ন্যায় বিরাজ করুক। ইহাই সংযম-প্রতিষ্ঠার অমোঘ কৌশল।"

ভোগলোলুপতা দমনের কৌশলসমূহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-(ত্রিপুরা)-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মদ্যপান করিতে করিতে একদিন আপনিই পানাসক্তি কমিয়া যাইবে, এইরূপ যুক্তি বড় বিপজ্জনক। কোনো কোনো মদ্যপ যে এরূপ যুক্তির আশ্রয় লয় না, তাহা নহে। কিন্তু পরিণামে তাহাদের মদ্যপান পরিত্যাগ করা আর হইয়া উঠে না। তোমার প্লীহা কাটিতে পারে,

তোমার যকৃৎ পাকিতে পারে, কিন্তু পান করিতে করিতে পানাসক্তি কিছুতেই দূর হইতে পারে না। পানাসক্তি দূর করিবার পন্থা অন্যরূপ। মদ্যপানের কুফল চিন্তা দ্বারা পানাসক্তি কিঞ্চিৎ কমিয়া থাকে। মদ্যপ-দের সংসর্গ পরিত্যাগের দ্বারাও পানাসক্তি হ্রাসের সাহায্য হয়। যেখানে মদ্যপানের সুখ্যাতি কীর্ত্তিত হয়, এমন স্থান হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা দ্বারাও পানাভ্যাস বর্জ্জনে সাহায্য হয়। পীত মদ্যের পরিমাণ কঠোর সঙ্কল্পের বলে ক্রমশঃ কমাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে তাহা দ্বারাও এই বিষয়ে কতক উপকার পাওয়া যায়। সুরাপান যতই জঘন্য কার্য্য হউক, এক লক্ষ বার নাম জপ না করিয়া এক আউন্স মদ্যও পান করিব না, এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠার দ্বারাও বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। পরি-শেষে প্রাণ যাউক, ক্ষতি নাই, তথাপি মদ্য স্পর্শ করিব না বা ইহার নাম মুখে আনিব না, এইরূপ দৃঢ়তার দ্বারা মদ্যপানাসক্তি বিজিত হয়। কিন্তু মদ্যপানের অপেক্ষা অধিকতর মাদক কোনও নেশায় আসক্ত হইতে পারিলে, সুরাপানের প্রবৃত্তি সমূলে নাশ পায়। আমি ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবার বিষয়ে কহিতে গিয়া তোমার নিকটে সুরাপানাসক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। নামের রসে মজিতে চেষ্টা কর, কামের রস আপনি শুষ্ক হইয়া যাইবে। নামে যে মজে, কামে তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না।"

মাতৃঋণ

মেদিনীপুর-নিবাসী জনৈক লোকহিতব্রত ভদ্রলোককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"মহিলা-সমাজের উন্নতির জন্য তুমি যে প্রতিনিয়ত কোনও না কোনও একটী পরিকল্পনা লইয়া নিজের মনকে ও অর্থকে নিয়োজিত রাখিতেছ, ইহা দর্শনে আমি আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচীনকালে পিতৃঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতি ঋণই পরিশোধের কথা উপদিষ্ট হইয়াছিল। মাতৃঋণ শোধের কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মাতৃঋণ পরিশোধের জন্যও আপ্রাণ অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

অপরের নিন্দিত কার্য্য নিজের ভিতরে যেন না আসে

রহিমপুর-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে আমি নিন্দা করিব, নিজে করিবার বেলা যদি সেই সব কার্য্যই করি, তাহা হইলে আমাকে কে-না উপহাস করিবে? তোমাদের প্রত্যেকের এই কথাটী বিশেষভাবে স্মরণে রাখা আবশ্যক। অপরের ভিতরে কি দোষ দর্শন করিলে তোমাদের রসনা সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে, তাহার একটী তালিকা একটু কষ্ট করিয়া রচনা কর। দুই চারিদিন দৈনন্দিন প্রত্যেকটী ব্যাপারে অপরের আচরণের প্রতি তোমাদের নিজেদের মন ও মুখের ভঙ্গী যদি কিঞ্চিৎ অধ্যয়নের চেষ্টা কর, তাহা হইলে অতি সহজে একটী নিখুঁত তালিকা প্রস্তুত হইয়া যাইবে। সেই তালিকাটী তোমার পড়িবার ঘরে টেবিলের সাম্‌নে বড় বড় হরফে লিখিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দাও এবং প্রাণপণ যত্নে নিজ আচরণ হইতে এগুলিকে বর্জ্জন কর।"

সমাজ-সংস্কারের পুরুষানুক্রমিক পন্থা

শ্রীশ্রীবাবা ময়মনসিংহ-ঈশ্বরগঞ্জ নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে লিখিলেন,—

"মানবমনের স্বাধীন বিকাশকে (তাহা যদি উচ্ছৃঙ্খলতার পথেও হয়,) নিষ্ঠুর হৃদয়হীন নিষেধ-বাণীর দ্বারা ব্যাহত করিবার চেষ্টার মধ্য দিয়া সমাজ-সংস্কার সফল হইবে না। গেরুয়া পরাইয়া 'ছাগলানন্দ', 'মহিষানন্দ', 'শূকরানন্দ' বা 'কুক্কুরানন্দ' প্রভৃতি নামকরণ করিয়া খোদার নামে দলের পর দল ষাঁড় ছাড়িয়া দিলেই কাম-কাতরতার অবসান হইবে না, জাতির দুর্ভাগ্যও দূরীভূত হইবে না। মানব-মনের স্বাধীন বিকাশকে কোথাও বা শিষ্যানুক্রমিক, কোথাও বা পুত্রকন্যানুক্রমিক বংশপরম্পরাগত সাধনার অরুণ-কিরণ-সম্পাতে সুষ্ঠুতার পথে নিতে হইবে। একদিনেই এই সমাজের সংস্কার সাধিত হইবে না, হইতে পারে না, মানুষের স্বাধীন মন যেদিন

স্বাধীনভাবে শুধু কল্যাণকেই চাহিবে এবং অকল্যাণকে বর্জ্জন করিবে, সেইদিনই প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের সংস্কার সাধিত হইবে। এবং মানুষের স্বাধীন মন যাহাতে অসত্য বর্জ্জন করিয়া সত্যকেই গ্রহণ করিতে শিখে, তজ্জন্য পিতামাতাকে সন্তানজননের পূর্ব্বে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে হইবে এবং পরার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগকে মোক্ষপ্রার্থনা-বিমুখ হইয়া এই সকল মাতাপিতার সন্তান-সন্ততিগুলির জীবন-মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন লইতে হইবে। আমাদের সমাজ-সংস্কারের ইহাই নির্ভুলতম পদ্ধতি। আর যত পথেই সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে চাহ না, সবই মোহর ফেলিয়া টাকার আদরের ন্যায় হইবে।

জননকালীন মনোবৃত্তি ও সন্তান

"আরও মনে রাখিও যে, জননকালে মিথুনীভূত জনক-জননীর মনোমধ্যে যে বৃত্তিগুলি প্রবল থাকে, সন্তানসন্ততিরা সেই বৃত্তিগুলিরই প্রাবল্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় এবং সেই বৃত্তিগুলি যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের সমপন্থী বা অনুপন্থী না হইয়া পরিপন্থী প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে পিতামাতারই দোষে সন্তানকে জন্মজোড়া অধঃপতন ও নৈতিক দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক জনক-জননীর পক্ষে ইহাই এক গুরুতর দায়িত্ব। এইজন্যই, পশুর অতিরিক্ত সম্মান পাইবার যোগ্য হইতে হইলে, খেয়ালে খেয়ালে সন্তানজননের দীর্ঘাচরিত কদভ্যাস ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ভগবৎসাধনালব্ধ সংযমশক্তির প্রভাবে অশান্ত কামনাসমূহকে রশ্মিবদ্ধ করিয়া বিবাহিত জীবনকে পবিত্রভাবে যাপন করিতে হইবে।

যথার্থ বংশ-রক্ষক

"একটী মাত্র ধর্ম্মিষ্ঠ সন্তানই পিতামাতার যথেষ্ট গৌরব, কুলের যথেষ্ট অলঙ্কার। অযোগ্য শত সন্তানেও বংশরক্ষা হয় না, প্রকৃত প্রস্তাবে কুলক্ষয়ই হয়। আত্মকল্যাণক্ষম লোককল্যাণকারী সন্তানই বংশরক্ষা

করিতে পারে, কামুকতার প্রতিমূর্ত্তি সহস্র সন্তানও বংশের প্রকৃত গৌরবকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। 'বংশরক্ষা' কথাটার ইহাই মূল তাৎপর্য্য। যেদিন হইতে কামাতুর ছাগ আর পরমুখাপেক্ষী কুক্কুরের জন্মদানের দ্বারা দেশবাসীর বংশরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেইদিন হইতেই এই দেশের প্রকৃত দুর্ভাগ্য আরম্ভ হইয়াছে।

প্রকৃত মাতা ও প্রকৃত পিতা

"বাপ হওয়া বুঝি মুখের কথা? না, মা হওয়াই বড় সোজা কথা? বিচার করিয়া দেখ, কামজ সন্তানেরা যে তোমাদিগকে বাপ অথবা মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহা শুধুই লোকাচার বা অনুগ্রহ কিনা। এই যে অধিকাংশ পুত্রকন্যা আজিকার যুগে পিতামাতার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পড়িতেছে, ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, পিতামাতার জীবনে উচ্চ আদর্শের অভাবই কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে ভুলিও না।

প্রয়োজন বীর্য্যবান সন্তানের

"কামোন্মত্ত হইয়া ওকি করিতেছ বাছারা? থাম, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, প্রত্যেকটী কথা মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া লও, তার পরে যাহা মনে লয়, করিও। রুগ্ন, আতুর, অন্ধ সন্তান জন্মাইয়া এই যে তোমরা জগৎ ভরিয়া ফেলিলে, এই অপরাধের কি শাস্তি নাই? কামুক, লম্পট, পরস্বাপহারী, পরদারগামী সন্তানের দল সৃষ্টি করিয়া এই যে তোমরা বিশ্বময় দুঃখই কেবল বাড়াইয়া চলিয়াছ, ইহার প্রতিফল কি তোমাদিগকে পাইতে হইবে না? বাহুপাশবদ্ধা সঙ্গিনীর সঙ্গ ছাড়িয়া একবারটী সুস্থ চিত্তে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, এই উপভোগ-তৃষ্ণার শেষ কোথায়, এই বৃথা মৈথুনের পরিণতি কোথায়? ছিঃ! ছিঃ! তোমাদের জীবনীশক্তি দেহভ্রষ্ট হইয়া যেখানে রুদ্র-তেজা কলুষহারী পুত্র ও মরুভূমে শীতল-সলিল-সঞ্চারকারিণী কন্যারই জন্মদান করিতে পারিত, সেখানে একপাল শূকরছানার জন্ম দিতে তোমাদের লজ্জা করে না, ঘৃণাবোধ হয় না?"

অপরাহ্ণে চিকশিয়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত হরদয়াল শর্ম্মা এবং বংশীধর রাজোয়াড় শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন। গার্হস্থ্য জীবনে অনাসক্ত অবস্থার কথা উঠিল।

অনাসক্ত সংসারী ; স্বার্থ সিংহের গল্প

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোনও এক গ্রামে একজন অবস্থাপন্ন জমিদার ছিলেন, তাঁর ছিল এক ঠাকুরবাড়ী, ত্রিসন্ধ্যায় তিনি ঠাকুরবাড়ী এসে বিগ্রহ প্রণাম কত্তেন এবং যখনি যে কাজ কত্তেন, বল্‌তেন,—"দেখ হে, সব ঠাকুরেরই ইচ্ছায় হচ্ছে, আমার ত' নিজের বল্‌তে কিছুই নেই, সবই ঠাকুরের সম্পত্তি, তাঁর জিনিষে আমার আসক্তি থাকার কোনো পথ নেই, আমি তাঁর সেবক, তাঁর ভৃত্যরূপে তাঁর জিনিষের তত্ত্বাবধান করি।" এদিকে ভদ্রলোক অপুত্রক। ছেলে না হ'লে পুনরায় বিবাহ দেশ-চল্‌তি প্রথা। তিনি দ্বিতীয়-বার একটী মেয়েকে বিবাহ কল্লেন এবং বল্লেন,—"দেখ হে, স্ত্রীতে আমার আসক্তি নেই, শুধু কর্ত্তব্যের দায়ে সংসারী করা।" কিছুদিন যায়, জমিদারের একটি ছেলে হ'ল, খুব আড়ম্বর সহকারে উৎসব করা হ'ল। জমিদার বল্লেন,—"দেখ হে, এ ছেলে ত' আমার নয়, ছেলে ভগবানের দেওয়া। তাঁরই জিনিষ ব'লে জানি ত'! তাই ছেলের প্রতি আমার আসক্তি নেই, তবে কিনা কর্ত্তব্যের দায়ে উৎসবও কত্তে হয়, সমারোহও কত্তে হয়।" কিছুদিন পরে ছেলে বড় হ'ল, তার বিবাহের ব্যবস্থা প্রয়োজন। জমিদার দেশে বিদেশে সুন্দরী পাত্রী খোঁজেন, আর বলেন,—"দেখহে, সুন্দরী বউ খুঁজি কেন জানো? ছেলে হচ্ছে ঠাকুরের জিনিষ। আমার জিনিষ ত' নয়! আমার জিনিষ হ'লে আমি চলনসই গোছের একটী মেয়ে এনে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে আমি অনাসক্ত, কিন্তু ঠাকুরের জিনিষের ব্যাপারে ত' আর আমার কর্ত্তব্যপালনে ক্রুটী থাকা উচিত নয়! তাই এত খোঁজাখুঁজি হচ্ছে।" লোকে বলাবলি কত্ত, বাস্তবিক জমিদার বাবু যেন সাক্ষাৎ রাজর্ষি জনক। জমিদারের ছিল এক দারোয়ান। নাম ছিল তার স্বার্থ-সিং। লোকটা স্বার্থপরের চূড়ান্ত। লোকে বলত যে, নামে আর তার

অর্থে এমন মিল বড় দেখা যায় না। স্বার্থ-সিংএর মাইনের টাকা নায়েব বাবুকে মাসের ৩০শে তারিখ রাত নটায় হ'লেও গুণে দিতে হবে,—সে কাজ করেছে এ মাসে, ও মাসে মাইনে দিতে গেলে তাকে টাকার সুদ কষে হিসাব চুকাতে হবে। স্বার্থ-সিংএর ঘরে খাবার আটাগুলি একটু তেনিয়ে গেছে, রৌদ্রে দেওয়া হয়েছে, একটী লোক তার কাছ দিয়ে জোরে দৌড়ে যাচ্ছে,—স্বার্থ সিং বল্লে,—"এই সাবধান, তোমার শরীরের জোর বাতাস লেগে যদি আমার খাবার আটা উড়ে যায়, তবে তার দাম দিতে হবে।" স্বার্থ-সিংহের সাতটি ছেলে, একটীর পর একটী যেন যমদূতের বাচ্চা, রোজ কুস্তি করে, কসরৎ করে। ছেলেরা যদি কেউ রাস্তায় বেড়াতে বেরোয়, আর অতটুকু ছেলের অমন সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য দেখে যদি কোনো পথিক কোনো ছেলের গায়ে হাত দেয়, তবে তা দেখলে স্বার্থ-সিং চ'টে উঠে বলতে থাকে,—"সাবধান, আমার ছেলের গায়ে হাত দিলে তার স্বাস্থ্য খারাপ হবে। আর তাই যদি হয়,—তবে তোমাকে আর আস্ত রাখব না।" ভয়ে লোকেরা স্বার্থ-সিংএর ছেলেদের কেউ ছোঁয়ও না। এদিকে গ্রামে কলেরা এল। জমিদার মহাচিন্তায় পড়লেন। পাড়ার পর পাড়া উচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, জমিদার ঠাকুরবাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিলেন। জমিদার-বাড়ীর সদর দরজায় ভিতর দিকে কুলুপ আঁটা হ'ল, কত লোক সবংশে নির্ব্বংশ হয়ে যাচ্ছে, তাতে তাঁর কি, আজ তার নিজের ছেলেটী রক্ষা পাওয়া চাই। এততেও বাক্যের তোড় কমে না,—বাড়ীর ভিতরেই বিজ্ঞ চিকিৎসককে আটক ক'রে রাখা হয়েছে, আর তাকে বলা হচ্ছে,—"দেখ কবিরাজ, আমার ত কিছুতে আসক্তি নেই, তবে সব সম্পত্তিই ত' ঠাকুরের, খোকাটী যদি ভাল না থাকে, তবে ঠাকুরের সম্পত্তিই বা তদারক কর্ব্বে কে, নিত্যপূজারই বা তত্ত্বাবধান কর্ব্বে কে ? সেই হচ্ছে আমার একমাত্র ভাবনা। নইলে, আসক্তি আমার কারো প্রতিই নেই। ঠাকুর—হে ঠাকুর, তুমিই জানো।" এদিকে কলেরার প্রকোপ দেখে পূজারী ব্রাহ্মণ দেশে পালিয়েছেন। ঠাকুরের নিত্যপূজা বিধিমত হওয়া দূরে থাক, একটী তুলসী পাতাও ঠাকুরের পায়ে চড়াবার লোক নেই। স্বার্থ-সিং বল্লে,—"এ ত' অন্যায়

কথা! কলেরা গ্রামে এসেছে ব'লে ঠাকুরের পূজা বন্ধ হবে? না, তা' হ'তে পারে না। নিজে করি দারোয়ানী, তুয়ার ছেড়ে যাবার উপায় নেই, কারণ জমীদারের কড়া হুকুম যেন বাইরের কোনো লোক এ বাড়ীতে খিরকীর দরজা দিয়েও ঢুকতে না পারে।" সুতরাং স্বার্থ-সিং তার স্ত্রীকে বল্লে,—"যাও তুমি ঠাকুরবাড়ী, সেইখানেই রোজ থাক, এখানে এলে জমিদার বাবু চ'টে যাবেন, কারণ ওপাড়াতে কলেরা আছে, সেইখানে থেকে তুমি রোজ ঠাকুরের পায়ে তুলসী পাতা নিয়মমত চড়াও। মানবজীবন আজ আছে কাল নেই, কিন্তু ঠাকুরও চিরকাল থাকবেন, তাঁর পূজাও চিরকাল থাকবে।" স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল,—"ঐ পাড়ার ভিতরে প্রতি ঘরে মৃতদেহ সব প'ড়ে আছে, পোড়াবার লোক নেই, বিকট তুর্গন্ধে রাস্তায় চলা অসম্ভব, আমি সেদিক দিয়ে কেমন ক'রে যাব?" স্বার্থ-সিং বল্লে,—"আরে যেতেই যখন হবে, তখন আর কেঁদে লাভ কি? মায়া ছাড়, আমার মায়াও ছাড়, জীবনের মায়াও ছাড়। এতদিন যে তোমাদের অত যত্ন করেছি, সে ত শুধু কাজের সময়ে অবহেলে দেহটাকে ত্যাগ কত্তে যেন পারো, সেই উদ্দেশ্যেই! যাও, আর দেরী ক'রো না, ঠাকুর পূজার সময় হ'ল।" স্বার্থ-সিংএর কথা শুনে, তার নির্ব্বিকার ভাবভঙ্গী দেখে তার স্ত্রীর মনেও একটা নির্ব্বিকার নির্ভয় ভাব এল। সে চ'লে গেল। তুদিন পরে খবর এল, স্বার্থ-সিংহের স্ত্রীর কলেরা হয়েছে। স্বার্থ-সিং তার বড় তুই ছেলেকে বল্ল,—"যা ত'বাছারা তোদের মায়ের কাছে, যতক্ষণ প্রাণ আছে, প্রাণপণে শুশ্রূষা কর্, আর ঠাকুরের চরণামৃত খাওয়া। পূজোর সময় হয়ে এলে একজন মাকে ছেড়ে দিয়ে স্নান ক'রে গিয়ে তুলসীপাতা ঠাকুরের পায়ে চড়াবি। একটু সাবধান থাকিস্, তোদের আবার কলেরা না হয়। বড় সংক্রামক রোগ কি না! তবে ভয়েরই বা কি? এতদিন কুস্তি-কসরৎ করা ত' মরণকালে নির্ব্বিকারে যাতে দেহত্যাগ করা যায়, তারই জন্য কেমন বুঝ্লি ত'?" ছেলে তুটী বাপকে প্রণাম ক'রে ঠাকুরবাড়ী চ'লে গেল। তুদিন পরেই খবর এল স্বার্থ-সিংহের স্ত্রী মারা গেছে। স্বার্থ-সিং তার তৃতীয় চতুর্থ ছেলেকে ডেকে নিয়ে বললে,—"যারে বাছা, মায়ের শেষ সংস্কার কত্তে

যা। ফিরে আর এখানে আসিস্ নে, কারণ ঐ পাড়া থেকে এসে এখানে কেউ আছে জান্‌লে জমিদার বাবু আর আমার চাকরী রাখবেন না। ঐখানেই থাকবি, রোজ দুবেলা ঠাকুরের পায়ে তুলসী চড়াবি, আর বাকী সময় ভজন গেয়ে কাটাবি। খাবার সেখানে অভাব নেই, ঠাকুরের ভাণ্ডারে হাজার লোকের দুবছরের খাদ্য আছে।" পুত্র দুটী চ'লে গেল। সন্ধ্যার সময়ে খবর এল, বড় ছেলেকে কলেরায় ধরেছে। স্বার্থ-সিং বল্লে,—"কলেরায় ধরেছে, তাতে ক্ষতি কি? ঠাকুরকে যেন না ভোলে। এ দেহ ত' ঠাকুরের জন্যে!" পরদিন প্রাতে খবর এল,—বড় ছেলে মারা গেছে। স্বার্থ-সিং তার পঞ্চম ছেলেকে ডেকে বল্লে,—"যা বাছা তোর দাদাদের কাছে, ওরা তিন জনে ত' আর শেষ সংস্কার কত্তে পার্ব্বে না! তবে সাবধান থাকিস। সাবধান কথার মানে জানিস? রোগ যাতে না ধরে, সে সাবধানতা ত' দরকারই, কিন্তু বেশী সাবধান কচ্ছি এই ব'লে যে ঠাকুরের চরণ কিন্তু নিমেষের জন্যও ভুলিস না!" পঞ্চম ছেলে চ'লে গেল,—দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ভ্রাতা মিলে মায়ের চিতার পার্শ্বেই প্রথম ভ্রাতার শবদাহ কল্লে। সন্ধ্যার সময়ে খবর এল, দ্বিতীয় আর তৃতীয় দুই ছেলেরই প্রবল ভেদ বমি হচ্ছে। স্বার্থ সিং তার ষষ্ঠ ছেলেকে ডেকে বল্লে,—"যা বাছা তুই ঠাকুরবাড়ী, ভয় কি? দাদারাই ত' সেখানে রয়েছে, সব চেয়ে অভয় হচ্ছে যে ঠাকুর সেখানে আছেন, এ শরীর ত' ঠাকুরের সেবার জন্য, সেকথা কিন্তু ভুলিস না।" পরদিন প্রাতে খবর এল, শেষ রাত্রেই দুই ছেলে শেষ হয়েছে। স্বার্থ-সিং তার সপ্তম ছেলেকে ডেকে বললে,—"বাছা আর ত' তুমি এখানে থাক্‌তে পার না, ভায়ের প্রতি ভায়ের কর্ত্তব্য আছে, যাও তুমি দ্রুত ঠাকুরবাড়ী, মৃত ভাইদের সৎকার ক'রে তার পরে ঐ ঠাকুর বাড়ীতেই থেকে যেও। ভয়ের সময়ে অভয়দাতা ত ঠাকুর, আর ঠাকুরের চরণের পাশেই ত তোমার মাও রয়ে গেছে, দাদারাও রইল, ভয় কি?" নির্ব্বিকার স্বার্থ-সিং তার শেষ নয়নের-মণিকে বিদায় দিয়ে প্রার্থনায় বসল,—"ঠাকুর, জীবন ভ'রে মানুষের চাকুরী করেছি, এবার তোমার চাকুরীর সুযোগ দাও।" দীর্ঘকাল প্রার্থনার পরে শান্ত স্নিগ্ধ মনে সে জমিদার-

বাড়ীতে ঢুকল। জমিদারকে প্রণাম ক'রে সে বল্লে,—"মনিব, এবার আমায় বিদায় দাও, আমার পেন্সানের সময় হ'ল।" এর মধ্যে একটা দাসী এসে বল্লে,—"বাবু, বাবু, ছোট-মার খুব দাস্ত হচ্ছে।" কথা শুনেই জমিদার মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্লেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে শুধু আর্ত্তনাদ কত্তে লাগ্লেন,—"হায় ছোট বৌ, কি হবে, তোমাকে ছেড়ে কি ক'রে থাকব, তুমি না বাঁচ্লে কোথায় যাব, হায়রে অদৃষ্ট একি হ'ল।" স্বার্থ সিং দেখ্লে যে জমিদার-বাড়ীতে কলেরা ঢুকেছে, এখন আর অতিরিক্ত সাবধানতার কোনো অর্থ হয় না, সুতরাং নিজের রুগ্ন ছেলেকে দেখ্বার জন্য ঠাকুর বাড়ী যাওয়ার কোনো বাধা নেই। স্বার্থ-সিং ঠাকুর বাড়ী গিয়েই আগে ঠাকুর প্রণাম কর্ল্ল, তারপর ঠাকুরের নির্ম্মাল্য নিয়ে ছেলেদের কাছে এল। চতুর্থ ছেলে সংজ্ঞাহীন, পঞ্চম ছেলে ভেদ-বমিতে অস্থির, ষষ্ঠ ছেলের গা বমি-বমি কচ্ছে, সপ্তম ছেলে সকলের ছোট—সে অস্থির হ'য়ে একবার এর কাছে একবার ওর কাছে গিয়ে বস্ছে। স্বার্থ-সিং বল্লে,—"ভয় কি বাবা, দেহ পেয়েছ ঠাকুরের জন্য, নিজের জন্য ত' নয়! এই দেহ দিয়ে ঠাকুর এখন অন্য দেশে তোমাদের দ্বারা অন্য কাজ করাবেন, এখন যে কষ্ট হচ্ছে সে ত শুধু ট্রেণে চড়ার কষ্ট, ট্রেণে ভিড় থাকলে ধাক্কা-ধাক্কির কষ্ট ত' হবেই, কিন্তু ঠাকুর তোমাদের একে একে ভিন্ন এক দেশে এক অমৃতময় দেশে, আনন্দময় দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা সবাই সেই দেশে যাব। তোমরা পুণ্যবান্ তাই যাচ্ছ আগে, আমি যাব একটু পরে। ভয় কি বাবা, কোনো ভয় নেই, অবিরাম ঠাকুরকে স্মরণ কর।" এভাবে একটী একটী ক'রে সবগুলি ছেলে মারা গেল। স্বার্থ-সিং ছেলেদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্ত ক'রে স্নান ক'রে এসে জমিদার-বাড়ীতে ঢুকল। এসেই সে দেখ্তে পেল, জমিদার উন্মত্তের মত একবার গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছেন, একবার দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুক্ছেন, আর বল্ছেন,—"হায় রে হায়, কি হ'ল, আমার সাধের খোকা কৈ গেল রে কৈ গেল, হায়রে আমার কি হবেরে, হায়রে ভাগ্য, হায়রে অদৃষ্ট।" স্বার্থ-সিং উন্মত্ত

জমিদারকে ধ'রে ধীর স্পষ্ট অকম্পিত কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল,—"বাবু, এত সব বাজে কথা ব'লে মন্‌কে চঞ্চল কচ্ছেন কেন? এ সময়ে ঠাকুরের কথা স্মরণ করুন।" জমিদার বল্লে,— কি, ঠাকুরের কথা? কেন ঠাকুরের কথা স্মরণ করব, জীবন ভ'রে ঠাকুরকে ডেকেছি, এই কি তার প্রতিফল হ'ল?" স্বার্থ-সিং বল্লে,—জমিদার বাবু, আপনি আমার মনিব, কিন্তু না ব'লে পাচ্ছি না। আপনি একটী পুত্রের শোকে এত অধীর, আর আমি যে সাতটী ছেলের চিতা দর্শন ক'রে এলাম, কৈ আমার ত' প্রাণে ঠাকুরের প্রতি অনুযোগ নেই। আপনি মুখেই শুধু লোককে শুনাবার জন্য বলেছেন, খোকাবাবু আপনার নয়, ঠাকুরের; আমি মুখে কখনো একথা বলিনি কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদাই জেনেছি, সবাই ঠাকুরের, আমার কেউ নয়। সবাই ঠাকুরের, আমি তাদের সেবার জন্য আপনার চাকরি করেছি। আজ সেই স্ত্রী নেই, কলেরায় তাকে ঠাকুরের পায়ে টেনে নিয়েছে, আজ সপ্তপুত্র নেই. তারা মায়ের চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করেছে, আজ আর আমি কাকে প্রতিপালনের জন্য চাকুরি কর্ব্ব? আমাকে বিদায় দিন্‌।"

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ বাবা, অনাসক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। সংসারে অনাসক্ত হ'তে হ'লে ভগবানে পূরাপূরি আসক্ত হ'তে হয়। ভগবানে না আসক্তি এলে সংসার থেকে আসক্তি দূর হয় না। মুখে অনাসক্তির কথা বলা সহজ, কত লোকেই বলে, কিন্তু কে কতখানি অনাসক্ত তার প্রমাণ হয় তখন, যখন ভালবাসার বস্তুগুলি পরিত্যাগ করার সময় আসে।

পুপুন্‌কী

৩রা কার্ত্তিক, ১৯৩৯

বেলা নয় ঘটিকার সময়ে গান্ধাজোড় হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয়দ্বয় সৎকথা শুনিতে আসিয়াছেন।

জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী

যোগেন বাবুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—এক দেশের এক ধনী জমিদার তীর্থ-ভ্রমণে যাবেন, কথা শুনে গ্রামের পুরোহিত ঠাকুর বল্লেন,—"বাবু যদি আমাকে সঙ্গে নেন, তা হ'লে বড় সুবিধা হয়, পথ-খরচ কোন রকমে জোগাড় কর্ব্ব, কিন্তু কোনো দেশ ত' আমার চেনা নেই!" গ্রাম্য স্কুলের বাংলা-পণ্ডিত বল্লেন,—"এমন সঙ্গতি আবার কবে হবে, স্কুলটাও এখন ছুটী আছে, অনুমতি করলে আমিও যাই।" জমিদার-পত্নী বল্লেন,—"এত লোক তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, আর আমিই ফাঁক্-তালে বাদ প'ড়ে যাব? আমাকেও সঙ্গে নাও, সংসারীর কিচিমিচিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়েছে, আজ এটার জ্বর, কাল ওটার পেটের অসুখ, পরশু ওটার নিমোনিয়া—এসব হ্যাঙ্গামা থেকে দুদিনের জন্য জুড়াই।" জমিদার বল্লেন,—"আমি ত' যাচ্ছি বায়ু পরিবর্ত্তনে, দেশের আবহাওয়া শরীরে আর সইছে না। আচ্ছা যাবে যখন, সবাই চল।" দ্বারোয়ানকে না নিয়ে গেলে জমিদারের কষ্ট হবে, সুতরাং তাকেও নেওয়া হ'ল। প্রথমে সবাই গেলেন গয়া। জমিদার বল্লেন,—"বেশ জায়গা, কফি কড়াইশুটি বেশ সস্তা, শরীরও ভাল থাকবে ব'লেই মনে হচ্ছে।" পুরোহিত বল্লেন, —"এটা হচ্ছে গয়াসুরের বিষ্ণুপাদদর্শনের স্থান, বিষ্ণুই যে শ্রেষ্ঠ দেবতা, তার হ'ল গয়া জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন।" বাংলা স্কুলের পণ্ডিত বল্লেন,— "এদিকে ফল্গু, ওদিকে আকাশ-গঙ্গা পাহাড়, ব্রহ্মযোনি পাহাড়, দেখ্তে মনোরম।" জমিদার-পত্নী বল্লেন,—"বাবারে বাবা, এতদিন ছিল বাড়ীতে যত কাচ্চাবাচ্চার ক্যাচকেচি, এখানে এসে হয়েছে যত গয়ালী পাণ্ডার চেঁচামেচি,—পালাতে পারলে প্রাণ বাঁচে।" অশিক্ষিত মূর্খ দারোয়ান বল্লে,—"হে প্রভো পরমেশ্বর, তোমাকে কত জনে কত ভাবে ডাকে, কোন্ ডাকের কি যে মর্ম্ম, কিছুই ত প্রভো জানি না, কে বিষ্ণু, কে ব্রহ্মা, কেবা মহাদেব, কিছুই ত প্রভু বুঝি না, এই অজ্ঞান মূর্খ নিরক্ষরকে নিজের গুণে ভক্তি দাও, প্রেম দাও, বিশ্বাস দাও।" গয়া

থেকে সবাই এলেন কাশীধামে। জমিদার বল্লেন,—"এখানে যে বাঙ্গালী-টোলার বাজারে বেশ টাট্‌কা টাট্‌কা মাছ মিলে, আর বেগুনগুলি বেশ বড় বড়, সুস্বাদু, এতে স্বাস্থ্যের বেশ সুবিধে বোধ কচ্ছি হে!" পুরোহিত বল্লেন.—"আরে আগেই বলেছি, দেবাদিদেব মহাদেব হচ্ছেন সকল দেবতার সেরা,—এই কাশীধামে না এলে কি সে কথা কেউ বুঝ্‌তে পারে?" বাংলা-পণ্ডিত বল্লেন,—"বরুণা আর অসি, এই দুই নদীর মাঝখানে ব'লে এর নাম বারাণসী, এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গাজল পরিসেবিতা পুরী সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।" জমিদার-পত্নী বল্লেন,—"এই দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেল বেলা বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের ছেলেমেয়েরা কম গণ্ডগোল করে না। আরে, যে দেশে যাও, সেই দেশেই শুধু পোলাপানের গণ্ডগোল, আর পোলাপানের গণ্ডগোল!" মূর্খ দারোয়ান বল্লে,—"হে প্রভু পরমেশ্বর, মূর্খ আমি কী জানি, কেন গঙ্গারূপে তোমার পূজা, কেন অন্নপূর্ণা রূপে তোমার অর্চ্চনা, কেন বিশ্বনাথ রূপে তোমার আরতি? বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন ভক্তিহীন এই অধম পামরকে কৃপা কর প্রভো, কৃপা কর, ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, আত্মসমর্পণের শক্তি দাও।" কাশী থেকে সবাই এলেন অযোধ্যা। জমিদার বাবু বল্লেন,—"নাহে, নামেই শুধু অযোধ্যা, নইলে তাকিয়ে দেখ, একটা বেগুনও মিল্‌বে না টাট্‌কা, একটা লাউ পাবে না তাজা, কেবল ধূলো আর ধূলো, এখানে কারো স্বাস্থ্য টিক্‌তে পারে?" পুরোহিত বল্লেন,—"দূর্ব্বাদল শ্যাম রামচন্দ্র, বিষ্ণুর অবতার কি না, দশরথের ঘরে রাবণ-বধের জন্য জন্মগ্রহণ কল্লেন, এই হচ্ছে সেই পুণ্য-ভূমি,—কেশব-ধৃত-রামশরীর—মস্ত তীর্থ, মস্ত তীর্থ।" বাংলা-পণ্ডিত বল্লেন,—
—"সরযূ নদীর তীর, তীর্থ যাত্রীর ভীড়, গাড়ী ঘোড়া ভাল নেই, বিদ্যুতের আলো নেই, তবে সমভূমি, পাহাড়-পর্ব্বত নয়, এ জন্য নৈসর্গিক শোভাও তেমন মনোরম নয়, রাজা দশরথের আমলে বোধ হয় জায়গাটা আরো উঁচু ছিল, অন্ততঃ রামায়ণের বর্ণনায় তাই মনে হয়।" জমিদার-পত্নী বল্লেন.—"বাড়ীতে ছিল মানুষের বাচ্চা বানর,

এখানে সব বানরের বাচ্চা বানর, এত বানরের উৎপাতে বাবা এখানে থাকা চলবে না। আরে আমি বাড়ী ছাড়্‌লে কি হবে. কপাল যায় লগে লগে, বাড়ীতে ছিল পোলাপানের কিচিমিছি, এখানে দেখ বানরের কিচিমিচি। এত কি কারো সহ্য হয়?" দারোয়ান বল্লে,—"হে অযোধ্যানাথ, লোকে বলে তুমি অবতার, কিন্তু প্রভো, কে কার অবতার, কে কেন অবতার কিছুই বোঝার শক্তি আমার নেই। প্রভো পরমেশ্বর, নিরক্ষর মূর্খ দেখে এই অবোধ অনাথ অকৃতিকে জ্ঞান দাও, যেন চিন্‌তে পারি, কি তোমার স্বরূপ, কি তোমার রহস্য, কেন জগতে এলাম, কি আমার কর্ত্তব্য; আর এই দেহমন যেন জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনে সমর্পণ কত্তে পারি। মানব জীবন বৃথাই চলে যাচ্ছে, হে প্রভো পরমেশ্বর, তোমার করুণা ছাড়া আমার মত পাপিষ্ঠের আর উদ্ধারের কিছু আশা নেই। করুণা কর, করুণা কর, সর্ব্বপাপ দূর ক'রে দিয়ে তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্য কর।" অযোধ্যা থেকে সবাই এলেন হরিদ্বার। জমিদার বাবু বল্লেন,—"স্থানটা যেন ভালই হবে, তবে খাবার জিনিষ সস্তা নয়, আর মিউনিসিপালিটির কি বদ্‌-খেয়াল, গঙ্গার এমন সুন্দর সুন্দর মাছ, তা হয়েছে ধরা নিষেধ, গঙ্গার তীরে গেলে জিভে জল আসে।" পুরোহিত বল্লেন,—"কোন্ দেবতার এটা তীর্থ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গঙ্গাদেবীই প্রধান, না মহাদেবেরই প্রাধান্য না কি অন্য কোনো দেবতার এটা অধিষ্ঠান ভূমি, একটা খটকা লাগ্‌ছে হে!" বাংলা-পণ্ডিত বল্লেন,—"অভ্রচুম্বী হিমালয় আর বজ্রনাদিনী গঙ্গা. এই আকাশ আর এই পৃথিবী, এখানে এসে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীন আর্য্যেরা প্রকৃতির উপাসকই ছিলেন।" জমিদার-পত্নী বল্লেন,—"নাঃ, আর আমার দেশে দেশে দৌড়াদৌড়ি ভাল লাগে না, বাড়ীর ছেলেপুলের জন্য প্রাণ কাঁদ্‌ছে, আমি বাড়ী যাব।" দারোয়ান বল্লে,—"হে বিভো বিশ্ব-প্রভো, কেউ তোমারে ভজে সাকারে, কেউ ভজে নিরাকারে, কেউ নামে, কেউ অনামে, কেউ রূপে, কেউ অরূপে, কেউ প্রকৃতিতে, কেউ বিকৃতিতে, কেউ বা অনুকৃতিতে তোমার অর্চ্চনা কচ্ছে,—এ সবের,

রহস্য এই অজ্ঞান অন্ধের বোঝার উপায় নেই, তুমি দয়া ক'রে যাকে বুঝাও, সেই বোঝে, তুমি দয়া ক'রে যাকে জানাও, সেই জানে,—আমি কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না, তবু প্রার্থনা করি, হে প্রাণারাম, হে জীবন-নাথ, কৃপা-মহিমায় আমাকে তোমার কর, তুমি আমার হও।" জমিদার-পত্নী ক্রমেই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। ফেরার পথে কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, এসব দেখার ধৈর্য্য নেই। পুরোহিত বল্লেন,—"কম তীর্থ দেখা হ'ল না।" বাংলা পণ্ডিত বল্লেন,—"একবারে অনেক দেশ দেখ্‌লে শেষে সকলের কথা মনেও থাক্‌বে না।" জমিদার বাবু বল্লেন,—"শরীর আমার অনেকটা বদ্‌লেছে হে, এখন দেশে গেলে বেশ স্বাস্থ্য টিক্‌বে।" সবাই দেশে ফিরলেন। দেশে কত লোক এল এঁদের কাছে তীর্থের গল্প শুন্‌তে, সবাই নিজ নিজ লব্ধ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সব কাহিনী বলেন। জমিদার বলেন,—"গয়াতে কফি মেলে ভাল, কাশীতে মাছটাও বেশ মেলে, অযোধ্যাতে বড় ধূলো, হরিদ্বারে জিনিষের দাম বেশী। তবে বাংলা দেশ থেকে স্বাস্থ্য সব জায়গাতেই ভাল থাকে, যদিও এদের মধ্যে অযোধ্যাটাই কিছু নিকৃষ্ট।" পুরোহিত ঠাকুর বলেন,—"কে বলে হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা? গয়াতে যাও, দেখবে বিষ্ণু একবারে জাগ্রত; কাশীতে যাও, দেখবে বিশ্বেশ্বর বিনিদ্র; অযোধ্যায় যাও, তবে বুঝ্‌বে রামায়ৎরা কত বড় এক সম্প্রদায়; তবে কিনা, এই হরিদ্বারে গিয়ে ঠিক বুঝা গেল না যে হিন্দুর কোন্ দেবতাটী বেশী জাগ্রত। প্রধান তীর্থ হরিদ্বারের হচ্ছে ব্রহ্মকুণ্ড, কিন্তু সেখানে ব্রহ্মার পূজা হয় না, হয় গঙ্গার পূজা। কিন্তু লোকে পূজা করে গঙ্গার প্রস্তর-মূর্ত্তির, আর টাকা-কড়ি সব দান করে নদীর জলে। শিবই প্রধান, না কে প্রধান, কিছু বুঝা গেল না। নদীর তীরে সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরা নিজ নিজ শাস্ত্র পড়্‌ছেন, নিজ নিজ অর্চ্চনা কচ্ছেন। এজন্য ঠিক্ ঠাওর করা গেল না যে, হরিদ্বারে জাগ্রত দেবতাটী কে! তাহ'লেও জানবে এটা সত্য, যে হিন্দুধর্ম্ম কথাটা মিথ্যা নয়।" বাংলা-পণ্ডিত বলেন,—"দেশ দেখ্‌লে জ্ঞান লাভ হয়, মনেরও সুখ হয়। গয়ার

আকাশ গঙ্গা পাহাড় ঐতিহাসিক বোধিদ্রুম, কাশীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা আর ঐতিহাসিক সারনাথের স্তূপ, যার কাছে সেই প্রাচীন বুদ্ধদেবের মূলগন্ধকুটি, অযোধ্যার রাম-জন্মভূমি, যার পাশেই মোগলাই আমলের মসজিদ, তারপরে তোমার হরিদ্বার, সাক্ষাৎ গঙ্গা কলনাদিনী হয়ে অবতরণ কচ্ছেন হিমাচলের বক্ষ চিরে, এই সাক্ষাৎ গঙ্গামূর্ত্তি দেখেই লোকে আর পাথরের গঙ্গামূর্ত্তিতে মনোনিবেশ করে না, ইত্যাদি সব দেখ্‌লে কার না সুখ হয়?" জমীদার-পত্নী বলেন,—"তীর্থের কথা আমাকে আর ব'লো না, এবার শিক্ষা ঢের হয়েছে, ইষ্টিশনে ইষ্টিশনে কুলির উৎপাত, এ নেয় মাল এদিকে, ও নেয় মাল ওদিকে, ভাড়া চুকানোর কলহ-কোলাহল, গয়ার পাণ্ডা, কাশীর পাণ্ডা, অযোধ্যার পাণ্ডা, হরিদ্বারের পাণ্ডা, পাণ্ডার গোষ্ঠীর যন্ত্রণায় কাণে তালা লেগে যায়, এক-জন টানে হাতে ধ'রে, একজন টানে কাছায় ধ'রে, এক মেছো হাট আর কি। তার উপরে আবার আছে, একদিকে নর আর একদিকে বানর, যেন যমদূতের গোষ্ঠী।" দ্বারোয়ান সামান্য লোক, কোন্ শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি যাবে তার কাছে আবার গল্প শুন্‌তে? অশিক্ষিত মালী, ঢুলি, নাপিত, ধোপা, জমিদার-বাড়ীর কাজ কত্তে এসে অবসর মত দ্বারোয়ানের কাছে বসে, অ'র গল্প শোনে। দ্বারোয়ান বলে,—"দেখ ভাই, পরমাত্মার যদি কৃপা না হয়, তা'হলে শত তীর্থে ঘুরেও কোনো লাভ নেই, বরং মনের সংশয় বেড়ে যায়। বিষ্ণু বড় না রুদ্র বড়, রামচন্দ্র বড় না গঙ্গা বড়, এসব প্রশ্ন মনে ওঠে। আমি মূর্খ লোক, কে বিষ্ণু, কে বিশ্বনাথ, তার দিকে না তাকিয়ে চখ বু'জে পরমেশ্বরকে বলেছি,—'প্রভো, নিজের টাকায় তীর্থ-দর্শন জীবনে হবে না, নিজের জ্ঞানে তত্ত্বদর্শনও জীবনে হবে না, পরের টাকায় যদি দৈবাৎ তীর্থ-ভ্রমণ হ'ল, তুমি তোমার নিজের গুণে আমার মনের অজ্ঞান-আঁধার দূর কর, ভেদবুদ্ধি নাশ কর, যা ক'রলে আমার ভাল আর তোমার প্রীতি, আমার কোনো প্রার্থনার অপেক্ষা না

রেখে তাই কর।' এই ভাবে প্রার্থনা ক'রে ক'রে আমি প্রাণে বড় শান্তি নিয়ে এসেছি ভাই।" শুনতে শুনতে মালীর চোখে ঢুলির চোখে জল আসে, ধোপার গায়ে নাপিতের গায়ে রোমাঞ্চ হয়, দ্বারোয়ানের কথা যত শোনে, এদের মন তত পরিষ্কার হয়, আর বলতে থাকে—"ভাই দ্বারোয়ান, যা বলেছ, আবার বল, আবার শুনতে ইচ্ছা করে।"

গল্পটী বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বহু লোকে হয়ত একই কাজ কচ্ছে, কিন্তু মনের গতি চখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে, তার জন্য ফল পায় ভিন্ন ভিন্ন। জমিদার, পুরোহিত, বাংলা-পণ্ডিত ও জমিদার পত্নী,—তীর্থদর্শনের প্রকৃত ফল এদের কারো হ'ল না, হল শুধু তার যাকে সেবার জন্য সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী।

অপরাহ্ণে চিকশিয়া হইতে শ্রীযুক্ত হরদয়াল শর্ম্মা, বংশীধর রাজোয়াড় এবং হরিপদ শর্ম্মা আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা নানা উপদেশ-পূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

আপ্‌না সাফা কিয়ো

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক রাজ্যে এক ধোপা ছিল। শেষ রাত্রে উঠে সে প্রতিদিন কাপড় কাচে, বেলা হ'লে সব নিয়ে ঘরে যায়। এক ফকীর রোজই সকাল বেলা পথ দিয়ে চ'লে যায়, আর চীৎকার করে—"আপ্‌না সাফা কিয়ো"। প্রতিদিনই ধোপা এই চীৎকার শোনে, আর ভাবে লোকটা কি পাগল নাকি, আর কি কোনো কথা সে জানে না? একদিন ধোপা ময়লা কাপড়-চোপড় আনতে গেল এক আলকাতরাওয়ালার দোকানে। সেখানে অসাবধানতাবশতঃ হাতে পায়ে কতকটা আল্‌কাতরা লেগে গেল। সন্ধ্যা সময়ে বাড়ী এসে সে খুব ক'রে সোডার জল দিয়ে আলকাতরা সাফ ক'রে খেয়ে দেয়ে ঘুমোলো। শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে ধোপা দেখে কি, তার গায়ের ময়লা ত' যায় নাই, বরং রাত্রিযোগে বিছানায়, চাদরে, বালিশে লেগে গেছে। যাই হোক, পুনরায় সোডা-সাবান নিয়ে সে কাপড় কাচবার পুকুর-ধারে

গিয়ে নিজের শরীর ও নিজের কাপড় পরিষ্কার কর্ত্তে লাগল। ঠিক সেই সময়ে সেই পাগ্‌লা ফকীর চীৎকার কত্তে কত্তে চলেছে,—"আপনা সাফা কিয়ো।" ধোপার মনে হ'তে লাগ্‌ল, "ঠিকই ত', এতকাল শুধু পরের কাপড়, পরের জামা সাফ ক'রেছি, নিজের জামা নিজের কাপড় ত' পরিষ্কার রাখার দিকে মন দিই নাই। আজ থেকে নিজের জামা, নিজের কাপড়, নিজের শরীর এইদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।" কয়েকদিন যায়, ধোপা রোজই আগে নিজের জামা, নিজের কাপড়, নিজের শরীর পরিষ্কার করে, তারপরে লোকের কাপড় জামা কাচতে বসে। রোজই কিন্তু সকাল বেলা সেই পাগলা ফকীর চীৎকার ক'রে ক'রে যায়, "আপ্‌না সাফা কিয়ো।" একদিন ধোপার মনে হ'ল,—"তাই ত'! কাপড়, জামা আর শরীরটাকে আপন ব'লে মনে কচ্ছি, আসল আপন ত' চিন্‌লামও না, তাকে সাফা করার চেষ্টাও কর্ল্লাম না। একটু খেয়াল কর্ল্লেই দেখতে পাই, মনের ভিতরে কত পাপ, কত কদর্য্য লালসা, কত অসঙ্গত কামনা দিবারাত্রি কিলিবিলি কচ্ছে, আর বাইরে আমি শরীরখানাকে সাবান ঘ'ষে পরিষ্কার রাখছি, এ পরিচ্ছন্নতায় লাভ কি হ'ল? একটা সোনার ঘটির ভিতরে যদি থাকে কতকগুলি মলমূত্র, তা'হলে ঘটির উপরে রুজ পাউডার মাখলেই কি তাকে পরিষ্কার করা হ'ল?" ধোপার বাড়ীর পাশেই আছে এক মেথরের বাড়ী, মেথরকে ডেকে ধোপা বল্লে,—"ভাইরে তুই করিস পরের বাড়ীর পাইখানা আর পরের বাড়ীর নর্দ্দমা পরিষ্কার, আমি করি পরের বাড়ীর জামা আর পরের বাড়ীর কাপড় পরিষ্কার, কিন্তু তুইও তোর নিজের দিকে তাকাস্ না, আমিও আমার নিজের দিকে তাকাই না। আমরা দুজনেই সমান অন্ধ।" মেথর বল্লে,—"ঠিক কথা ভাই, ঠিক কথা, পরের বাড়ীর পাইখানা দশ মিনিটে সাফ হয়, নিজের ভিতরের পাইখানা দশ যুগেও সাফ হ'তে চায় না,—তুমি ঠিক কথা বলেছ ভাই, জীবন ভ'রে পেটের দায়ে বৃথা শ্রমই ক'রে যাচ্ছি, কাজের কাজ আর কিছু হ'ল না।" ঠিক এমনি

সময়ে পাগলা চীৎকার কত্তে কত্তে চলে গেল,—"আপ্‌না সাফা কিয়ো।" মেথর ভাবলে,—"নাঃ, আজ থেকে আর পরের ময়লা সাফ কর্ব্ব না, নিজের ময়লা খুঁজে বের করব, নিজের ময়লা সাফ কর্ব্ব, এ জীবন দুদিনের, হঠাৎ যদি ম'রে যাই, মনের পুঞ্জীভূত ময়লা নিয়েই পরকালের হিসাব চুকাতে হবে।" এই রকম ভাবতে ভাবতে মেথর গিয়ে বাজারে বসেছে নাপিতের সাম্‌নে ক্ষৌরী করাবার জন্যে, নাপিত প্রাপ্য পয়সার দরদস্তুর ঠিক ক'রে মেথরের চুল কামাচ্ছে। এই সময়ে মেথর বল্লে,—"ভাই নাপিত, আমি করি পরের পাইখানা পরিষ্কার, আর তুমি কর পরের শরীর পরিষ্কার, কিন্তু নিজেকে পরিষ্কার করার দিকে আমাদের কোনো দৃষ্টি নেই।" নাপিত বল্লে,—"ভাই মেথর, কথাটা মিছে বলনি, আমি সবাইকে সুন্দর করি ব'লে আমার নাম নরসুন্দর, কিন্তু নিজে ত' সুন্দর হবার চেষ্টা একদিনের জন্যও করিনি,—তুমি ঠিক বলেছ ভাই, তুমি ঠিক বলেছ।" এই সময়ে সেই পাগলা ফকীর বাজারের মধ্য দিয়ে চীৎকার কত্তে কত্তে যাচ্ছে,—"আপ্‌না সাফা কিয়ো।" ছেলের পাল পিছনে জুটেছে, তারা ফকীরকে অনুকরণ কচ্ছে—"আপ্‌না সাফা কিয়ো।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহাপুরুষের প্রয়োজন এইখানে। প্রত্যেক মানবের মনে কখনো না কখনো একথা জাগে যে, চিরকাল যেভাবে চলেছি, সেভাবে আর চল্‌বে না। নিজেকে পঙ্কিল, কলুষিত, দূষিত আবর্জ্জনা থেকে মুক্ত করা চাই। মহাপুরুষদের বাণী সেই সময়ে জীবকে সৎপ্রেরণায় সঞ্জীবিত করে।

পুরুলিয়া
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৯

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা পুরুলিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতিপয় যুবক উপদেশার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

কর্ম্মের কৌশল

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কর্ম্মের কৌশল কি ?

শ্রীশ্রীবাবা—কর্ত্তৃত্ববোধ ভগবানে সমর্পণ, তাঁর দাসরূপে কর্ত্তব্যবোধে আপ্রাণ শ্রমসাধন।

আত্মসমর্পণের কৌশল

প্রশ্ন।—আত্মসমর্পণের কৌশল কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—অবিশ্রান্ত প্রার্থনা।

৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা পুরুলিয়া হইতে হাওড়া রওনা হইয়াছেন। আদ্রা আসিয়া ট্রেণ বদল করিতে হয়। অনেকক্ষণ আদরা ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবা একখানা সংবাদ-পত্র কিনিলেন। দুই-চারি কলম পড়িয়া পত্রিকাখানা রাখিয়া দিলেন।

সংবাদপত্র-সম্পাদকের দায়িত্ব

হাওড়া-গোমো প্যাসেঞ্জার মেদিনীপুর পৌঁছিলে জনৈক পরিচিত ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলেন। পত্রিকাখানা দেখিয়াই বলিলেন,—আপনার কি কাগজখানা পড়া হ'য়ে গেছে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না, পড়া হয় নি, তবে পড়ার ইচ্ছাও নেই।

ভদ্রলোক গভীর মনোযোগের সহিত কাগজখানা আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরে বলিলেন,—নাঃ, পড়ার কিছু নেইও।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তবু যে পড়্‌লেন ?

ভদ্রলোক বলিলেন,—পড়ার একটা নেশা হ'য়ে গেছে কি না !

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যারা খবরের কাগজ পড়ে, তাদের একটা নেশা হয়ে যায়, এটা খুব সত্য কথা। কিন্তু এই জন্যই সংবাদপত্র সম্পাদকের দায়িত্ব অত্যধিক। যা' তা' জিনিষ দিয়ে পত্রিকা পূরণ ক'রে দিলে গ্রাহক

ও পাঠকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। গ্রাহক এবং পাঠকেরা সর্ব্বদাই প্রত্যাশা করে যে, কাজের জিনিষ খবরের কাগজে কিছু থাক্‌বে এবং এ জন্যই পত্রিকা না প'ড়ে আগে পয়সা দিয়ে তবে কাগজখানা ফিরিওয়ালার কাছ থেকে নেয়। পুস্তকের দোকানে পুস্তক কিন্‌তে গেলে নাড়াচাড়া ক'রে তার আগাগোড়া দেখে কেনা যায়, সংবাদপত্রে তা' চলে না।

সংবাদ-পত্রের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোকমত গঠনে, জনসাধারণকে শিক্ষাদানে সংবাদপত্রের শক্তি অসীম। নেপোলিয়ান বল্‌তেন,—"Four hostile news-papers are more to be feared than thousand bayonets,—একহাজার শস্ত্রধারী শত্রু অপেক্ষাও বিরুদ্ধভাবাপন্ন চারখানা সংবাদ-পত্রের শক্তি বেশী।" সংবাদপত্রওয়ালারা ইচ্ছা করলে একটা মৃত-প্রায় আত্মচেতনাহীন জাতিকে বলে, বীর্য্যে, উৎসাহে, উদ্যমে প্রদীপ্ত ক'রে তু'লে তাদের দিয়ে অসাধ্য-সাধন করাতে পারেন। স্কুল-কলেজে প'ড়ে যারা বিদ্যা অর্জ্জন কত্তে পারে নি, বিশাল পুস্তকাগারে নিমগ্ন হ'য়ে যারা জ্ঞানানুশীলনে অক্ষম, এমন ব্যক্তিদের ভিতরেও জ্ঞান, আত্মসম্বিৎ, কর্ত্তব্য-বোধ এবং কর্ম্ম-প্রেরণা জাগিয়ে দেবার ক্ষমতা সংবাদ-পত্রের আছে। স্কুলমাষ্টারেরা দু'শ' চারশ' ছেলেকে হয়ত পড়ায়, সংবাদপত্রগুলি দৈনিক বহু সহস্র লোককে শিক্ষাদান করে। এই খানেই রয়েছে সংবাদপত্রের সর্ব্বপ্রধান শক্তি। একটা প্রাতের সংবাদ হয়ত পাঠকের মনকে তার দিবসব্যাপী প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতরে চিন্তার, পর্য্যালোচনার, নবদৃষ্টি-ভঙ্গীতে বস্তু ও ঘটনা বিচারের প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাবে। এইখানে রয়েছে, সংবাদ-পত্র-পরিচালকের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব। তোমার শক্তি আছে ব'লেই তুমি সেই শক্তির অপব্যবহার কর্ব্বে, এটা কোন কাজের কথাই নয়। বরং শক্তি আছে ব'লেই তোমাকে তার সদ্‌ব্যবহার,—পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার, কত্তে হবে।

সংবাদ-পত্র ও ধনার্জ্জন-লালসা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক সংবাদ-পত্র শুধু অর্থার্জ্জনের জন্যই প্রকাশিত

হয়। এসব সংবাদ পত্র লোকের রুচি বুঝে চলে। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট আন্দোলনের প্রতি যখন লোকের ঝোঁক খুব বেশী, তখন এঁরা তাকে সমর্থন করেন, আবার লোকেরও ঝোঁক ক'মে গেল, এরাও সমর্থন ছেড়ে দিলেন। লোকে এখন রং-তামাসা সিনেমা-থিয়েটার, ভালবাসে ত' এঁরাও ফলাও ক'রে এ সবেরই জয়গান কর্ল্লেন, আবার হঠাৎ এক-জন শক্তিশালী পুরুষ এসে সাধারণের মনকে অন্য দিকে চালিত কর্ল্লেন, সঙ্গে সঙ্গে এঁরাও নিজেদের পূর্ব্বমত পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ ক'রে নূতন মতের পূজা এবং নূতন পথে পাদচারণ সুরু কর্ল্লেন। এই জাতীয় সংবাদ-পত্রকে ব্রতভ্রষ্ট ব'লে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ, শিক্ষাদাতা যদি অর্থলোভী হয়, তবে তার জ্ঞান, বিদ্যা পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা বারংবার ব্যাভিচারী হ'য়ে থাকে।

দলাদলি ও সংবাদ-পত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক সংবাদপত্র আবার নির্দ্দিষ্ট একটা দলকে সমর্থন করার জন্য, নির্দ্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়ের মতামত প্রচারের জন্য সৃষ্ট হয়ে থাকে। প্রত্যেক পন্থাবলম্বীরই নিজ নিজ মত সমর্থন বা প্রচার করার অধিকার আছে, যতক্ষণ সে অপরের ন্যায্য অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ না করে, যতক্ষণ সে মিথ্যা-প্রচার, বিপক্ষ-দলনের জন্য অসত্য-সৃষ্টি প্রভৃতি দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়। কিন্তু দলাদলির একটা মোহ আছে। আবার দলাদলি কত্তে গেলেই গালাগালিও অবশ্যম্ভাবী। অধিকাংশ সংবাদ-পত্রের ভিতরে এই একটা নীচতা দেখা যায় যে, কোনো একটা বিশেষ কারণে অন্য কোনো সংবাদ পত্রের সঙ্গে মতামতের সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে, যক্ষ্মারোগীর কাসির মত আমৃত্যু তার জের চলেই চলে। এক ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছি ব'লে অপর দশ ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন কর্ব্ব না, এটা দলাদলির এক মারাত্মক লক্ষণ। এর ফলে শুধু সংবাদ-পত্র-সেবীদেরই নৈতিক ক্ষতি হয় তা নয়, তার চেয়ে দশ-গুণ বেশী ক্ষতি হয় বেচারী পাঠকদের। গ্রাম্য পাঠকদের অনেকেই

ছাপার হরফে যে কোনো একটা মন্তব্য দেখলে তাকে বেদবাক্য ব'লে মনে করে। এজন্যই দলের কাগজ বা সম্প্রদায়ের কাগজ সমাজের হিতের চেয়ে অহিত করে বেশী। সংবাদপত্রের সংবাদ, মন্তব্য, টিপ্পনী, প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপন,—এগুলির ভিতর দিয়ে একটা জাতির বুদ্ধিশক্তি, প্রতিভা, নৈতিক মানদণ্ড এবং সততার পরিচয় প্রকটিত হ'য়ে থাকে। একথা স্মরণ রেখে দলের পত্রিকাকেও নিজের বাক্য সম্পর্কে একটু সংযত হয়ে চলা ভাল। মতামতের লড়াই অনেক সময়ে ব্যক্তিগত লড়াইতে পরিণত হয়,—এইটুকু হচ্ছে দলের কাগজের সবচেয়ে বিষম বিড়ম্বনা।

সংবাদপত্র ও চমকপ্রদ সংবাদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেকের মত এই যে, খবরের কাগজে চুরী, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতির সংবাদ শুনে লোকের শিক্ষা হয় যে, অসতর্ক ভাবে থাকতে নেই, অসাবধান ভাবে চল্‌তে নেই ইত্যাদি। লোকের ফাঁসীর খবর শুনে শিক্ষা হবে যে, নরহত্যা কত্তে নেই, তাহ'লে নিজের প্রাণটী যাবার সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তি নিলামের সংবাদ জেনে শিক্ষা হবে, ঘোড়দৌড়ে বাজি রাখ্‌তে নেই, জুয়া খেল্‌তে নেই, অপব্যয় কত্তে নেই, ইত্যাদি। লোকের আত্মহত্যার খবর শুনে শিক্ষা হবে যে, গোড়া থেকেই জীবনকে সদ্‌ভাবে চালন করা প্রয়োজন, নইলে মহাদুর্গতি ঘটে। এঁদের মত এই যে, বড় বড় নীতিজ্ঞ উপদেষ্টার আর কি দরকার, —খবরের কাগজ পড়েই যে দুনিয়ার সব সুনীতি শিক্ষা হবে! আমার কিন্তু এসকল মত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় মনে হয় না। আজগুবি গল্প, গুরুতর অপরাধ, অমার্জ্জনীয় অসামাজিক অনাচার প্রভৃতির সংবাদ নিত্য পাঠ কত্তে কত্তে পাঠকের রুচি পঙ্কিল হয়, নীতিজ্ঞান দূষিত হয়, সৎসঙ্কল্প শিথিল হয়। চমকপ্রদ বাজে খবর উত্তেজক ভাষায় চিত্তাকর্ষক হেডিং দিয়ে প্রকাশ ক'রে ক'রে লোকের মনকে বিক্ষেপশীল ও hystric করা হয়। নারী-হরণের অনেক সংবাদ নারী-হরণের নিবারক না হ'য়ে নারী-হরণের উত্তেজক হয়।

সংবাদ-পত্র পরিচালনায় ভারতীয় প্রতিভা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এইজন্যই আমি লক্ষ্য করেছি যে, অনেক সাধু-মহাজন আধ্যাত্মিক মঙ্গলকামী নিজ নিজ শিষ্যদিগকে সংবাদ-পত্র পাঠ কত্তে নিষেধ করেন। আবার, হাজার বিষয়ের চিন্তা দশ মিনিটে সেরে ফেলার অভ্যাসও মানসিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে খুব সহায়ক নয়। এজন্যই পাশ্চাত্য দেশের সংবাদ-পত্র পরিচালনের আদর্শ ভারতবর্ষের অনুকরণীয় না হওয়াই সঙ্গত। অবশ্য সংবাদ-পত্র জিনিষটা ওদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাই ব'লে অন্ধের মত ষোল আনা ওদেরই অনুসরণ কত্তে হবে, এর পক্ষে কোনো সদ্‌যুক্তি থাকতে পারে না। গৃহ নেই, ভাড়াটে পায়রার খোপে বাস করে; পারিবারিক জীবনের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই, স্বামী আর স্ত্রী এই দুজন নিয়েই সংসার; অন্ন-সমস্যা কঠোর, এজন্য স্বামী করে চাকুরী, স্ত্রী করে চাকুরী; স্ত্রীর অবসরাভাব, হোটেলেই হ'ল আহার; ছেলে বড় হ'ল, বিয়ে করেই হ'ল পর; বাপ বুড়ো হলেন, আতুরাশ্রম তার আশ্রয়, পুত্র-গৃহে নয়,—এই যাঁদের দেশের সাধারণ অবস্থা, তাঁদের সঙ্গে সমাজ-গঠনের বনিয়াদেই আমাদের আমূল পার্থক্য। সুতরাং কোনো জিনিষ তাঁদের কাছ থেকে নিয়েছি বলেই ত বহু তাঁদের অনুকরণ ক'রেই চল্‌তে হবে, তা হ'তে পারে না। মিষ্টি কুমড়ো, আলু, পেঁপে এসব জিনিষ ভারতের আদিম নয়, বিদেশ থেকেই পেয়েছি। কিন্তু তাই ব'লে কি এ সব জিনিষের রন্ধন-প্রণালী আমরা নিজেদের ঢংয়ে ক'রে নিই নাই? সংবাদ-পত্র সম্পর্কেও তাই করা আবশ্যক। সংবাদ-পত্র পরিচালনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের আর্য্য-প্রতিভার পরিচয় দেবার সময় কিন্তু এসে গেছে।

সংবাদ-পত্র ও মন্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কারো কারো মতে, সংবাদপত্রে খবর থাকবে অত্যধিক, আর মন্তব্য থাকবে অত্যল্প; তাহ'লেই সেটি ভাল খবরের কাগজ হ'ল। যে স্থলে প্রত্যেকটী খবর বেশ হিসাব করে নির্ব্বাচিত হয়, সে,

স্থলে মন্তব্য খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। আর, দক্ষ সম্পাদক নির্ব্বাচিত সংবাদগুলি ইচ্ছা কর্লে এমন ভাবে সাজিয়ে ছাপাতে পারেন, যাতে মন্তব্য দেওয়ার প্রয়োজন ক'মে যেতে পারে। এরূপ যদি হয়, তবে সেটি হ'ল সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা। নইলে স্থল বিশেষে মন্তব্য দিয়ে অসত্য হ'তে সত্যের দিকে, অন্যায় হ'তে ন্যায়ের দিকে, অনাচার হ'তে সদাচারের দিকে পাঠকের রুচিকে আকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করা উচিত। মন্তব্য দিলেই যে খবরের কাগজ খারাপ হ'য়ে যায়, তা নয়। মন্তব্য দ্বারা পাঠকের মনকে ভালর দিকে না টেনে যদি দোষদর্শী হবার সাহায্য করা হয়, তবেই মন্তব্য দোষের। একটা নির্দ্দিষ্ট সংবাদ-পত্রের পাঠকেরা দীর্ঘকাল ধ'রে একই পত্রিকা পড়্তে পড়্তে সেই পত্রিকার টিপ্পনী করার ঢংয়ের সাথে এতটা পরিচিত হ'য়ে যায় যে, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নিজেরাও টিপ্পনী করার কালে অপর সম্পর্কে সেইরূপ রসাল বা রুক্ষ্ম মন্তব্য করে। এজন্য মন্তব্যগুলি সব সময়ে সুবিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

সংবাদ-পত্র ও কুসংবাদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কুসংবাদ পত্রিকাতে প্রকাশ না করাই পত্রিকা-পরিচালকের সাধারণ নীতি হওয়া সঙ্গত। তবে যেখানে কুসংবাদ পরিবেশনের দ্বারা কোনো অন্যায়ের প্রতীকারে সাহায্য হবে, সেখানে নীরব থাকাও সঙ্গত নয়। অমুক গ্রামে বহু লোক ওলাউঠাতে মর্ছে, এই সংবাদ প্রকাশের দ্বারা চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোকের মনে প্রতিষেধ-ব্যবস্থার আগ্রহ জন্মান সম্ভব। এক্ষেত্রে এ কুসংবাদ প্রকাশ আবশ্যক। কিন্তু অমুক গ্রামে একটী ছেলে পরীক্ষায় ফেল মারার দরুণ আত্মহত্যা করেছে, এ সংবাদ প্রকাশে কুদৃষ্টান্ত বৃদ্ধিরই বরং আশঙ্কা রয়েছে। এক্ষেত্রে এ সংবাদ প্রকাশে বৃথা কাগজ খরচ, বৃথা কালীর খরচ, বৃথা ছাপার খরচ, আর বৃথা পাঠকের দৃষ্টি-শক্তির খরচ। কিন্তু এ সংবাদ প্রকাশের সাথে যুবকদের ভিতরে অসাফল্যের সাথে সংগ্রাম ক'রে পরিণামে জয়ী হবার আগ্রহকে যদি বর্দ্ধন করার কোনো উপায় অবলম্বন করা

যায়, তাহ'লে সে স্থলে এ সংবাদ প্রকাশ-যোগ্য বল্‌তে হবে। এসব স্থলে সম্পাদকের দায়িত্ব যে কত বৃহৎ, তা অনেক সম্পাদককেই স্মরণ কত্তে দেখা যায় না ব'লে আমার মনে হয়। এই সব আত্মহত্যার খবরে পত্রিকা পূর্ণ না ক'রে যদি আত্মত্যাগের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে তা দিয়ে পত্রিকা-পূরণের চেষ্টা হয়, তবে তাতে সমাজের মঙ্গল হয়। একদল লোক যেমন দেশ জুড়ে অপরাধ, অন্যায় ও অনাদর্শ কাজ কচ্ছে, আবার তেমনি ভাল ক'রে খুঁজ্‌লে আর এক দল লোককে পাওয়া যাবে, যারা তিলে তিলে পলে পলে নিজেকে ক্ষয় ক'রে দিয়ে জনসেবা, পরহিত সম্পাদন কচ্ছেন। সংবাদ-দাতারা যদি পরিশ্রমে অনিচ্ছুক না হন, এবং যদি তাঁরা খোলা চ'খে সমাজের প্রতি স্তরে অনুসন্ধান করেন, তাহ'লে প্রত্যহ বহু দান, আত্মত্যাগ ও স্বার্থবিলোপের সংবাদ পত্রিকা-অফিসে পাঠাতে পারেন।

সংবাদ-পত্র জগতে একটী অভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমাদের দেশের সংবাদ-পত্র জগতে একটী অভাব আমার মনকে বড়ই পীড়া দিচ্ছে। সেটি হচ্ছে, সর্ব্বদল-নিরপেক্ষ একটী সর্ব্বজনীন পত্রিকা। কোনো নির্দ্দিষ্ট দলের মত প্রচার বা পক্ষ সমর্থন এর লক্ষ্য হবে না, লক্ষ্য হবে সকল দলের সকল ভাল কথাকে অঙ্কে স্থান দেওয়া। যত পত্রিকার যত সম্পাদকীয়, প্রত্যেকটী তন্ন তন্ন ক'রে বিচার ক'রে, যার কথা থেকে যতটুকু পাঠকের মনকে হিংসা বা বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক ভ্রান্তিতে কলুষিত না ক'রে পরিবেশন করা যায়, তা ক'রে যাওয়া। যত দল যত ভাবে দেশ এবং সমাজের যত রূপ সেবা দিচ্ছেন, তার সম্পর্কে মন্তব্য-বর্জ্জিত সরল সত্য সংবাদ পরিবেশন করা। দেশান্দোলনকারী একটা সমস্যাকে যত মনীষী যত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখ্‌ছেন, তার প্রত্যেকটার সঙ্গে পাঠককে এমন ভাবে পরিচিত করা, যেন বিনা মন্তব্যে পাঠক বুঝ্‌তে পারেন যে, কারা শুধু কথা বল্‌বার জন্যই এসেছেন, কারা কিছু কিছু কাজও কত্তে চান্।

(নবম খণ্ড সমাপ্ত)

অখণ্ড-স্তোত্রম্

১।　ওঁ অমৃতং সুন্দরং শান্তং নিত্যং প্রেম-সুখাবহম্,
ভক্তানাং প্রাণ-সর্ব্বস্বং পরমানন্দ-বর্দ্ধকম্,
অনন্তং নিখিলং সত্যং শুদ্ধমানন্দবিগ্রহম্,
ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রাভ্যাং দ্রষ্টব্যম্ অদ্বিতীয়কম্,
নান্যঃ প্রিয়তরো যস্মাৎ নাভূন্নবা ভবিষ্যতি,
পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্ ॥১॥

২।　ওঁ ধৃতং প্রেম্না জগদ্ যেন, ত্রৈলোক্যং জায়তে যতঃ,
বিশ্রামো লভ্যতে যস্মিন্ শ্রান্তে ক্লান্তে চ জন্মসু,
পিপাসাসু চ সর্ব্বাসু যস্তু তৃষ্ণাপহারকঃ,
প্রার্থনাসু চ সর্ব্বাসু সর্ব্বথা কাম-পূরকঃ,
স্থূলে সূক্ষ্মে ইহামুত্র চৈতন্যং আত্ম-সংস্থিতম্,
প্রাণদং প্রেমদং পুণ্যং মন্ত্ররাজং নমাম্যহম্ ॥২॥

৩।　ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধেবিমর্দ্দকম্,
স্বরূপং সর্ব্বভূতানাং অখণ্ডং নাদ-রূপকম্,
বিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্ম চিদানন্দ-ঘনং শুভম্,
ব্রহ্মেন্দ্রা বিষ্ণু-রুদ্রাশ্চ ধ্যায়ন্তি যম্ অহর্নিশম্,
গায়ন্তি ঋষয়ো দেবা ভক্তি-ব্যাকুল-চেতসঃ,
সর্ব্বামহমিকাং ত্যক্ত্বা মহামন্ত্রং ভজাম্যহম্ ॥৩॥

———

নবম খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠ্যাঙ্ক